বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী

শ্রীনরেশচন্দ্র জানা, এম.এ., ডি.ফিল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৭০

"জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥"

বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী

শ্রীনরেশচন্দ্র জানা, এম.এ., ডি.ফিল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৭০

স্বর্গত পিতৃদেব যোগেন্দ্রনাথ জানা
ও
স্বর্গতা মাতৃদেবী দক্ষবালা জানা-র
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

প্রাতিহারিক

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাঙালী বৈষ্ণব-সমাজের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ধীরে ধীরে গৌড়ভূমি ছেড়ে ব্রজভূমিতে চলে যায়। যতদিন শ্রীচৈতন্য প্রকট ছিলেন ততদিন বাঙালী বৈষ্ণবের কাছে পুরী ছিল ধ্রুবলোক। মহাপ্রভু অপ্রকট হলে পর নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত বৈষ্ণব-সমাজের নেতা বলে সম্মানিত ছিলেন। অদ্বৈত গৃহস্থ এবং তাঁর অধ্যাত্ম চেষ্টা অনেকটা সংযত ছিল। তাঁর বয়সও হয়েছিল। নিত্যানন্দ ছিলেন অবধূত এবং যদিও তিনি বিবাহ করে সংসারী হয়েছিলেন তবুও তাঁর চৌম্বক মাহাত্ম্য বিশেষ খর্ব হয়নি। তাঁর বিশিষ্ট ভক্তেরা সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল এবং সমাজে তাঁদের প্রভাবও বেশ ছিল। এঁরা সংস্কৃত বিদ্যার এবং প্রাচীন শাস্ত্রের ধার বেশি ধারতেন না। এঁরা চলতেন ভক্তি অনুগতির পথে হৃদয়ের আবেগে।

ব্রজভূমিতে বৈষ্ণব-সাধনার পীঠ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করেছিলেন মাধবেন্দ্র পুরী এবং সে পীঠের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন মাধবেন্দ্রের প্রশিষ্য চৈতন্য। তিনি বিশেষ কোন মতলব নিয়ে এ কাজ করেন নি। নিসর্গসুন্দর নির্জন পবিত্র স্থানটিকে তিনি কয়েকজন মর্মজ্ঞ উদাসীন সমাজবহির্ভূত ভক্ত সাধকের তপোভূমি রূপে নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁর নিজেরও ইচ্ছা ছিল শেষজীবনে বৃন্দাবন আশ্রয় করতে। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে পাঠিয়েছিলেন সুবুদ্ধি মিশ্রকে, তার পরে সনাতন ও রূপ দুই ভাইকে। আর কোন ভক্ত-সাধককে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনে স্থায়ী ভাবে বাস করতে উপদেশ দেন নি।

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের তিরোধানের পর ব্রজভূমি যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের মহা-অধিকরণে পরিণত হল সে ব্যাপারের মূলে আছেন দুটি ব্যক্তি সনাতন ও রূপ। এঁরা দুই ভাই ছিলেন অতিশয় বিচক্ষণ, পরম পণ্ডিত, পরম বৈরাগ্য-পরায়ণ এবং বিনয়-সহৃদয়তা, বৈদগ্ধ্য-ভক্তির আধার। বৃন্দাবনে সমাজ-উপদ্রবের বাইরে নিশ্চিন্তে থেকে এঁরা সাধন-ভজন এবং সাধন-ভজনের সূত্রে সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুশীলন করবেন এই ছিল শ্রীচৈতন্যের অভিপ্রায়। এ অভিপ্রায়ের সাফল্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সূচিত হয়েছিল। সনাতনের শিষ্য ও ছোট ভাই রূপ খুব ভালো করে সংস্কৃত জানতেন। হোসেন শাহার দরবারে কাজ করবার সময়েই তিনি সংস্কৃতে কবিতা রচনা করতেন। এখন তিনি প্রায় সমস্ত মনোযোগ দিলেন

কৃষ্ণলীলা নাটক ও কবিতা রচনায় এবং কার্ষ্ণায়ণ-সাহিত্যের অলঙ্কারবিন্যাস ও রসপর্যায়ের আলোচনায়। "রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি", তাঁর মনস্বিতা ছিল বিপুল। তবে তিনি লিখেছিলেন এবং যা লিখেছিলেন গভীর আত্মচিন্তাপ্রসূত মৌলিক গ্রন্থ ('ভাগবতামৃত')। গৌড় দরবারে থাকতেই সনাতন পুরাণের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। তিনি ভাগবতের একটি টীকাও লিখেছিলেন। কিন্তু তা সম্ভবত সম্পূর্ণ করেন নি। সে ভার দিয়েছিলেন তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র এবং প্রশিষ্য জীবের উপর। দেশে থেকে লেখাপড়া শেষ করে জীব সংসারে প্রবেশ না করে বৃন্দাবনে চলে আসেন এবং মধ্যম জ্যেঠতাত রূপের শিষ্য এবং সেক্রেটারী হন। তিনি ছিলেন মহাপণ্ডিত। বিস্তর গ্রন্থ লিখেছিলেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দর্শন গ্রন্থগুলি। জীবের মতো আরও এক বিদগ্ধ ভক্তিমান্ তরুণ দক্ষিণ দেশ থেকে এসে এই গোষ্ঠীতে যোগ দেন। ইনি গোপাল ভট্ট। সনাতন এঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের স্মৃতিশাস্ত্র গ্রন্থ 'হরিভক্তিবিলাস' সনাতন এঁকে দিয়েই সঙ্কলন করেছিলেন। "ছয় গোস্বামী"-র মধ্যে এই চারজনকে শাস্ত্রকার বলা যেতে পারে।

বাকি থাকেন দুজন রঘুনাথ। তাঁদের চরিত্রে ও চারিত্র্যে গভীর মিল ছিল। তাঁরা খুব শিক্ষিত ছিলেন কিন্তু পণ্ডিত ছিলেন না। একজন রঘুনাথ ভট্ট কোনই রচনা রেখে যান নি। তিনি অত্যন্ত ভাবুক ভাগবত পাঠক ছিলেন। তাঁর সুস্বরে ভাগবত পাঠ সকলকে মুগ্ধ করত। সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন তিনি। ব্রজভূমি অঞ্চলে তাঁর মাহাত্ম্য খুব প্রসিদ্ধ হয়েছিল। কচ্ছবাহার রাজা মানসিংহ রঘুনাথ ভট্টের শিষ্য ছিলেন বলে মনে হয়। দ্বিতীয় ব্যক্তি রঘুনাথ দাস অত্যন্ত অসাধারণ চরিত্রের ছিলেন। চৈতন্যের পরিবেশে মহৎ চরিত্র ও মহাপুরুষ অনেকগুলিই ছিলেন। তার মধ্যে দুজনের তুলনা নেই। একজন হলেন হরিদাস—"যবন তাড়নে যার নহিল ভ্রূভঙ্গ", আর একজন হলেন রঘুনাথ দাস—যিনি ছিলেন তপস্যার শিখামূর্ত্তি। রঘুনাথ দাস সংস্কৃত কিছু কিছু লিখেছিলেন এবং সে রচনা অত্যন্ত মূল্যবান।

বৃন্দাবনের এই ছয় গোস্বামীকে নিয়ে এই আলোচনা করেছেন শ্রীমান্ নরেশচন্দ্র জানা গবেষণাকারীর যোগ্য অনুসন্ধিৎসু মন ও গভীর নিষ্ঠা নিয়ে। তাঁর আলোচ্য বিষয়ের তথ্য তিনি যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ করেছেন এবং তা সুনিপুণভাবে আলোচনা করে উপস্থাপিত করেছেন। তবে প্রথম চার গোস্বামীর জীবন ও কৃতি যতটা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে শেষ দুজনের বেলায় ততটা নয়। অবশ্য এটা ঠিক যে চৈতন্যচরিতামৃতে রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাসের কথা বিস্তৃতভাবে আছে এবং শ্রীমান্ নরেশচন্দ্র চৈতন্যচরিতামৃতেরই অনুসরণ করেছেন। আমার অনুযোগ হল, চৈতন্যচরিতামৃতের অনুসরণ খুব ভালো করে হয় নি। রঘুনাথ ভট্টের

জীবনকথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ সম্পূর্ণভাবে দিয়েছেন। তাঁর পিতামাতার কথা, তাঁর বাল্যকথা, তাঁর যৌবনে শ্রীচৈতন্যের কাছে শিক্ষা ও জীবনের নির্দেশ লাভ, পিতামাতার সেবা, তাঁদের মৃত্যুর পর বৃন্দাবনে গমন, সেখানে ভাগবত পাঠ ও অন্যান্য কাজ এবং পরিশেষে নির্বাণ সমস্তই চৈতন্যচরিতামৃতে আছে। দুঃখের বিষয় শ্রীমান নরেশচন্দ্রের গ্রন্থে সে সব কথা স্পষ্টভাবে নেই। রঘুনাথ দাসের রচনা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অপেক্ষিত ছিল। বিশেষ করে তাঁর গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু-র আলোচনা না থাকায় রঘুনাথ দাসের রচনার আলোচনা সার্থক হয় নি। ভবিষ্যৎ সংস্করণে এ ত্রুটিগুলি মিটিয়ে দিলে 'বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী'র মূল্য বৃদ্ধি না করেও মর্যাদাবৃদ্ধি করা হবে।

শ্রীমান্ নরেশচন্দ্রের আলোচিত ছ'জনের বাইরে আরও দু-এক জন "গোস্বামী" ছিলেন বৃন্দাবনে। তাঁদের মধ্যে একজন লোকনাথ চক্রবর্তী, অত্যন্ত মনস্বী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং আত্মবিলোপী ব্যক্তি ছিলেন। এঁকে আলোচনার অন্তর্গত করে নিলে ভালো হয়।

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের তিরোধানের পর বাংলা দেশে বৈষ্ণব-সমাজে কয়েকটি গুরুবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। পরে বৃন্দাবনে দীক্ষিত হয়ে এসে শ্রীনিবাস আচার্য আর একটি বৃহৎ গুরুবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের প্রভাব শ্রীনিবাস আচার্য ও তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্যদের দ্বারা বাংলাদেশে বিস্তারিত হয়। শ্রীনিবাস গোপাল ভট্টের শিষ্য। জীবগোস্বামী কাকেও দীক্ষা দেন নি। সনাতন ও রূপও নয়। এ বিষয়েও কিছু আলোচনা থাকলে সম্পূর্ণতর হয়।

বাংলা বিদ্যায় ডি.ফিল থিসিস অনেক ছাপা হয়েছে। আরও অনেক ছাপা হয়নি। যেগুলি ছাপা হয়নি সেগুলির কথা বাদ দিই। যেগুলি ছাপা হয়েছে এবং আমি পড়েছি তার মধ্যে শ্রীমান্ নরেশচন্দ্রের রচনাটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি।

শ্রীসকুমার সেন

কলিকাতা
২৬. ৮. ৭০

নিবেদন

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে শাস্ত্রীয় ও দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার মূলে বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর দান অসামান্য। ইঁহাদের জীবনী না জানিলে বৈষ্ণবধর্মকে যথাযথভাবে জ্ঞাত হওয়া যায় না। এই ছয় গোস্বামীর জীবনকথা বৈষ্ণবসাহিত্য আলোচনাপ্রসঙ্গে কেহ সংক্ষিপ্তাকারে, কেহ বা অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় বাংলা দেশে বৈষ্ণবধর্মমতের অগ্রগতি ও আন্দোলনের প্রাথমিক ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করিতে যাইয়া ছয় গোস্বামী সম্পর্কে মূল্যবান্ আলোচনা করিয়াছেন। তবে এই আলোচনা বাংলা ভাষায় লিখিত নহে। সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় 'সপ্তগোস্বামী' নামক একটি গ্রন্থে ছয় গোস্বামীর মোটামুটি পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবে ইহাতে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নাই।

১৯৬০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে রামতনু লাহিড়ী গবেষকরূপে নিযুক্ত হইলে স্বর্গত আচার্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত রচনার ভার আমার উপর অর্পণ করেন। তাঁহারই নির্দেশ ও অনুশাসন অনুসারে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। গোস্বামীদের জীবনকাহিনী সুসম্বদ্ধ আকারে কেহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। চৈতন্যচরিত গ্রন্থাদিতে ও অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থাদিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অল্পস্বল্প মাত্র তথ্য পাওয়া যায়। এই স্বল্প উপাদান লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ জীবনকাহিনী রচনা সম্ভবপর নহে বলিয়া তাঁহাদের জীবনী সম্বন্ধে প্রধান প্রধান তথ্যমাত্র আলোচনা করিয়াছি।

বৈষ্ণবশাস্ত্রগ্রন্থসমূহ রচনা করিবার জন্য গোস্বামিপাদগণকে যে কত বিপুল-সংখ্যক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহাদের রচনায় উল্লিখিত গ্রন্থের একটি বর্ণানুক্রমিক সূচী পরিশিষ্টে সংযোজন করিয়াছি। রাধাকুণ্ডের মোহান্ত শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের কৃপায় কতকগুলি ফার্সী দলিল পাই। উক্ত দলিলগুলি হইতে কি করিয়া ১৫০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রঘুনাথ দাস গোস্বামী জীবের নামে এবং জীব গোস্বামী স্বয়ং রাধাকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বস্থ বিস্তৃত ভূখণ্ড ক্রয় করেন তাহার নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। দলিলগুলির মুদ্রিত প্রতিলিপি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের জন্য দিয়াছি। বর্তমান গ্রন্থে মথুরার আদালতে প্রমাণস্বরূপে গৃহীত ঐ দলিলগুলির ইংরাজী অনুবাদ পরিশিষ্টে সংযোজিত হইয়াছে।

ছয় গোস্বামীর জীবনী সম্পর্কে উপাদান সংগ্রহে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় আমাকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহারই সাহচর্যে বৃন্দাবন, মথুরা, নবদ্বীপ, পাণিহাটি প্রভৃতি বৈষ্ণবতীর্থগুলি পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং তাঁহারই কৃপায় এই সমস্ত স্থানের পাঠাগারে রক্ষিত পুঁথিপত্রাদি দেখিবার অবাধ সুযোগ পাইয়াছি। আমার পরমপূজ্য শিক্ষাগুরু ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় 'প্রাতিহারিক' লিখিয়া দিয়া আমাকে চিরঋণে বদ্ধ করিয়াছেন। অগ্রজপ্রতিম ডঃ পীযূষকান্তি মহাপাত্রের সহযোগিতা ও সাধনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেডের কার্যকরী পরিচালক শ্রীযুক্ত দেবদাস নাথ এম.এ., বি.এল মহোদয়ের কর্মতৎপরতায় গ্রন্থটির মুদ্রণকার্য অতিদ্রুত সম্পন্ন হইয়াছে। এইজন্য ইঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রন্থটির মধ্যে মুদ্রণপ্রমাদ কিছু রহিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য সুধী পাঠকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

কলিকাতা
রাস পুর্ণিমা, ১৩৭৭ সাল

শ্রীনরেশচন্দ্র জানা

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

তৃতীয় অধ্যায়

রূপ গোস্বামী (৮৩-১৪৭)

চতুর্থ অধ্যায়

জীব গোস্বামী (১৪৮-১৯৫)

পঞ্চম অধ্যায়

গোপাল ভট্ট গোস্বামী (১৯৬-২২১)

অবতরণিকা

শ্রীচৈতন্য ও ছয় গোস্বামী

বাংলা দেশে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব এক যুগান্তকারী ঘটনা। একটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া কোনও জাতির সাহিত্যে, সমাজে, সংস্কৃতিতে কি যে এক অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে তাহার প্রমাণ শ্রীচৈতন্য। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা দেশ প্রায় আড়াইশত বৎসরের অধিককাল ধরিয়া মুসলমান আক্রমণের ফলে বিপর্যস্ত ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। বাঙালী তাহার দৈহিক, মানসিক ও চারিত্রিক বল হারাইয়াছিল। জাতিভেদ প্রথার জন্য সমাজে কোনও ঐক্য ছিল না। নিম্ন শ্রেণীর লোকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইতেছিল। এই সময়ে শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার প্রবর্তিত প্রেমধর্ম মৃতপ্রায় বাঙালীর প্রাণশক্তির জাগরণ ঘটাইল। তিনি ঘোষণা করিলেন সকল মানুষই সমান। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষই সমান আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হইতে পারে। 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ' এই ছিল তাঁহার বাণী। শ্রীচৈতন্যের ভক্তদের লইয়া প্রতিদিনের কৃত্য ছিল হরিনাম সংকীর্তন। তাঁহার অসামান্য কৃষ্ণপ্রেমতন্ময় ভাবমূর্তি দেখিয়া দলে দলে লোকে তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল, কৃষ্ণপ্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণপ্রেমমহিমা প্রচারের কালে অনুধাবন করিলেন ভাবের বন্যায় জলোচ্ছ্বাস আসিতে পারে কিন্তু কালক্রমে তাহা শুকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, কিন্তু সেই ভাববন্যাকে যদি শাস্ত্রনির্দিষ্ট দৃঢ় মৃত্তিকার খাতে প্রবহমান করানো যায় তাহা হইলে তাহা সুচিরস্থায়ী হইতে পারে। শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণকে উপাস্য দেবতা করিয়াছেন। উঁহার মাধুর্যলীলা বিকাশ করাই তাঁহার জীবনের সাধনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল বৃন্দাবন তখন তাঁহার কল্পনানেত্রে সমুদ্ভাসিত। কিন্তু সেই বৃন্দাবনের মহিমা তখন লুপ্ত। এখন সেই স্থলের লুপ্ত কীর্তি উদ্ধার না করিলে কৃষ্ণপ্রেমের আদর্শ দেখানো হইবে না এই মনে করিয়া শ্রীচৈতন্য সেই বৃন্দাবনের মহিমা পুনরুদ্ধার করিয়া তাহাকে পূর্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন। এই উদ্দেশ্য লইয়া তিনি বৃন্দাবন যাত্রা স্থির করিলেন। নীলাচল হইতে গৌড়দেশ হইয়া কাশী প্রয়াগাদি তীর্থস্থান পরিদর্শন করিয়া চির আকাঙ্ক্ষিত বৃন্দাবনক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। অলৌকিক অন্তঃপ্রেরণার দ্বারা চালিত হইয়া ব্রজমণ্ডলের প্রকৃত লুপ্ত তীর্থস্থলী আবিষ্কার করিলেন। রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড প্রভৃতিও আবিষ্কৃত হইল। এইভাবে বৃন্দাবনের তীর্থমাহাত্ম্যকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি আবার

নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং বৃন্দাবনে বসবাস স্থাপনের ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিলেন কিন্তু মাতা শচীদেবীর এইরূপ দূরবর্তীস্থানের খবরাখবরাদি লইবার অসুবিধা হইবে ভাবিয়া ও গৌড়ীয় ভক্তদের সহিত প্রতি বৎসর মিলন সহজসাধ্য হইবে না মনে করিয়া তিনি বৃন্দাবনে বসবাসের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া নীলাচলে স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করেন। নিজে বৃন্দাবনে বসবাস না করায় একদল ভক্ত যাহাতে বৃন্দাবনে স্থায়ী বসবাস করিয়া বৃন্দাবনের লুপ্ত মাহাত্ম্য পুনরুজ্জীবনে সক্রিয় প্রচেষ্টায় মগ্ন হন, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারই প্রেরণায়, তাঁহারই নির্দেশে একদল ভক্তগোষ্ঠী বৃন্দাবনে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিল এবং বৃন্দাবনকে প্রধান তীর্থক্ষেত্ররূপে গড়িয়া তুলিল।

উপযুক্ত অনুগামী নির্বাচনের সাহায্যেই জননায়কেরা তাঁহাদের জীবনে সার্থকতা অর্জন করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যও তাঁহার মতবাদের ভিত্তিস্থাপনে যে অসামান্য সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন তাহার কারণ তাঁহার এই উপযুক্ত অনুগামী নির্বাচন। তিনি তাঁহার প্রেমপ্লুত জীবনের দিব্য ভাবধারায় যাঁহাদের আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিজ শক্তি সঞ্চারিত করিয়া নব প্রবর্তিত প্রেমধর্মকে শাস্ত্রীয় ভিত্তির উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার আজ্ঞা করিয়াছিলেন। যাঁহারা তীর্থোদ্ধার, বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা এবং শাস্ত্রসংকলন করিয়া শ্রীচৈতন্য কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মমতের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করিয়াছিলেন সেই সকল বৃন্দাবন প্রবাসীদের মধ্যে সনাতন ও রূপ সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই দুই জনের সহিত আরও চারিজন সহযোগী জীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও রঘুনাথ ভট্টের নাম জড়িত হইয়া রহিয়াছে। এই ছয়জনই বৃন্দাবনের 'ছয় গোসাঞি' বলিয়া বৈষ্ণবসাহিত্যে প্রথিত। এই ছয় জনের মধ্যে সনাতনের অকুণ্ঠিত শাস্ত্রনিষ্ঠা, রূপের প্রগাঢ় রসমাধুর্যনিষ্ঠা, জীবের গভীর তত্ত্বনিষ্ঠা, গোপাল ভট্টের সুতীব্র আচারনিষ্ঠা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে দৃঢ়মূল করিয়াছে। ইঁহাদেরই একান্ত চেষ্টায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূলতত্ত্ব ভক্তিবাদের ভিত্তিপত্তন হইয়াছে। এই ছয় জনকে একত্রিত করিবার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব শ্রীচৈতন্যের। শ্রীচৈতন্য যখন গৌড় হইয়া বৃন্দাবনযাত্রা করেন সেই সময়ে রামকেলিতে দুই ভ্রাতা সনাতন ও রূপের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইতিপূর্বে দুই ভ্রাতার সহিত তাঁহার পত্র বিনিময় হইয়াছিল। গৌড়াধিপের অমাত্য হইয়া প্রচুর ঐশ্বর্যের মধ্যে বিরাজ করিয়াও বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য গভীরভাবে তাঁহাদের পত্রে প্রকাশ পাইয়া থাকিবে। তাই শ্রীচৈতন্য স্বয়ং তাঁহাদের বিষয় উদাসীন প্রকৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া রামকেলিতে আসেন মনে করিতে পারা যায়,—

> গৌড় নিকটে আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন।
> তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহা আগমন॥ —চৈ. চ. ২।১।২১১

ইহা ছাড়াও তদানীন্তন গৌড়াধিপের অমাত্য দুই ভ্রাতার প্রগাঢ় প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য এবং মনীষার পরিচয়ও শ্রীচৈতন্য পাইয়া থাকিবেন। বৃন্দাবন যাত্রাপথে নবদ্বীপে সনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে শ্রীচৈতন্য কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন ('আসি বিদ্যাবাচস্পতি গৃহেতে রহিলা'—চৈ. চ. ২।১।১৪৯)। তাঁহার নিকট হইতে দুই ভ্রাতার অপার শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া মোটেই অসম্ভব নহে। সুতরাং প্রেমধর্মকে শাস্ত্রভিত্তিক করিবার যে উপযুক্ত লোকের সন্ধান তিনি করিতেছিলেন সেই উপযুক্ত লোকের মহতী সম্ভাবনা এই দুই ভ্রাতার মধ্যে তিনি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। দুই ভ্রাতার শ্রীমদ্ভাগবতে অনুরক্তি এবং বৃন্দাবনলীলার অনুধ্যান প্রভৃতির খবরও তাঁহার নিকট সম্ভবতঃ অজানা ছিল না।

বাড়ীর নিকট অতিনিভৃত স্থানেতে।
কদম্ব কানন রাধা শ্যামকুণ্ড তাতে॥
বৃন্দাবনলীলা তথা করয়ে চিন্তন।
না ধরে ধৈরয নেত্রে ধারা অনুক্ষণ॥

—ভ. র. ১।৬০৫-৬০৬

তাই ভাগবত শাস্ত্রাদিতে গভীর পাণ্ডিত্য এবং ভক্তজনোচিত ভাবুকতার লক্ষণাদি পাইয়া দুই ভ্রাতাকে বৃন্দাবনে পাঠাইবার পরিকল্পনা মনে পোষণ করিলেন। রামকেলিতে দুই ভ্রাতাকে বলিলেন, 'অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিব উদ্ধার'। শ্রীচৈতন্যের পুণ্য জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া দুই ভ্রাতা বিষয় বাসনাকে বিষের মত পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসীর বেশে বৃন্দাবনপথে চলিলেন। শ্রীচৈতন্যও পথিমধ্যে তাঁহাদের নিজশক্তি সঞ্চারিত করিয়া লুপ্ত তীর্থোদ্ধার, বিগ্রহ আবিষ্কার ও শাস্ত্ররচনার নির্দেশ দিয়া ব্রজমণ্ডলে পাঠাইয়া দিলেন। দুই ভ্রাতাও শ্রীচৈতন্যের অনুশাসন শিরোধার্য করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়া স্থায়ীবাস গড়িয়া তুলিলেন। ইহার পর উঁহাদের সহিত আসিয়া সংযুক্ত হইলেন তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র চিরকুমার জীব। তাহার পর একদিকে শ্রীচৈতন্যেরই নির্দেশে পিতা ও মাতা বিয়োগের পর দাক্ষিণাত্য হইতে গোপাল ভট্ট এবং উত্তর ভারতের কাশী হইতে ভাগবতপাঠক পরম ভাগবত রঘুনাথ ভট্ট আসিলেন।

প্রভু গৌরচন্দ্র গোপালেরে স্থির করি।
উপদেশ কৈল যৈছে কহিতে না পারি॥
পুনঃ কহে অচিরে যাইবা বৃন্দাবন।
মিলিব দুর্লভ রত্ন রূপ সনাতন॥ —ভ. র. ১।১২০-১২১
আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবন।
তাঁহা যাই রহ যাঁহা রূপ সনাতন॥ —চৈ. চ. ৩।১৩।১২০

শ্রীচৈতন্যের ও স্বরূপের অন্তর্ধানের পর তাঁহার প্রিয়ভক্ত গৌড়ের রঘুনাথ দাস নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ সনাতনের সহিত মিলিত হইলেন।

ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।
স্বরূপের অন্তর্ধানে আইলা বৃন্দাবন॥ —চৈ. চ. ১৷১০৷৯৩

এই ছয়জনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইল। বৃন্দাবনে তাঁহারা প্রধান আচার্যরূপে সম্মাননীয় হইয়া উঠিলেন এবং পরবর্তীকালে 'ছয় গোসাঞি' রূপে খ্যাত হইলেন। বাংলার বৈষ্ণবসমাজ বৃন্দাবনের এই গোস্বামীদের সর্বাধিপত্য অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইল।

প্রথম অধ্যায়

ছয় গোস্বামী শব্দের উদ্ভব

জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥ —নরোত্তম ঠাকুরকৃত
নাম সংকীর্তন (গৌর-পদতরঙ্গিণী, ২য় সং, পৃঃ ৩৪০)

সেকালে গণেশের নাম লইয়া সকল শুভকার্য আরম্ভ করিবার রীতি ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গণেশের পরিবর্তে ছয় গোস্বামীকে বন্দনা করিয়াছেন। এই ছয় গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রধান আচার্যরূপে শাস্ত্র প্রণয়ন, লুপ্ত তীর্থোদ্ধার এবং বৈষ্ণবাচার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ছয় গোস্বামীর মধ্যে চার জনের কথা রূপ ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে লিখিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন,—

গোপালরূপশোভাং দধদপি রঘুনাথভাববিস্তারী।
তুষ্যতু সনাতনাত্মা, প্রথমবিভাগে সুধাম্বুনিধেঃ॥ —১।৪।২১

ইহার সাধারণ অর্থ—গোপাল রূপ শোভা ধারণ করিয়াও যিনি রঘুনাথের ভাব বিস্তার করেন, সেই সনাতনাত্মা কৃষ্ণ এই ভক্তিরসামৃতের প্রথম বিভাগে তুষ্টিলাভ করুন। শ্লেষার্থ—গোপাল ভট্ট ও এই গ্রন্থকার রূপের শোভার (ইচ্ছার) পোষণকারী রঘুনাথের (রঘুনাথ দাসের) ভাব অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম বিস্তারকারী সেই সনাতন গোস্বামী এই প্রথম বিভাগে তুষ্ট হউন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে জীব প্রাধান্য লাভ করেন নাই। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকায় রঘুনাথ বলিতে শুধু রঘুনাথ দাসের কথাই বলিয়াছেন, রঘুনাথ ভট্টের কথা বলেন নাই। মুরারি গুপ্তের কড়চায় গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও জীবের নাম নাই। কবি কর্ণপূরের চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে ও বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবতে, জয়ানন্দ ও লোচনের চৈতন্যমঙ্গলে রূপ ও সনাতন ব্যতীত অন্য কোন গোস্বামীর উল্লেখ নাই। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে কবি কর্ণপুর গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট ও জীবের কথা বলেন নাই। কবি কর্ণপূরের কেবল গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাতেই ছয়জন গোস্বামীর নাম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহা একস্থানে নাই।

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে রচিত গৌরগণোদ্দেশদীপিকাতে কবি কর্ণপুর একসঙ্গে রূপ ও সনাতনের নাম করিয়া (১৮০ ও ১৮২ শ্লোক) শিবানন্দ চক্রবর্তীর (১৮৩ শ্লোক) নাম দিয়াছেন। তাহার পর আবার গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাসের (১৮৪-১৮৬ শ্লোক) নাম দিয়াছেন। ইঁহাদের সঙ্গে জীবের নাম করেন নাই। গ্রন্থের শেষদিকে রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের নাম করিবার পর বল্লভাত্মজ শ্রীমান জীবের (২০৩ শ্লোক) নাম করিয়াছেন। এই ধরনের উল্লেখ হইতে ধারণা জন্মে যে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দেও ছয় গোস্বামী শব্দের প্রচলন তো দূরের কথা, পাশাপাশি ছয় জনের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে একত্রে বন্দনা জানাইবার রীতি প্রচলিত হয় নাই। চৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে মঙ্গলাচরণে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন,—

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
তা সবার পাদপদ্মে করি নমস্কার॥—১।১।১৮-১৯

এইখানে ছয় জনের নাম একত্রে করা হইলেও তাঁহাদিগকে ছয় গোস্বামী বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। সেইজন্য যাঁহারা মনে করেন যে চৈতন্যচরিতামৃত হইতে ছয় গোস্বামী শব্দের প্রয়োগ প্রবর্তিত হইয়াছে, তাঁহাদের ধারণা তথ্যসহ নহে।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছাড়া অন্য কেহ 'ছয় গোসাঞি' শব্দ প্রয়োগ করেন নাই।[১] এই উক্তি তথ্যসহ নহে। বরং তাঁহার মন্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলা যায় যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বয়ংই 'ছয় গোসাঞি' শব্দটি ব্যবহার করেন নাই। প্রকৃত পক্ষে নরোত্তম ঠাকুর-কৃত নাম সংকীর্তনেই প্রথম 'ছয় গোসাঞি' শব্দের স্পষ্ট প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ইঁহার পূর্বে অন্য কেহ 'ছয় গোসাঞি' কথাটি ব্যবহার করেন নাই।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ সনাতন, রূপ ও জীবকে 'গোঁসাঞি' সম্বোধনে অভিহিত করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাগবত সন্দর্ভ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।
এই শ্লোক জীব গোসাঞি করিয়াছেন ব্যাখ্যানে॥—চৈ. চ. ১।৩।৬৫
এই দুই শ্লোকের আমি যে করিব অর্থ।
শ্রীরূপ গোসাঞি শ্লোক প্রমাণ সমর্থ॥—চৈ. চ. ১।৪।২২৯
তবে সনাতন গোসাঞির পুনরাগমন।
জ্যেষ্ঠমাসে তাঁরে কৈল পরীক্ষণ॥—চৈ. চ. ২।১।২৪৬

[১] বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৬, পাদটীকা

কিন্তু রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট ও গোপাল ভট্ট 'গোসাঞি' আখ্যায় ভূষিত হন নাই দেখা যাইতেছে। ইহা হইতে মনে হয় চৈতন্যচরিতামৃত রচনাকালে তখনও হয়তো ইঁহারা 'গোসাঞি' হিসাবে পরিচিত হন নাই।

পাঠান আমলের শেষে ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দের একখানি রাধাকুণ্ডের জমি কিনিবার সরকারী দলিল হইতে জানা যাইতেছে যে শুধু জীবকেই গোস্বামী বলা হয় নাই, তাঁহার পিতা বল্লভকেও গোঁসাই বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে কেবলমাত্র রঘুনাথ দাসই বলা হইয়াছে। গোস্বামী আখ্যা দেওয়া হয় নাই। এই দলিলের একত্রিশ বছর পরে আকবরের রাজ্যকালে ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দের রাধাকুণ্ডের জন্য একটি জমির দলিলেও জীবকে গোঁসাই বলা হইয়াছে কিন্তু রঘুনাথ দাস গোস্বামী আখ্যায় ভূষিত হন নাই। ইহা হইতে মনে হয় লোকসমাজে ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্তও তিনি গোঁসাই হিসাবে পরিচিত ছিলেন না। থাকিলে দলিলে হয়তো ঐ শব্দের ব্যবহার থাকিত।[১]

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্যদিগকে গোঁসাইরূপে আখ্যাত করিবার রীতি কি ভাবে কখন প্রচলিত হইয়াছিল তাহা বলা দুষ্কর। গোঁসাই উপাধি বল্লভাচারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়েও পরিলক্ষিত হয়।[২] ইহা তাহাদের নিকট হইতে গৃহীত কিনা বলা যায় না। গোঁসাই শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি এবং কি ভাবে ইহার প্রয়োগ কখন হইতে হইতেছিল তাহাও বলা কঠিন।

গোঁসাই শব্দটি সংস্কৃত 'গোস্বামিন্' শব্দজাত, সংস্কৃত-গোস্বামিন্ > প্রাকৃত গোস্সাবি > প্রাচীন বাংলা গোসাঞি-গোঁসাই।[৩] ডঃ সুশীলকুমার দে ও কেনেডি গোস্বামী শব্দের উদ্ভব ও তাৎপর্যার্থ অস্পষ্ট বলিয়াছেন এবং আক্ষরিক অর্থ 'lord of cows' বলিয়াছেন।[৪] গোরুর অধিপতি এই অর্থে ইহা মনুসংহিতাদিতে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করা যায়।

গোস্বাম্যনুমতে ভৃত্যঃ সা স্যাৎ পালেঽভৃতে ভৃতিঃ।

—মনুসংহিতা ৮।২৩১

তাবৎ ভূয়ো বা গোস্বামিনে দত্ত্বা।

—কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ১৫।৬।২২

কেহ কেহ 'গো' অর্থে ইন্দ্রিয় ধরিয়া 'গবাং ইন্দ্রিয়াণাং স্বামী' এইরূপ ষষ্ঠী-

১ পরিশিষ্টে দলিল সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

২ Wilson—*A Glossary of Judicial and Revenue Terms*, p. 183

৩ ডঃ সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৪২

৪ *Early history of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal*, p. 82 fn. *The Chaitanya Movement*, p. 26

তৎপুরুষ সমাস করিয়া 'গোস্বামী'র অর্থ জিতেন্দ্রিয় করিয়াছেন।[১] 'গো' শব্দের ইন্দ্রিয় অর্থ মেদিনী, অমরকোষাদি কোনও প্রাচীন অভিধানে পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু সনাতন গোস্বামীর বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী টীকায় (১০।২৯।৮) 'গো' শব্দের ইন্দ্রিয় অর্থ লক্ষ্য করা যায়,—'গা ইন্দ্রিয়াণি ঈশ্বরত্বেন বিন্দতীতি যথা'।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে গোঁসাই শব্দের অপ্রচুর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

গোসাঞিঁ সোঁঅরি কাহ্নাঞিঁ ঝাঁট বাহ নাএ।

—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, সা. প., ৮ম সং, পৃঃ ৬৩

কথার সঙ্গতি নাই চিন্তিলেক গোঁসাই।

—চণ্ডীমঙ্গল, বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৮

দেবতার ভোগ লাগি সৃজিলে গোঁসাই।—মনসামঙ্গল

(বিজয়গুপ্ত), সা. প. সং, পৃঃ ১৩৩

সমাধান করিবা গোঁসাই আপনি।—মহাভারত (বিজয় পণ্ডিত),

সা. প. সং, পৃঃ ২৪৪

এই সব স্থানে 'গোঁসাই' কর্তা স্রষ্টা, ঈশ্বর, ভগবান ইত্যাদিই বুঝাইতেছে ধারণা হয়। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে ভগবান, ঈশ্বর ইত্যাদি অর্থেই গোঁসাই শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

প্রভু বলে, আন আন এথা কিছু নাই।
ভক্ত সব গ্রাস পাই সভরে গোসাঞি॥—চৈ. ভা. ২।৮

হাসি গেল দুই প্রভু সন্ন্যাসীর স্থানে।
বিশ্বম্ভর সন্ন্যাসীরে করিলা প্রণামে॥

* * *

সন্তোষে সন্ন্যাসী করে বহু আশীর্বাদ।
ধনবংশ সুবিবাহ হউ বিদ্যালাভ॥
প্রভু বলে, গোসাঞি এ নহে আশীর্বাদ।
হেন বোল, তোরে হউ কৃষ্ণের প্রসাদ॥—চৈ. ভা. ২।১৯

এখানে গোসাঞি 'সম্মানীয় বা পূজ্য' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে মনে হয়।

বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈত আচার্য এবং নিত্যানন্দের সহিত গোঁসাই শব্দটি যুক্ত করিয়াছেন।

১ নগেন্দ্রনাথ বসু—বিশ্বকোষ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৬০৫ ; হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বংগীয় শব্দকোষ, পৃঃ ১১৪৬ ; বাচস্পত্য অভিধান, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৭২৯

যঁহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি। —চৈ. ভা. ১৷২
যার শিষ্য মহাপ্রভু আচার্য গোসাঞি। —চৈ. ভা. ১৷৬
শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি। —চৈ. ভা. ২৷৫

এখানে আচার্য বা পূজ্য অর্থেই প্রযুক্ত মনে হয়। জয়ানন্দও চৈতন্যমঙ্গলে গোসাঞি শব্দের ব্যবহার এই অর্থে করিয়াছেন মনে করা যায়।

চৈতন্যদর্শনে তাঁর শাপ বিমোচন।
গোসাঞি নাম থুইলেন রূপ সনাতন ॥ —তীর্থখণ্ড

কবি কর্ণপূরও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে গোস্বামী শব্দের ব্যবহার এই অর্থেই করিয়াছেন মনে হয়।

'কোঽসৌ চৈতন্য গোস্বামী'—১ম অংক
'মহাশয় আজ্ঞাপয়তি ভগবানদ্বৈত গোস্বামী ভবন্তং'—১০ম অংক

বৃন্দাবনদাস কেবল শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে গোঁসাই বলিয়াছেন কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে বহুজনকেই গোঁসাই বলিয়াছেন।

চৈতন্য গোসাঞির এই তত্ত্ব নিরূপণ। —১৷২৷১০২
আচার্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
নিত্যানন্দ গোসাঞি সাক্ষাৎ হলধর ॥ —১৷৩৷৫৯
পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য অনন্ত আচার্য। —১৷৭৷৫৪
কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য গোবিন্দ গোসাঞি। —১৷৮৷৬১
যাদবাচার্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী। —১৷৮৷৬২
পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোসাঞি। —১৷৮৷৬৩
শুনি পুরী গোসাঞি কিছু মনে বিচারিল। —১৷৪৷১১৮

এই গোঁসাই শব্দের বহুল প্রয়োগ হইতে মনে হয় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে পূজ্য বা সম্মানীয় ব্যক্তিমাত্রকেই গোসাঞি নামে অভিহিত করা হইত। বর্তমানে প্রাচীন বৈষ্ণব আচার্যের বংশধরেরা প্রায়ই গোঁসাই বা গোস্বামী নামে নিজদিগকে পরিচয় দিয়া থাকেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভাইয়ের বংশধরেরাও গোস্বামী পদবী গ্রহণ করিয়াছেন। গোঁসাই শব্দের যে বিশেষ অর্থ ছিল তাহা এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্বতন্ত্রভাবে কাশীশ্বর, ভূগর্ভ, গোবিন্দ, যাদবাচার্য প্রভৃতি গোঁসাই বলিয়া আখ্যাত হইলেও 'ছয় গোসাঞি' বলিতে সমষ্টিগতভাবে যে সনাতন, রূপ, জীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাসকে বোঝায় তাহা প্রকৃতপক্ষে নরোত্তম ঠাকুর কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছে বলিতে হয়। কেননা তৎকৃত নামসংকীর্তনেই সর্বপ্রথম 'ছয় গোসাঞি' শব্দের স্পষ্ট প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাইতেছে।

ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়, শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনে উপস্থিতি কালে সনাতন,

রূপ ও রঘুনাথ ভট্ট অপ্রকট হইয়াছেন এবং রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট ও জীব তখনও জীবিত রহিয়াছেন। শ্রীনিবাস গোপাল ভট্টের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া জীব প্রভৃতির নিকটে রূপ সনাতনাদি প্রণীত শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠাভ্যাস করেন। ইহার কিছুদিন পরে নরোত্তম ঠাকুর বৃন্দাবনে উপনীত হন এবং লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষিত হইয়া শ্রীনিবাসেরই মত জীব গোস্বামীর নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন শুরু করেন। ধারণা, নরোত্তম ঠাকুর সনাতন, রূপ, জীব ও গোপাল ভট্ট প্রভৃতির প্রগাঢ় প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য, সাধন ও প্রযত্নের জন্য এবং ইঁহারা প্রত্যেকেই বৃন্দাবনে বাস করিতেন বলিয়া এবং ইঁহাদেরই সাহায্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূলস্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে বলিয়া শ্রদ্ধাবশতঃ ছয় গোসাঞি বা ছয় আচার্য বা পূজ্য ব্যক্তি বলিয়া ইঁহাদিগকে উদ্দিষ্ট করেন। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সমাজে নরোত্তম প্রযুক্ত 'ছয় গোস্বামী' শব্দটি প্রচলিত হইয়া যায় এবং তাহা কেবল ঐরূপ সনাতন ইত্যাদিকেই বুঝাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইতে থাকে। সতীশচন্দ্র মিত্র 'সপ্ত গোস্বামী' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। লোকনাথ গোস্বামীকে ধরিয়া তিনি গোস্বামীর সংখ্যা সাতজন করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণবসমাজে 'সপ্ত গোস্বামী' কথার কোনও প্রচলন নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সনাতন গোস্বামী

শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে শাস্ত্রীয় ও দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার মূলে ছয় গোস্বামীর মধ্যে সনাতন, রূপ ও জীব এই তিন জনের অবদান অপরিমেয়। ইঁহাদের মধ্যে সনাতন বয়ঃজ্যেষ্ঠ।

প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অসাধারণ মনীষা ও দার্শনিক প্রজ্ঞার পরিচয় ইঁহাদের প্রণীত অমূল্য গ্রন্থরাজির মাধ্যমে পাওয়া গেলেও ব্যক্তিগত জীবনের বিশদ পরিচয় দুর্লভ। বর্তমানযুগের ন্যায় ঐতিহাসিক সচেতনতা মানুষের পূর্বে ছিল না। ইঁহাদের জীবনকাহিনী সুসম্বদ্ধ আকারে কেহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। চৈতন্যচরিত গ্রন্থাদিতে ও অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থরাজিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু মাত্র তথ্য পাওয়া যায়। এই স্বল্প উপাদান লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ জীবনকাহিনী রচনা সম্ভবপর নহে, তবে তাঁহাদের জীবনী সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

বংশ পরিচয়

জীব কৃত লঘু বৈষ্ণবতোষণীর অন্ত্যে প্রদত্ত বংশ পরিচায়িকা হইতে তাঁহাদের আদি বাসস্থান, পূর্বপুরুষ প্রভৃতি সম্পর্কে কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। সেই বংশ পরিচায়িকাটি এখানে উদ্ধৃত করা হইল।

শ্রীমচ্চৈতন্য রূপস্য প্রীত্যৈ ভগবতঃ কৃতা।
টিপ্পনী দশমস্কন্ধে পূর্ণা বৈষ্ণবতোষণী ॥
যে শ্রীভাগবতং প্রাপ্য স্বপ্নে প্রাতশ্চ জাগরে।
স্বপ্নদৃষ্টাদেব বিপ্রাৎ প্রথমে বয়সি স্থিতাঃ ॥
মমজ্জুঃ শ্রীভগবতঃ প্রেমামৃতমহাম্বুধৌ।
তেষামেব হি লেখোঽয়ং শ্রীসনাতননামিনাম্ ॥
তদেতদ্বিনিবেদ্যাপি কিঞ্চিদন্যদ্বিবক্ষয়া।
অথো তদঙ্ঘ্রিজীবেন জীবেনেদং নিবেদ্যতে ॥
উদ্যাচ্চারুপদক্রমাশ্রিতবতী যস্যামৃতস্রাবিণী
জিহ্বাকল্পলতা ত্রয়ী মধুকরী ভূয়োঽনরীনৃত্যত।
রেজে রাজসভাসভাজিতপদঃ কর্ণাটভূমিপতিঃ
শ্রীসর্বজ্ঞ জগদ্গুরুর্ভুবি ভরদ্বাজান্বয়গ্রামণীঃ ॥

পুত্রস্তস্য নৃপস্য কশ্যপতুল্যমারোহতো রোহিণী-
কান্তস্পর্ধিযশোভরঃ সুরপতেস্তুল্যপ্রভাবোঽভবৎ।
সর্বক্ষ্মাপতিপূজিতোঽখিলযজুর্বেদৈকবিশ্রামভূ-
র্লক্ষ্মীবাননিরুদ্ধদেব ইতি যঃ খ্যাতিং ক্ষিতৌ জগ্মিবান্॥
মহিষ্যোর্ভূপস্য প্রথিতযশসস্তস্য তনয়ৌ
প্রজজ্ঞাতে রূপেশ্বর হরিহরাখ্যৌ গুণনিধী।
তয়োরাদ্যঃ শাস্ত্রে প্রবলতরভাবং বহুবিধে
জগামান্যঃ শস্ত্রে নিজনিজগুণপ্রেরিততয়া॥
বিভজ্য স্বং রাজ্যং মধুরিপুপুরপ্রস্থিতদিনে
পিতা তাভ্যাং রূপেশ্বরহরিহরাভ্যাং কিল দদৌ।
নিজজ্যেষ্ঠং রূপেশ্বরমথ কনিষ্ঠো হরিহরঃ
স্বরাজ্যাদার্যাণাং কুলতিলকমভ্রংশয়দসৌ॥
শ্রীরূপেশ্বরদেব এবমরিভির্নির্ধূতরাজ্যঃ ক্রমা-
দষ্টাভিস্তুরগৈঃ সমং দয়িতয়া পৌরস্ত্যদেশং যযৌ।
তত্রাসৌ শিখরেশ্বরস্য বিষয়ে সখ্যুঃ সুখং সংবসন্
ধন্যঃ পুত্রমজীজনদ্গুণনিধিং শ্রীপদ্মনাভাভিধম্॥
যজুর্বেদঃ সাঙ্গো বিততিরপি সর্বোপনিষদাং
রসজ্ঞায়াং যস্য স্ফুটমঘটয়ত্তাণ্ডবকলাম্।
জগন্নাথপ্রেমোল্লসিতহৃদয়ঃ কর্ণপদবীং
ন যাতঃ কেষাং বা স কিল নৃপরূপেশ্বরসুতঃ॥
বিহায় গুণিশেখরঃ শিখরভূমিবাসস্পৃহাং
স্ফুরৎসুরতরঙ্গিণীতটনিবাসপর্য্যুৎসুকঃ।
ততো দনুজমর্দনক্ষিতিপপূজ্যপাদঃ ক্রমা-
দুবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী॥
মূর্তিং শ্রীপুরুষোত্তমস্য যজতস্তত্রৈব সত্রোৎসবৈঃ
কন্যাষ্টাদশকেন সার্ধমভবন্নেতস্য পঞ্চাত্মজাঃ।
তত্রাদ্যঃ পুরুষোত্তমঃ খলু জগন্নাথশ্চ নারায়ণো
ধীরঃ শ্রীলমুরারিরুত্তমগুণঃ শ্রীমান্ মুকুন্দঃ কৃতী॥
জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবরঃ শ্রীমান্ কুমারাভিধঃ
কশ্চিদ্দ্রোহমবাপ্য সৎকুলজনির্বঙ্গালয়ং সঙ্গতঃ।
তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠবৈষ্ণবগণপ্রেষ্ঠাস্ত্রয়ো জজ্ঞিরে
যে স্বং গোত্রমমুত্র চেহ চ পুনশ্চক্রুস্তরামর্চিতম্॥

আদিঃ শ্রীলসনাতনস্তদনুজঃ শ্রীরূপনামা ততঃ
শ্রীমদ্বল্লভনামধেয়বলিতো নির্বেদ্য তে রাজ্যতঃ।
আসাদ্যাতিকৃপাং ততো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতঃ
সাম্রাজ্যং খলু ভেজিরে মুরহরপ্রেমাখ্যভক্তিশ্রিয়ি ॥
যঃ সর্বাবরজঃ পিতা মম স তু শ্রীরামমাসেদিবান্
গঙ্গায়াং দ্রুতমগ্রজৌ পুনরমূ বৃন্দাবনং সঙ্গতৌ।
যাভ্যাং মাথুরগুপ্ততীর্থনিবহো ব্যক্তীকৃতো, ভক্তির-
প্যুচ্চৈঃ শ্রীব্রজরাজনন্দনগতা সর্বত্র সংবর্ধিতা ॥
যস্মিন্নং রঘুনাথদাস ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ রাধিকা-
কৃষ্ণপ্রেম মহার্ণবোর্মিনিবহে ঘূর্ণন্ সদা দীব্যতি।
দৃষ্টান্তপ্রকরপ্রভাভরমতীত্যে বানয়োর্ব্রজতো-
র্যস্তুল্যত্বপদং মতস্ত্রিভুবনে সাশ্চর্যমার্যোত্তমৈঃ ॥
গোপালবালকব্যাজাদ্‌যয়োঃ সাক্ষাদ্বভূব হ।
সাক্ষাচ্ছ্রীযুতগোপালঃ ক্ষীরাহরণলীলয়া ॥
তয়োরনুজস্তেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকম্।
শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশশ্ছন্দোঽষ্টাদশকং তথা ॥
স্তবাশ্চোৎকলিকাবল্লী গোবিন্দবিরুদাবলী।
প্রেমেন্দুসাগরাদ্যাশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ ॥
বিদগ্ধললিতাগ্রাখ্যমাধবং নাটকদ্বয়ম্।
ভাণিকা দানকেল্যাখ্যা রসামৃতযুগং পুনঃ ॥
মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা।
সংক্ষিপ্তা ভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ ॥
অথাগ্রজকৃতেষ্বগ্র্যং শ্রীল ভাগবতামৃতম্।
হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকা দিক্‌প্রদর্শিনী ॥
লীলাস্তবষ্টিপ্পনী চ সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী।
যা সংক্ষিপ্তা ময়া ক্ষুদ্রজীবেনাপি তদাজ্ঞয়া ॥
অবুদ্ধ্যা বুদ্ধ্যা বা যদিহ ময়কাঽলেখি সহসা।
তথা যদ্বাচ্ছেদি দ্বয়মপি সহেরন্ পরমমী ॥

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের প্রীতির জন্য প্রভু কর্তৃক ভাগবতের দশমস্কন্ধের টিপ্পনী বৈষ্ণব-তোষণী করা হইয়াছে। যিনি প্রথম বয়সে স্বপ্নে জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে শ্রীমদ্ভাগবত লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রভাতে সেই স্বপ্নদৃষ্ট দ্বিজ হইতে উহা পাইয়াছিলেন, যিনি তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রেমামৃতসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন সেই সনাতন

প্রভুর লিখিত এই গ্রন্থ। সেই হেতু অগ্রে তাঁহার লিখিত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া আরও কিছু বলিবার ইচ্ছায় তৎপাদপদ্মাশ্রিত জীব ইহা নিবেদন করিতেছে।

শ্রীসর্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু নামে কর্ণাটাধিপতি পৃথিবীর মধ্যে একজন বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। তাঁহার প্রচুরোৎকৃষ্ট শব্দবিন্যাসময়ী, অমৃতনিঃস্যন্দিনী, বেদত্রয়রূপ কল্পলতার মধুকরীতুল্য জিহ্বা নিরন্তর নৃত্য করিত। তিনি রাজমণ্ডলীর পূজ্যপাত্র ও ভরদ্বাজগোত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। কল্পোপম সেই নৃপতির এক পরম শ্রীসম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার যশোরাশি চন্দ্রস্পর্ধী, প্রভাব ইন্দ্রতুল্য ছিল। সমস্ত রাজবৃন্দের তিনি পূজ্য ছিলেন। সমগ্র যজুর্বেদের তিনি অদ্বিতীয় উপদেষ্টা ছিলেন। পৃথিবীতে অনিরুদ্ধ দেব নামে খ্যাত ছিলেন। সেই প্রথিতযশা নৃপতির পত্নীদ্বয় হইতে রূপেশ্বর ও হরিহর নামে দুইজন গুণবান পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজ নিজ স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ প্রথমটি বহুবিধ শাস্ত্র এবং অপরটি শস্ত্রে প্রবল প্রতিপত্তি লাভ করিল। বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিদিনে পিতা নিজরাজ্য ভাগ করিয়া সেই রূপেশ্বর ও হরিহরকে যথাযোগ্য অংশ দান করিল। পিতার মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ হরিহর পূজ্য ব্যক্তিগণের ভূষণস্বরূপ স্বীয় অগ্রজ রূপেশ্বরকে স্বরাজ্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিল। রূপেশ্বর এইভাবে রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া ভার্যার সহিত অষ্ট অশ্বে আরোহণ করিয়া পৌরস্তদেশে গমন করিলেন। সেইখানে রূপেশ্বর সখা শিখরেশ্বরের রাজ্যে সুখে বাস করিয়া ধন্য হইলেন এবং পদ্মনাভ নামে এক গুণবান পুত্র উৎপাদন করিলেন যাঁহার জিহ্বায় সাঙ্গ যজুর্বেদ এবং সকল উপনিষদের বিস্তৃতিশাস্ত্র স্পষ্টরূপে নৃত্য করিত। সেই জগন্নাথ প্রেমে বিগলিত ও প্রফুল্লহৃদয় রূপেশ্বরের পুত্রের কথা কাহার কর্ণপথে না প্রবেশ করিয়াছে? সেই গুণিশেখর পদ্মনাভ শিখর দেশে বাসেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া শোভাময়ী গঙ্গাতীরে বাস করিতে ইচ্ছুক হইলে রাজা দনুজমর্দন কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া নবহট্টকে বাস করিয়াছিলেন। সেইখানে তিনি যাগযজ্ঞোৎসবাদি দ্বারা শ্রীপুরুষোত্তমের পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহার অষ্টাদশ কন্যা ও পাঁচজন পুত্র জন্মিয়াছিল। পুত্রগণের মধ্যে পুরুষোত্তম সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তৎপরে জগন্নাথ দ্বিতীয় ছিলেন। নারায়ণ ধীরস্বভাবের ছিলেন। তদনন্তর উত্তমগুণযুক্ত মুরারি এবং যশস্বী মুকুন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মুকুন্দের কুমার নামে একটি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সদ্বংশজাত কুমার কিঞ্চিৎ দ্রোহহেতু বঙ্গদেশে গমন করেন। কুমারের পুত্রগণের মধ্যে তিনটি পরমপূজ্য বৈষ্ণবগণের প্রিয়তম হইয়াছিলেন। তাঁহারা নিজকুলকে ইহলোকে ও পরলোকে বিশেষরূপে সর্বজনপূজিত করিয়াছিলেন। সনাতন জ্যেষ্ঠ ছিলেন। অনুজ রূপ ও তদনুজের নাম বল্লভ ছিল। ইঁহারা তিনজন বৈরাগ্যহেতু রাজ্য পরিত্যাগ করেন এবং তৎপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব হইতে অতিশয় কৃপালাভ

করিয়া কৃষ্ণপ্রেমনাম্নী ভক্তিলক্ষ্মীকে পাইবার নিমিত্ত ভক্তিসাম্রাজ্যের উপাসনা করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ শ্রীবল্লভ আমার পিতা ছিলেন। তিনি গঙ্গাতীরে শ্রীরামচন্দ্রের ধাম লাভ করেন। তাঁহারা মথুরামণ্ডলের গুপ্ততীর্থসমূহ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের দ্বারাই কৃষ্ণভক্তি সর্বত্র বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল, রঘুনাথ দাস তাঁহাদের মিত্র ছিলেন। তিনি সর্বদা রাধাকৃষ্ণপ্রেমসমুদ্রের তরঙ্গ-রাশিতে সঞ্চরণ করতঃ ক্রীড়া করেন। সকল সজ্জনশ্রেষ্ঠ সবিস্ময়ে রঘুনাথকে তাঁহাদের তুল্য তত্ত্ব বলিয়া পূজা করিতেন। সাক্ষাৎ গোপাল গোপবালক বেশে ক্ষীর দান করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। অনুজ রূপ কর্তৃক লিখিত গ্রন্থরাজির মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি : যথা, হংসদূত, উদ্ধব-সন্দেশ, অষ্টাদশ ছন্দ, উৎকলিকাবল্লী, গোবিন্দবিরুদাবলী, প্রেমেন্দুসাগরাদ্রি প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত। ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব নামে নাটকদ্বয়, দানকেলি নামে ভাণিকা, রসামৃতযুগল, মথুরামহিমা, নাটকচন্দ্রিকা ও লঘু ভাগবতামৃত প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থ। রূপাগ্রজ সনাতন লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রথম ভাগবতামৃত, তৎপরে দিক্‌প্রদর্শিনী টীকাসহ হরিভক্তিবিলাস, লীলাস্তব, তদনন্তর এই দশমটিপ্পনী বৈষ্ণব-তোষণী তদাজ্ঞায় ক্ষুদ্রজীব কর্তৃক যাহা সংক্ষিপ্তীকৃত হইল। আমি দৃঢ়তার সহিত এই গ্রন্থে বুদ্ধিপূর্বক বা অবুদ্ধিপূর্বক যাহা লিখিয়াছি এবং তাঁহাদের ব্যাখ্যা যেখানে যেখানে পরিত্যাগ করিয়াছি, শ্রীল সনাতন তাহা উভয়ই বিশেষভাবে মার্জনা করিবেন।

উপরোক্ত বিবরণী হইতে সনাতন রূপ আদির বংশলতিকা এইরূপ দাঁড়ায়,—
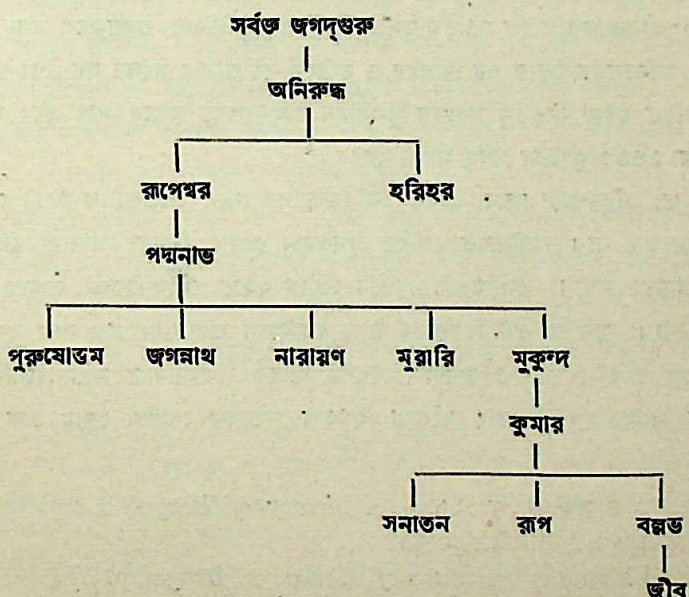
কর্ণাট দেশীয় সর্বজ্ঞ জগদ্‌গুরুই আদিপুরুষ ছিলেন দেখা যাইতেছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বিপ্ররায় বা বিপ্ররাজাকে যে আদিপুরুষ বলিয়াছেন তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে।[১]

নগেন্দ্রনাথ বসু তৎসম্পাদিত বিশ্বকোষে (৭ম খণ্ড, পৃঃ ১১১২) রূপ-সনাতনাদির পূর্বপুরুষদের আবির্ভাব ও তিরোভাব কালের একটি নির্দিষ্ট সময়সূচী নিম্নোক্তরূপ দিয়াছেন।
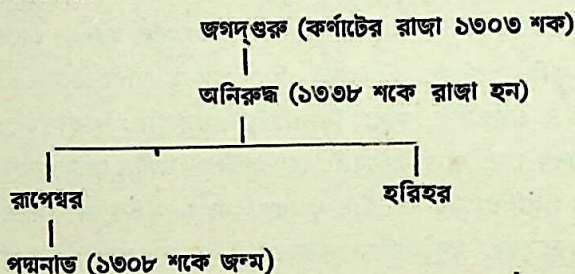
অনিরুদ্ধ ১৩৩৮ শকে রাজা হইয়াছেন আর তাঁহার পৌত্রের জন্ম ১৩০৮ শকে হইয়াছে ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। যাহাই হউক, এই তারিখগুলি নগেন্দ্রনাথ বসু কোথা হইতে পাইয়াছিলেন জানা যায় নাই, ইহাদের কোনওরূপ প্রামাণিকতারও পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সম্ভবতঃ এই কালপঞ্জীর উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন যে ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে জগদ্‌গুরু কর্ণাটের রাজা হন এবং ১৪১৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। অনিরুদ্ধের সহিত গৌড়ের মুসলমান রাজার দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে সখ্য স্থাপিত হয়। অনিরুদ্ধের মৃত্যুর পর রূপেশ্বর ও হরিহর দুই ভ্রাতার সংঘর্ষ হয় এবং রূপেশ্বর বিতাড়িত হইয়া পিতৃবন্ধু গৌড়ের মুসলমান রাজদরবারে আশ্রয় পান এবং মন্ত্রীপদ পাইয়া ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মন্ত্রিত্ব করেন।[২]

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের প্রদত্ত এই বিবরণের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। অনিরুদ্ধের সহিত মুসলমান রাজার মিত্রতা সম্পর্কে কোনরূপ তথ্যপ্রমাণও নাই। তারিখগুলিও তিনি কোথা হইতে পাইয়াছিলেন তাহাও জানা যায় না। সুতরাং এই বিবরণের উপর কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করা যায় না। সনাতন রূপ ১৫১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে হোসেন শাহের রাজদরবারে মন্ত্রী ছিলেন তাহা জানা যাইতেছে। সতরাং তাঁহারা পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে কোন এক সময়ে

১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ২১১; *A history of Bengali Language and Literature* 2nd. ed., p. 432

২ *The Vaishnava literature of Mediaeval Bengal*, p. 27

আবির্ভূত হইয়াছিলেন ধরা যায়। এক এক পুরুষ পঁচিশ বৎসর হিসাবে ধরিলে তাঁহাদের আদিপুরুষ জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব কাল (উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ) চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগ হয়। এই অনুমান যে সম্ভবপর তাহা নিম্ন প্রমাণবলে সমর্থন করা যায়। জীবপ্রদত্ত বংশপরিচায়িকায় দনুজমর্দনদেব কর্তৃক সনাতন রূপের প্রপিতামহ পদ্মনাভকে সংবর্ধনার কথা জানা যায়। দনুজমর্দনদেব কে ছিলেন তাহা বলা কঠিন হইলেও তিনি যে একজন স্বাধীন নরপতি হিসাবে ১৪১৭-১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পাণ্ডুয়ায় রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আছে।[১] চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জগদ্‌গুরুর আবির্ভাবকাল ধরিলে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পদ্মনাভের অবস্থান সম্ভব হয় এবং দনুজমর্দনদেব কর্তৃক তাঁহার সংবর্ধনাও এই হিসাবে স্বাভাবিক ও সঙ্গত হয়। সুতরাং চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া যে মত নগেন্দ্রনাথ বসু ও ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন দিয়াছেন তাহা গ্রহণ করা যায় না এবং ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে রূপেশ্বরের মৃত্যু হয় ইহাও যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন গৌড়রাজের দরবারে রূপেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণের যে কথা বলিয়াছেন তাহাও জীবপ্রদত্ত বিবরণ দ্বারা সমর্থিত হয় না। জীব বলিয়াছেন যে, রূপেশ্বর শিখরভূমির রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। শিখরভূমিতে হিন্দু রাজারা দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রূপেশ্বর হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে হিন্দু রাজার আশ্রয় গ্রহণ করাই অধিকতর সম্ভব। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ শিখরভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় বসবাস করিতে থাকেন। কিছুকাল পরে তাঁহার গঙ্গাতীরে বাস করিবার ইচ্ছা হয় এবং তিনি শিখরভূমি পরিত্যাগ করিয়া নবহট্টকে আসিয়া বসবাস করেন। রাজা দনুজমর্দনদেব তাঁহাকে সংবর্ধিত করেন। এই নবহট্টক যে কোথায় ছিল তাহা বলা কঠিন। একমতে এই নবহট্টক বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত কাটোয়ার দেড় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত বর্তমান নৈহাটি।[২] অন্যমতে ইহা চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত কুমারহট্ট-হালিসহরের নিকটবর্তী নৈহাটি।[৩] দ্বিতীয় মতটির সমর্থকেরা ডঃ সুকুমার সেনের আবিষ্কৃত সনাতন, রূপ ও জীবের পরিচয় পাতড়ার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, উহাতে পদ্মনাভ শিখরদেশ ছাড়িয়া কুমারহট্টে বাস করেন এইরূপ লিখিত

১ N. K. Vattasali—*Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal*, pp. 109-115 ; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গের ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৭৮-১৮২

২ সতীশচন্দ্র মিত্র—সপ্ত গোস্বামী, পৃঃ ৬২

৩ সুখময় মুখোপাধ্যায়—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, পৃঃ ১৫৭

২

আছে।[১] কুমারহট্টের উল্লেখ হইতে তৎসন্নিহিত নৈহাটিই নবহট্টককে উদ্দিষ্ট করিতেছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর কাটোয়ার সন্নিহিত নৈহাটিকেই নবহট্টক যাঁহারা বলেন তাঁহারা সেখানে প্রচলিত জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াছেন। ইহাও খুব প্রামাণ্য বলিয়া মনে করা যায় না।

যাহাই হউক, এই পদ্মনাভের পুত্র ছিলেন মুকুন্দ। মুকুন্দের পুত্র কুমার। এই কুমারের অনেকগুলি সন্তান ছিল। তন্মধ্যে সনাতন, রূপ ও বল্লভ বৈষ্ণবসাহিত্যের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।[২] মুকুন্দের পুত্র কুমার নবহট্টকেই বাস করিতেন কিন্তু এক সময়ে কোন দ্রোহবশতঃ তিনি উহা ত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে (পূর্ববঙ্গে) গমন করেন এবং তথায় বসবাস করিতে থাকেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর নরহরি চক্রবর্তীর প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, যবন সংস্পর্শ এড়াইবার জন্য ও জ্ঞাতিবর্গের শত্রুতার জন্য কুমার নবহট্টক ছাড়িয়া বঙ্গদেশের দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত বাকলা চন্দ্রদ্বীপে গিয়া বাস করেন।

শ্রীমুকুন্দ দেবের নন্দন শ্রীকুমার।
বিপ্রকুলপ্রদীপ, পরম শুদ্ধাচার ॥
সদা যজ্ঞাদিক ক্রিয়া নিভৃতে করয়।
কদাচার জনস্পর্শে অতি ভীত হয় ॥
যদি অকস্মাৎ কভু দেখয়ে যবন।
করে প্রায়শ্চিত্ত, অন্ন না করে গ্রহণ ॥
জ্ঞাতিবর্গ হইতে উদ্বেগ হৈল মনে।
ছাড়িলেন নবহট্টক গ্রাম সেই ক্ষণে ॥
নিজগণসহ বঙ্গদেশে শীঘ্র গেলা।
বাকলা চন্দ্রদ্বীপ গ্রামেতে বাস কৈলা।
—ভ. র. ১৫৬১-৫৬৫

ভক্তিরত্নাকর হইতে আরও জানা যায় যে, কুমার ফতেহাবাদেও একটি বাসগৃহ নির্মাণ করেন।

যশোরে ফতেহাবাদ নামে গ্রাম হয়।
গতায়াত হেতু তথা করিল আলয় ॥ —১৫৬৬

১ ডঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, ৩য় সং, পৃঃ ৩০২-৩০৩

২ রজনীকান্ত চক্রবর্তী (গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৫) ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, পৃঃ ১৫৭) বলেন যে, রূপ সনাতনের পিতার নাম মুকুন্দ। ইহা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

মোটামুটিভাবে ফতেহাবাদে ও বাকলা চন্দ্রদ্বীপে উভয় স্থানেই কুমার বসবাস করিতেন দেখা যাইতেছে।

ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য বলিয়াছেন যে, কুমার গৌড়সন্নিহিত মাধাইপুরের হরিনারায়ণ বিশারদের কন্যা রেবতীকে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ে বাস করেন।[১] এই উক্তির কোনই ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

কুমারের যে অনেকগুলি পুত্র ছিল, তাহা জীবপ্রদত্ত বংশপরিচায়িকা হইতে জানা যায়। কিন্তু সঠিক কতজন পুত্র ছিল তাহা জানা যায় না। ডঃ সুকুমার সেন যে রূপ-সনাতন-জীবের পরিচয় পাতড়া উদ্ধার করিয়াছেন তাহাতে কুমারদেবের পাঁচ পুত্র ছিল উল্লেখ আছে। ইহাতে সনাতনের জ্যেষ্ঠভ্রাতাদ্বয় দেশাধিকারী ছিলেন এমন কথাও বলা হইয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃত হইতেও সনাতনের একজন জ্যেষ্ঠভ্রাতা যে পরাক্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

তবে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা কহে আরবার।
তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার॥
জীববহু মারি সব চাকলা কৈল খাস।
এথা তুমি মোর সর্ব কার্য কৈলে নাশ॥—২।১৯।২৩-২৪

কেহ কেহ বলেন যে, সনাতনের জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম রঘুনন্দন ছিল। কিন্তু ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। কেহ কেহ কুমারের কন্যাসন্তান ছিল বলিয়াছেন। এই সম্পর্কেও নিঃসংশয়ে কিছু বলা সম্ভব নহে। হাজীপুরে শ্রীকান্তের সহিত সনাতনের সাক্ষাৎকালে চৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন, 'গোসাঞির ভগ্নীপতি করে রাজকার্য' (২।২০।৩৭)। এই ভগ্নীপতি বলা হইতে ধারণা হয় যে, সনাতনের হয়তো কোন আপন ভগ্নী ছিল। কিংবা এমনও হইতে পারে যে অন্য কোন আত্মীয়তাসূত্রে শ্রীকান্ত সনাতনের ভগ্নীপতি হইয়া থাকিবেন।

আবির্ভাব

যতদিন পর্যন্ত না নূতন কোন দলিল আবিষ্কৃত হয়, ততদিন সনাতন রূপ ইত্যাদির সঠিক আবির্ভাবকাল নির্ধারণ করা সম্ভব মনে হয় না। কেবল একটি সম্ভাব্য আনুমানিক কাল নির্ণয় করা চলিতে পারে। এই আনুমানিক কাল নির্ণয়ের পূর্বে ইঁহাদের আবির্ভাব কাল সম্পর্কে যে প্রচলিত মতগুলি রহিয়াছে তাহার উল্লেখ প্রয়োজনীয়। নির্বিচারে কিংবদন্তী মানিয়া লইবার ফলে একই ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন দেখা যায়।

[১] কবি বিদ্যাপতি, পৃঃ ৮৩, পাদটীকা

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে (পৃঃ ২১১) লেখেন যে সনাতন ১৪৮৮ ও রূপ ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু ইহার পনর বৎসর পরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত A History of Bengali Language and Literature গ্রন্থে (p. 504) লেখেন সনাতন ১৪৮৪ ও রূপ ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এই মতেও শেষ অবধি তিনি দৃঢ় থাকিতে পারেন নাই। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত The Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal গ্রন্থে (p. 29) তিনি সনাতন ১৪৯২ এবং রূপ ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই শেষোক্ত মতে তাঁহার ভ্রান্তিই প্রকাশ পাইয়াছে। রূপ সনাতন অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ। সনাতন নিজে বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী টীকায় যাহার অংশ ভুলক্রমে লঘুবৈষ্ণবতোষণীতে (পুরীদাস সং) ঢুকিয়া পড়িয়াছে, রূপ সর্ম্পকে বলিয়াছেন—ইতি বিবৃতং চৈতন্মদনুজবরৈঃ শ্রীরূপমহাভাগবতেরুজ্জ্বল-নীলমণৈঃ স্থায়িভাববিবরণে (৩২।৮)। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের অনুসরণে সম্ভবতঃ জগদ্বন্ধু ভদ্র ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গৌরপদতরঙ্গিণীতে (পৃঃ ৪৮ ও ৪১) ও হরিলাল চট্টোপাধ্যায় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বৈষ্ণব ইতিহাসে (পৃঃ ৬৩) লেখেন যে সনাতন ১৪৮৮ ও রূপ ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নগেন্দ্রনাথ বসু ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বিশ্বকোষে (১৬শ খণ্ড, পৃঃ ৬৯১) রূপ ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বিশ্বকোষে (২১শ খণ্ড, পৃঃ ১৩৪) সনাতন ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এইরূপ লিখিয়াছেন। গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী শ্রীচৈতন্যদেব ও পার্ষদগণ গ্রন্থে (পৃঃ ১৬৩ ও ১৩৩) লিখিয়াছেন সনাতন ১৪৮৮ এবং রূপ ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসের পঞ্চম বৎসরে অর্থাৎ ১৫১৪-১৫১৫ খৃষ্টাব্দে রামকেলি গ্রামে যখন আসেন তখন সনাতন ও রূপ হোসেন শাহের মন্ত্রী। শ্রীচৈতন্যের বয়স তৎকালে ২৮।২৯ বৎসর। রূপসনাতন তাঁহার অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের ছোট হইলে তাঁহাদের বয়স ২৫।২৬ বৎসর হয়। উইলিয়াম পিট একুশ বৎসরে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন বটে কিন্তু সুলতানী আমলে এত অল্প বয়সে কোন ব্যক্তি মন্ত্রিত্ব পাইয়াছিলেন একথা বিশ্বাস করা কঠিন। সনাতন, রূপ প্রভৃতির জীবনী লইয়া যাঁহারা সেকালে আলোচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সতীশচন্দ্র মিত্র সত্যিকারের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা করিবার প্রয়াস পান। তিনি অনুমান করেন যে সনাতন ১৪৬৫ ও রূপ ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হন।[১] এরূপ হইলে শ্রীচৈতন্যের রামকেলিতে আগমনের সময়ে তাঁহাদের বয়স যথাক্রমে ৪৯।৫০ ও

১ সপ্ত গোস্বামী, পৃঃ ৬৪ ; যশোহর খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৩৭১

৪৪।৪৫ বৎসর হয়। এই বয়সে তাঁহাদের মন্ত্রিত্ব করা স্বাভাবিক। এই অনুমানের পশ্চাতে তাঁহার কোনও যুক্তি না থাকিলেও ইহা যে সম্ভবপর হইতে পারে তাহা দেখান যাইতেছে।

রূপ গোস্বামী তৎপ্রণীত গোবিন্দবিরুদাবলীতে একস্থানে লিখিয়াছেন,—

পালিতঙ্করণীদশা প্রভো মুহরন্ধঙ্করণী চ মাং গতা।
শুভঙ্করণী কৃপা শুভৈর্ন তবাঢ্যঙ্করণী চ মষ্যভূত॥ —স্তবমালা

হে প্রভো, এক্ষণে আমি বৃদ্ধপ্রায় এবং অন্ধপ্রায় হইয়াছি, তথাপি শরণাগত এ জনের প্রতি তোমার কৃপাদৃষ্টি হইল না।

এই উক্তি হইতে মনে করা যায় যে গোবিন্দবিরুদাবলী রচনাকালে রূপ বার্ধক্যে পেঁছাইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স এই সময়ে সত্তর বা ততোধিক হইবার সম্ভাবনাই বেশী। গোবিন্দবিরুদাবলী পদ্যাবলীতে এবং পদ্যাবলী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ধৃত হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর রচনাকাল ১৫৪১ খৃষ্টাব্দ হওয়ায় গোবিন্দবিরুদাবলী ১৫৪১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হইয়াছিল জানা যাইতেছে। গোবিন্দবিরুদাবলীর রচনাকাল ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ বা তাহার কিছু পূর্বে ধরিলে এবং ঐ সময়ে রূপের বার্ধক্যের কথা থাকায় তাঁহার বয়ঃক্রম সত্তর বা উহার কাছাকাছি ধরিলে রূপের আবির্ভাব ১৪৭০ খৃষ্টাব্দ বা তাহার কাছাকাছি সময়ে হইয়াছিল মনে করিতে হয়। রূপ অপেক্ষা সনাতন দুই-চারি বৎসরের বড় ছিলেন ধরিলে সনাতন ১৪৬৬।৬৮ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কাছাকাছি সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলা যাইতে পারে।

বাল্যকাল ও শিক্ষা

সনাতন ও রূপের বাল্যকাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট করিয়া কিছু বলা সম্ভব নহে। প্রকৃতপক্ষে রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত তাঁহাদের জীবনের বিশেষ বিবরণ কোনও প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন যে সনাতন ও রূপের বাল্যনাম অমর ও সন্তোষ ছিল।[১] কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থসমূহের কোথাও ইহা পরিদৃষ্ট হয় না। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকায় (১৩৩০, আশ্বিন-কার্তিক, পৃঃ ১৫১) 'শ্রীরূপ সনাতনের পূর্বাশ্রমের কথা' নামক প্রবন্ধের নামহীন প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন যে ভক্তমালে আছে,—

অমর সন্তোষ নাম পূর্বেতে আছিল।
সনাতন রূপ নাম পশ্চাতে হইল॥

১ *The Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal*, p. 28 ; বৃহৎবঙ্গ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭১৭ ; বিশ্বকোষ, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ১৩৮

কিন্তু কয়েকটি ভক্তমালের বিভিন্ন মুদ্রিত সংস্করণ ও পুঁথি খুঁজিয়া কোথাও এই পংক্তিদ্বয় দেখিতে পাওয়া গেল না। সনাতন ও রূপ বাল্যকাল হইতেই শিক্ষায় অধিকতর মনোযোগী ছিলেন মনে করা যায়। বিপুল ভক্তিশাস্ত্রাদি রচনা তাঁহাদের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করিতেছে। এই পাণ্ডিত্য বাল্যকাল হইতেই সুষ্ঠু শিক্ষানুশীলনেরই ফল ধারণা করা যাইতে পারে। সনাতন ন্যায়শাস্ত্রে যে সুপণ্ডিত ছিলেন তাহার পরিচয় বৃহদ্ভাগবতামৃতের টীকা হইতে পাওয়া যায়। সেখানে তিনি ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, 'মদ্যাদিনা মত্ত ইব উন্মত্তবদিতি বা ; সংসৃতিভ্যঃ ন্যায়শাস্ত্রোক্ত জন্মমরণাদ্যেকবিংশতিপ্রকারসংসারদুঃখেভ্যঃ লোকানুদ্ধরন্ ; তথা চ তত্রৈব—শ্রুত্বেত্যদ্ভুত বৈরাগ্যাজ্জনস্তস্যোজ্জ্বলা গিরঃ' (১৷৪৷৬)। ভক্তিরত্নাকরের কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, সনাতন রূপ উভয়েই ন্যায়ে পণ্ডিত ছিলেন।

> ন্যায়সূত্র ব্যাখ্যা নিজ কৃত যে করয়।
> সনাতন রূপ শুনিলে সে দৃঢ় হয় ॥ —১৷৫৯০

লঘুতোষণীর অন্ত্যে জীবপ্রদত্ত বংশপরিচায়িকা হইতে জানা যায় যে, সনাতন বাল্যকাল হইতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। হোসেন শাহের রাজদরবারে তাঁহারা মন্ত্রিত্বের কার্য করিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহারা যে ফার্সী আরবীতে সুপণ্ডিত ছিলেন ইহা মনে করিতে পারা যায়। সুলতানদের রাজকার্য পরিচালনে এই দুইটি ভাষার জ্ঞান একেবারেই আবশ্যকীয় ছিল।

সতীশচন্দ্র মিত্র বলিয়াছেন যে, সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা সৈয়দ ফকরুদ্দিনের নিকট দুই ভ্রাতা আরব্য ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন।[১] কোনও বৈষ্ণবগ্রন্থে বা অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায় না।

সনাতন তাঁহার বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণীর প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন,—

> ভট্টাচার্যং সার্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্।
> বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশবিভূষণম্ ॥
> বন্দে শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্যং রসপ্রিয়ং।
> রামভদ্রং তথা বাণীবিলাসঞ্চোপদেশকম্ ॥

নগেন্দ্রনাথ বসু মন্তব্য করিয়াছেন, 'সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম ও তাঁহার সহোদর বিদ্যাবাচস্পতি সনাতনের শিক্ষাগুরু ছিলেন—শ্রীপাদ সনাতন নিজকৃত শ্রীভাগবততোষণী ব্যাখ্যায় স্পষ্টরূপেই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—'ভট্টাচার্যং সার্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্' (বিশ্বকোষ, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ১৩৬)'। 'গুরু'

[১] সপ্ত গোস্বামী, পৃঃ ৬৭

শব্দ বিদ্যাবাচস্পতি ও বাসুদেব সার্বভৌমের বিশেষণ হইয়া থাকিলে ইহার দ্বিবচন প্রয়োগ হওয়াই উচিত ছিল কিন্তু বহুবচন প্রযুক্ত হওয়াতে ইহা দুইজনকে বুঝাইতেছে মনে করা যায় না।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বলিয়াছেন উদ্ধৃত শ্লোকের অন্তর্ভুক্ত ছয়জনই সনাতনের শিক্ষাগুরু ছিলেন। উদ্ধৃত শ্লোকের 'গুরূন্' শব্দ উঁহাদের সকলেরই বিশেষণ মনে করিয়াছেন।[1] একত্রে ছয়জনকে বন্দনা করা হইয়া থাকিলে দুইবার 'বন্দে' ক্রিয়ার প্রয়োগের প্রয়োজন থাকে না। 'বন্দে' ক্রিয়ার দ্বিত্ব প্রয়োগ হইতে পৃথক্ পৃথক্ বন্দনা জানানো হইয়াছে মনে হয়। 'গুরূন্' শব্দ বিদ্যা-বাচস্পতিরই বিশেষণ বলিয়া ধারণা হয়। গৌরবার্থে অনেক সময় বহুবচন প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ডঃ সুশীলকুমার দেও বলিয়াছেন, 'the word gurun in the passage expressly qualifies vidyabachaspatin only, and the plural is honorific.'[2] নরহরি চক্রবর্তীও ভক্তিরত্নাকরে বলিয়াছেন সনাতনের গুরু একমাত্র বিদ্যাবাচস্পতিই ছিলেন।

শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি।
মধ্যে মধ্যে রামকেলি গ্রামে তাঁর স্থিতি॥
সর্বশাস্ত্রাধ্যয়ন করিলা যাঁর ঠাঞি।
যৈছে গুরুভক্তি কহি ঐছে সাধ্য নাই॥ —১।৫৭৮-৫৭৯

মনোহর দাসের অনুরাগবল্লীতেও উক্ত হইয়াছে,—

শ্রীসনাতন কৈল দশম টিপ্পনী।
তার মঙ্গলাচরণে এই মত বাণী।
বিদ্যাবাচস্পতি নিজ গুরু করিলেন যে।
তাঁহার শ্রীমুখ বাক্য দেখ পরতেকে॥ —১ম মঞ্জরী

এই সমস্ত বিবরণ হইতে মনে হয়, বিদ্যাবাচস্পতিই একমাত্র শিক্ষাগুরু ছিলেন।

জয়ানন্দ ও নরহরি চক্রবর্তীর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, এই বিদ্যাবাচস্পতি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভ্রাতা ছিলেন।

বিশারদসুত সার্বভৌম ভট্টাচার্য।
স্ববংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড় রাজ্য॥

[1] চৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃঃ ১৩৫-১৩৬
[2] *Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal, 2nd. ed.*, p. 148 *fn.*

তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়ে বসি।
বিশারদ নিবাস করিলা বারাণসী ॥ —চৈতন্যমঙ্গল
শ্রীবিশারদের পুত্র বিদ্যাবাচস্পতি।
যাঁর জ্যেষ্ঠ সার্বভৌম নীলাচলে স্থিতি ॥ —ভ. র. ১২।৩৮৬৫

নগেন্দ্রনাথ বসু একটি কুলপঞ্জিকা হইতে এই বিদ্যাবাচস্পতির নাম রত্নাকর ভট্টাচার্য ছিল দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।[১] অধুনা দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সুষ্ঠুভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাসুদেব সার্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির প্রকৃত নাম বিষ্ণুদাস ভট্টাচার্য ছিল।[২]

গৌড়-রাজদরবারে মন্ত্রিত্ব

হোসেন শাহের রাজদরবারে সনাতন ও রূপ কি ভাবে পরিচিত হইলেন তাহা নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। 'সপ্ত গোস্বামী' গ্রন্থে সতীশচন্দ্র মিত্র বলিয়াছেন, 'শৈশবে সনাতন ও তাঁহার ভ্রাতারা বাকলার বাটি হইতে রামকেলিতে আসিয়া পিতামহের তত্ত্বাবধানে পালিত হন। মুকুন্দের উচ্চপদের জন্য রাজদরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার পৌত্রেরা স্বীয় অসামান্য প্রতিভা ও বিদ্যাবুদ্ধির জন্য অল্প বয়সেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিছুদিন মধ্যে গৌড়ে ভাগীরথীতীরে মুকুন্দের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে (১৪৮৩ খৃষ্টাব্দ)। তখন সনাতনের বয়স আঠার বৎসর মাত্র। তিনি সেই সময়ে পিতামহের পদ প্রাপ্ত হন, ক্রমে রূপ এবং বল্লভ রাজসরকারে প্রবেশ করেন' (পৃঃ ৬৫-৬৬)। ইহা সমর্থন করা চলে না। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে হোসেন শাহ গৌড়ের সুলতান হন। সুতরাং ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে সনাতন কি করিয়া তাঁহার মন্ত্রী হইতে পারেন। পূর্ববর্তী সুলতানদের প্রতি হোসেন শাহের এমন অনুরাগ ছিল না যে যাহাতে তিনি তাঁহাদের মন্ত্রীকে নিজের মন্ত্রী করিয়া লইলেন বলিতে পারা যায়। মুকুন্দ যে গৌড় রাজদরবারে প্রবেশ করেন কিংবা ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল এমন কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই। সুতরাং এই মত গ্রহণ করা চলে না। ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রণেতা মালাধর বসু হোসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। তিনিই রূপসনাতনকে গৌড়-রাজদরবারে আনেন।[৩] ইহা মানিতে পারা যায় না। মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থে যে গৌড়রাজের উল্লেখ করিয়াছেন তিনি হোসেন শাহ নহেন। যদি

১ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৯০
২ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৫৬শ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ৬৬-৮১
৩ কবি বিদ্যাপতি, পৃঃ ৮৩, পাদটীকা

একখানি পুঁথিতে উল্লিখিত উহার রচনাকালকে অকৃত্রিম মনে করা যায় (তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন। চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥), তাহা হইলে গ্রন্থরচনা রুকনুদ্দিন বারবাক শাহের রাজত্বকালে আরম্ভ ও শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের রাজত্বকাল মধ্যে সমাপ্ত হইয়াছিল বলিতে হয়। গ্রন্থরচনার আদি হইতেই গুণরাজ খাঁন উপাধি থাকায় ইহা রুকনুদ্দিন বারবাক শাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল মনে হয়।[১] সুতরাং তিনি যে হোসেন শাহের দরবারে বর্তমান ছিলেন না ইহা মনে করা যাইতে পারে। হোসেন শাহ গৌড়ের শাসনকর্তা হইয়া বহু হিন্দুকে রাজদরবারে গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রদান করেন।[২] ঐ সময়ে সনাতন ও রূপ হয়তো রাজদরবারে প্রবেশ করিয়া থাকিবেন।

গৌড়ের রাজদরবারে সনাতন ও রূপের নিযুক্তি সম্পর্কে রজনীকান্ত চক্রবর্তী একটি কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। "গৌড় নগরের পীরশা মন্দির প্রায় নির্মিত হইলে রাজা মন্দিরের উপর আরোহণ করিলেন, রাজমন্ত্রীর কোন দোষ পাইয়া তাহাকে মন্দিরের উপর হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করিলেন। রাজমন্ত্রী প্রাণত্যাগ করিল। স্বেচ্ছাচারী গৌড়েশ্বর ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে মন্দির হইতে অবতরণ করিলেন। হিঙ্গা নামে এক পদাতিককে নিকটে দেখিতে পাইয়া তাহাকে আদেশ করিলেন যে হিঙ্গা, তুই মোরগাঁ যা। হিঙ্গা কুপিত গৌড়পতিকে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না। মোরগাঁয় উপস্থিত হইয়া হিঙ্গা বিষণ্ণ মনে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। শুনা যায় সনাতন গোস্বামী আদ্যোপান্ত সমস্ত অবগত হইয়া হিঙ্গার সঙ্গে কতিপয় সুদক্ষ রাজমিস্ত্রিকে গৌড়ে পাঠাইয়া দেন। তৎকালে মুকুটগ্রামে বা মোরগাঁয়ে অনেক স্থপতির বাস ছিল। হোসেন শাহ হিঙ্গা কর্তৃক আনীত মিস্ত্রী দেখিয়া অবাক হইয়া অনুসন্ধানে সনাতনের পরিচয় পাইলেন এবং তখনই রাজকার্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন (সাহিত্য, ১৩০৮ ফাল্গুন, পৃঃ ৬৭২)।

এই গল্পটি কেহ কেহ ফিরোজ শাহের উপর আরোপ করিয়া বিখ্যাত ফিরোজ মিনার নির্মাণকালে এইরূপ ঘটে বলিয়াছেন।[৩] এই সমস্ত কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না। ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, সনাতন রূপের খ্যাতির কথা শুনিয়া হোসেন শাহ তাঁহাদিগকে রাজকার্যে নিযুক্ত করেন।

১ ডঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, ৩য় সং, পৃঃ ১২৩-১২৪ ; খগেন্দ্রনাথ মিত্র সং, শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভূমিকা, পৃঃ ৮০-৮৵০

২ Jadunath Sarkar—*History of Bengal, Vol. II*

৩ Abid Ali—*Memoirs of Gour and Pandua*, p. 54

সনাতন রূপ মহামন্ত্রী সর্বাংশেতে।
শুনিলেন রাজা শিষ্টলোকের মুখেতে ॥
গৌড়ের রাজা যবন অনেক অধিকার।
সনাতন রূপে আনি দিল রাজ্যভার ॥ —১৫৮০-৫৮১

ইহা সম্ভব বলিয়াই ধারণা হয়। নরহরি চক্রবর্তী একটি কিংবদন্তী শুনিয়াছিলেন যে, শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের পূর্বেই রামকেলিতে সনাতন ও রূপ খ্যাতিপ্রতিপত্তির সহিত হোসেন শাহের মন্ত্রিত্ব কার্য করিতেন (ভ. র. ১৩৬৪-৩৮৩)। ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর কাছাকাছি শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।[১] সুতরাং ১৫১০ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই সনাতন ও রূপ গৌড়ের রাজদরবারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন বোঝা যায়।

গৌড়ে রাজকার্যে নিযুক্ত হইলেও এবং ঐশ্বর্য বিলাসব্যসনের মধ্যে সময় কাটিলেও অন্তরে বৈরাগ্যভাব মধ্যে মধ্যে জাগরূক হইত। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে তন্ময় হইবার আকাঙ্ক্ষা মধ্যে মধ্যে দুই ভ্রাতাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত। শ্রীচৈতন্যের অপরূপ কৃষ্ণপ্রেমের কথা দুই ভ্রাতা শুনিয়াছেন। যবনরাজকার্যে লিপ্ত থাকার জন্য দুই ভ্রাতা নিজেদের অশুচি, অপবিত্র মনে করিয়াছেন। যবন সংসর্গে পতিত দুই ভ্রাতাকে একমাত্র শ্রীচৈতন্যই তারণ করিতে পারেন। তাই দুই ভ্রাতা শ্রীচৈতন্যকে দৈন্যপত্রী বারংবার লিখিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য পত্রোত্তরে তাঁহাদের যথাসময়ে মুক্তিলাভ ঘটিবার আশ্বাস দিয়া পাঠাইলেন। শ্রীচৈতন্যের আশ্বাসবাণীকে হৃদয়ে রাখিয়া দুই ভ্রাতা উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভক্তবর্গে বেষ্টিত হইয়া শ্রীচৈতন্য রামকেলিতে উপনীত হইলেন। দুই ভ্রাতার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিল। গভীর রাত্রে ছদ্মবেশে দুই ভ্রাতা দন্তে তৃণধারণপূর্বক শ্রীচৈতন্যের চরণে পতিত হইয়া আর্তিপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয় ॥
নীচজাতি, নীচসঙ্গী করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ ॥—চৈ. চ. ২।১।১৭৮-১৭৯

* * *

ম্লেচ্ছ জাতি, ম্লেচ্ছ সেবি, করি ম্লেচ্ছ কর্ম।
গোব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥

১ চৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃঃ ৮

মোর কর্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কুবিষয় বিষ্ঠাগর্তে দিয়াছে ফেলিয়া ॥
আমা উদ্ধারিতে বাকী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি সবে তোমা বিনে ॥
আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজবল।
পতিতপাবন নাম তবে সে সফল॥ —চৈ. চ. ২।১।১৮৬-১৮৯

শ্রীচৈতন্য দুই ভ্রাতাকে চরণতল হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন শীঘ্রই তোমাদের মুক্তি হইবে, 'অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিব উদ্ধার'। আজ হইতে তোমাদের দুই ভাইয়ের নাম রূপ সনাতন হইল, 'আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপ সনাতন'। তোমরা নিশ্চিন্তমনে গৃহে প্রত্যাবর্তন কর, 'ঘর যাহ, ভয় কিছু না করিহ মনে'। শ্রীচৈতন্যবাণীতে আশ্বস্ত হইয়া দুই ভ্রাতা গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আর এদিকে শ্রীচৈতন্যও সেই রাত্রে রামকেলিতে থাকিয়া পরদিন কানাই নাটশালায় চলিয়া আসিলেন এবং সনাতনের উপদেশবাণী বহ লোকসংঘট্টে বৃন্দাবন যাওয়া উচিত নহে স্বীকার করিয়া দক্ষিণ দেশাভিমুখে পুনর্যাত্রা করিলেন।

রূপসনাতনের জাতি

কেহ কেহ বলেন যে রূপ ও সনাতন মুসলমানবংশজাত ছিলেন।[১] আবার কাহারও কাহারও মতে হোসেন শাহের রাজদরবারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইবার কালে ইঁহারা মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২] আবার কেহ মুসলমান-বংশজাত বা জাত্যন্তর গ্রহণের কথা না বলিলেও মন্তব্য করিয়াছেন, 'রূপ সনাতন ব্রাহ্মণ ছিলেন, এই একটি প্রচলিত মত আমি শুনিয়াছি। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতের অংশগুলি পাঠ করিলে ধারণা হইবে যে, তাঁহারা নীচবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন' (১৩৩৯ দৈনিক বসুমতী, ৭ই মাঘ, পৃঃ গ)। প্রবন্ধকার যদি জীব গোস্বামীর লঘুতোষণীর অন্ত্যে প্রদত্ত বংশ পরিচয় এবং বৃহদ্ভাগবতামৃতের তৃতীয়

১ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও চৈতন্যদেব, পৃঃ ৩১৩; বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, পৃঃ ৫৬; *Religion and Society*, p. 116; *Influence of Islam on Indian Culture*, p. 219

২ *Chaitanya and his Age*, pp. 219-220; *The Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal*, p. 28; *Chaitanya and his Companions*, p. 116; The *Chaitanya Movement*, p. 45; *Indian Philosophy*, Vol. II, p. 761; *A History of Indian Philosophy*, Vol. IV, p. 394

শ্লোকের সনাতনকৃত টীকা পাঠ করিতেন তাহা হইল 'রূপ সনাতন ব্রাহ্মণ ছিলেন, এই একটি প্রচলিত মত আমি শুনিয়াছি' এই ধরনের লঘু উক্ত করিতেন না। সনাতন গোস্বামী বৃহদ্ভাগবতামৃতের তৃতীয় শ্লোকের স্বকৃত টীকায় তাঁহারা যে উচ্চবিপ্রবংশজাত সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন এবং আত্মগৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—'পক্ষে চ ভক্তঃ স্বপ্রিয়ভৃত্যো যো রূপঃ কর্ণাটদেশ-বিখ্যাত বিপ্রকুলাচার্য-শ্রীজগদ্‌গুরুবংশজাত শ্রীকুমারাত্মজো গৌড়দেশী যঃ শ্রীরূপনামা বৈষ্ণববরস্তেন সহেতার্থঃ'।

যাঁহারা রূপসনাতন মুসলমান বংশজাত ছিলেন বলেন তাঁহারাও যে অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন তাহা উক্ত বিবৃতি হইতে বোঝা যাইবে। রূপসনাতন যে মুসলমান বংশজাত ছিলেন না ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে তাঁহাদের এইরূপ ধারণার কারণ কি ছিল তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ কর্তৃক রূপসনাতনের মুখ দিয়া বলানো দৈন্যবাক্যই এই ধারণা সৃষ্টিতে প্রেরণা যোগাইয়াছে। রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎকালে দুই ভ্রাতা বলিয়াছেন,—

নীচ জাতি, নীচ সঙ্গী করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥

* * *

ম্লেচ্ছ জাতি, ম্লেচ্ছ সেবি, করি ম্লেচ্ছ কর্ম।
গোব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥

এই দুই ভ্রাতা যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের ভাষা নহে। ইহা কৃষ্ণদাস কবিরাজেরই ভাষা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজে অত্যন্ত বিনীত ছিলেন। নিজেকে তৃণের অপেক্ষাও সুনীচ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। সেই বিনয় ও দীনতা তিনি দুই ভাইতেও আরোপিত করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ সকলের সম্মুখে একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যেই রূপ সনাতনের মুখ দিয়া অতি বৈষ্ণবীয় দীনতা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই দৈন্যপ্রকাশের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া রূপসনাতনকে নীচবংশজাত বলিয়া বিদ্বজ্জনেরা ভ্রান্তি করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যদি সত্যই তাঁহাদের নীচবংশ জানিতেন এবং তাঁহারা সত্যই যদি নীচ বংশজাত হইত তাহা হইলে কি করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্রাহ্মণ কর্তৃক তাঁহাদের পুরশ্চরণের কথা লিখেন।

দুই ভাই বিষয়ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল॥
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।
অচিরাতে পাইবারে চৈতন্যচরণ॥ —চৈ. চ. ২।১৯।৩-৪

ভট্টাচার্য পণ্ডিত লইয়া বা কি করিয়া ভাগবত পাঠ সম্ভবপর হয়,—

ভট্টাচার্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা।
ভাগবত বিচার করে সভাতে বসিয়া ॥ —চৈ. চ. ২।১৯।১৬

এইরূপ হইলে কৃষ্ণদাসের বক্তব্যের মধ্যেই তো স্বতোবিরোধিতা আসিয়া পড়ে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের অতি দীনতাই এইরূপ অনর্থের কারণ বলা যায়।

রূপসনাতন ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত ছিলেন মানিয়া লইয়াও কেহ কেহ তাঁহার পিতা মুসলমান ধর্মান্তরিত হইয়াছিলেন এইরূপ বলেন।

জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবরঃ, শ্রীমান্ কুমারাভিধঃ।
কঞ্চিদ্দ্রোহমবাপ্য সৎকুলজনির্বঙ্গালয়ং সঙ্গতঃ ॥

—লঘুবৈষ্ণবতোষণী

এই শ্লোকে দ্রোহ শব্দ দেখিয়া বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ইহা জাতিভ্রংশকর ঘটনা বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং কুমারদেব পিরালি ধর্মগ্রহণ করেন এইরূপ বলিয়াছেন।[১]

দ্রোহ শব্দের মূলগত অর্থ 'অনিষ্ট চিন্তা'। দ্রুহ্+অল্ ভাবে—অনিষ্টচিন্তনম্ (শব্দকল্পদ্রুম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৬)। মনে হয়, জ্ঞাতিদের শত্রুতা বশতঃই তিনি আবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে গমন করেন। এই 'দ্রোহ' শব্দের দ্বারা জাতিচ্যুতির কোনরূপ অর্থ দ্যোতিত হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর নরহরি চক্রবর্তীও বলিয়াছেন,—

শ্রীমুকুন্দ দেবের নন্দন শ্রীকুমার।
বিপ্রকুলদীপ পরম শুদ্ধাচার ॥
সদা যজ্ঞাদিক ক্রিয়া নিভৃতে করয়।
কদাচার জনস্পর্শে অতি ভীত হয় ॥
যদি অকস্মাৎ কভু দেখয়ে যবন।
করে প্রায়শ্চিত্ত অন্ন না করে গ্রহণ ॥
জ্ঞাতিবর্গ হৈতে উদ্বেগ হৈল মনে।
ছাড়িলেন নবহট্টক গ্রাম সেই ক্ষণে। —ভ. র. ১।৫৬১-৫৬৪

সুতরাং কুমার ধর্মান্তরিত হইয়াছিলেন ইহা মনে করা যায় না। যদি কুমার কিংবা তাঁহার পুত্র রূপ, সনাতন প্রভৃতি প্রকৃতই জাত্যন্তরিত হইয়া থাকেন তাহা হইলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্রাহ্মণদের সহিত তাঁহাদের যে যোগসূত্রের কথা বলিয়াছেন তাহা কি করিয়া সম্ভব? ব্রাহ্মণধর্মের যে প্রবল অনুশাসন সে যুগে ছিল তাহাতে

[১] বঙ্গশ্রী, ১৩৪২, পৌষ, পৃঃ ৮৮০

জাত্যন্তরিত কিংবা জাতিভ্রষ্টের সঙ্গে কোন ব্রাহ্মণ সংস্রব রাখিতে চাহিতেন না কারণ তাহা হইলে তাঁহাকে পতিত ও ভ্রষ্ট হইতে হইত। এইরূপ সামাজিক অবস্থায় রূপ সনাতন প্রকৃতই বিধর্মী হইলে কখনও পুরশ্চরণ ও ভাগবত বিচারের জন্য ব্রাহ্মণ সংগ্রহে সমর্থ হইতেন না।

সনাতনের মুখে প্রদত্ত—

'এক বন্দী ছাড়ে যদি নিজ ধর্ম দেখিয়া।
সংসার হৈতে তারে মুক্ত করেন গোসাঞা' ॥—চৈ. চ. ২।২০।৫

এই উক্তির 'নিজ ধর্ম দেখিয়া' হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে সনাতন মুসলমান কারারক্ষকের সমধর্মাবলম্বী ছিলেন অর্থাৎ মুসলমান ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী ছত্রটি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে দেখা যাইবে সনাতন কারারক্ষককে জাতিগত ধর্মের দোহাই দেন নাই। তিনি তাহার বিবেক ও নৈতিক ধর্মের নিকট আবেদন জানাইয়া প্রত্যুপকার প্রার্থনা করিয়াছেন,—

পূর্বে আমি তোমার কৈরাছি উপকার।
তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার॥ —চৈ. চ. ২।২০।৬

রাধিকানাথ গোস্বামীর সম্পাদিত (১৩০৭ সাল) চৈতন্যচরিতামৃতে 'এক বন্দী ছাড়ে যদি নিজ ধর্ম দিয়া' পাঠ আছে কিন্তু মাখনলাল ভাগবতভূষণের (১৩১৫ সাল) সংস্করণে 'নিজ ধর্ম দিয়া' পাঠ আছে। ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ 'নিজ ধন দিয়া' পাঠ ধরিয়াছেন। 'নিজ ধন' পাঠ ধরিলে এ সম্পর্কে কোন বিতর্কই উঠে না। কেহ কেহ সনাতনের কারারক্ষককে দরবেশ হওয়ার কথা ('দরবেশ হঞা আমি মক্কায় যাইব'—চৈ. চ. ২।১০।১২) ও দরবেশ বেশধারণের কথা ('প্রভু তোমায় বোলায় আইস দরবেশ'—চৈ. চ. ২।২০।৪৯) তুলিয়া বলেন যে তিনি মুসলমান ছিলেন। সনাতন দরবেশ বেশধারণ করিয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণ নাই। দীর্ঘকালীন পথশ্রমজনিত তাঁহার চেহারা ফকিরের মতই হইয়া থাকিবে তাই দরবেশ বলিয়া চন্দ্রশেখর সম্বোধন করিয়াছিলেন। আর কারারক্ষককে অভয় দান করিবার জন্যই সম্ভবতঃ তিনি দরবেশ হইয়া মক্কায় চলিয়া যাইবার কথা বলিয়াছিলেন।

চৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে ঐ সময় হইতে দরবেশ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।[১] কিন্তু পূর্ব হইতে ঐ সম্প্রদায় পরিচিত না থাকিলে সনাতনকে দরবেশ বেশধারণ করিবার জন্য অনুযোগ করা হইত না।

এক ধরনের বাউল দরবেশী পুঁথিতে রূপসনাতন মক্কায়ও গিয়াছিলেন এমন কথা বলা হয়।

১ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৮০

শ্রীরূপ সনাতনের নিস্তার সাক্ষি।
মক্কামদিনার কথা যাহা হৈতে পাই ॥
রাত্রিশেষে একত্রে বসিয়া দুই ভাই।
দেহের খবর পুছেন রূপসনাতনের ঠাঁই ॥
—ক. বি. পুঁথি নং ৩১০২ (দিলকিতাব)

এই কাহিনীসৃষ্টির কারণস্বরূপ হরিদাস পালিত যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে সাকর্মা গ্রামে সাকর মল্লিক নামে এক ফকির ছিলেন। তিনি মক্কা সরিফে হজ করিতে গিয়া হাজী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারই ঘটনা সাকর মল্লিক উপাধিধারী সনাতনের সহিত মিশিয়া গিয়া এইরূপ কাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছে।[১] বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন, 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে দেখা যায় যে, রূপ ও সনাতন, হরিদাসের সহিত বাস করিতেন, একত্র বসিতেন, একত্র আহার করিতেন—শ্রীচৈতন্যদেবের অপর ভক্তগণের সহিত বসিতেন না, একত্র আহার করিতেন না, রূপ সনাতন যদি ব্রাহ্মণ সন্তান হইতেন তাহা হইলে হরিদাস তাঁহাদের সহিত একত্র আহার বিহার করিতে কিছুমাত্রই রাজি হইতেন না,—যেমন হরিদাস শ্রীচৈতন্যদেবের অপর উচ্চবংশসম্ভূত ভক্তদের সহিত একত্র আহার করিতে রাজি হন নাই। রূপ, সনাতন, হরিদাস তিনজনে একত্র আহার বিহার করিতেন, ইহা হইতে অনুমান হয়, তাঁহাদের জাতি এক ছিল।[২]

প্রথমতঃ রূপ সনাতন নিজেরা যাহাই হউন, তাঁহারা যে ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। বসন্তবাবুর রূপসনাতন ব্রাহ্মণ সন্তান নয় এমন ধারণার কারণ কি বোঝা গেল না। দ্বিতীয়তঃ, চৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়, মহাপ্রভুর আদেশে শান্তিপুরের ন্যায় ব্রাহ্মণপ্রধানস্থানে ব্রাহ্মণবংশজাত অদ্বৈত আচার্য হরিদাস ও মুকুন্দকে লইয়া এক পংক্তিতে ভোজন করিয়াছিলেন।

মুকুন্দ হরিদাস লইয়া করহ ভোজন ॥
তবে ত আচার্য সঙ্গে লঞা দুইজনে।
করিল ইচ্ছায় ভোজন, যে আছিল মনে ॥ —চৈ. চ. ২৷৩৷১০৩-১০৪

সুতরাং তাঁহার উপরিউক্ত যুক্তি টেকে না। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে রূপ সনাতন বিধর্মী না হইলে হরিদাসের মত নীলাচলের জগন্নাথ মন্দিরে গমন করিতেন না কেন?

ইহার কারণ বোধ হয়, সনাতন ও রূপ ধর্মান্তরিত না হইলেও তাঁহারা দীর্ঘকাল মুসলমান রাজদরবারে কার্য করিবার নিমিত্ত নিজদিগকে পতিত মনে

[১] গৌরাঙ্গসেবক, ১৩২৭, ফাল্গুন-চৈত্র, পৃঃ ৫৮
[২] ভারতবর্ষ, ১৩৪১, শ্রাবণ, পৃঃ ১৭৮

করিতেন। দবির খাস ও সাকর মল্লিক নামে পরিচয় হেতু ইঁহাদিগকে কেহ কেহ বিধর্মী বলিয়া মনে করেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন দবির খাস ও সাকর মল্লিক নাম ইঁহাদের ধর্মান্তর ইঙ্গিত করে।[১] এখন দবির খাস ও সাকর মল্লিক নাম কিংবা উচ্চরাজপদ বা উপাধিবিশেষ তাহা আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। যদি ইহা নাম হয় তাহা হইলে তাঁহারা জাত্যন্তরিত হইয়াছিলেন বলিতে হয় কারণ ধর্মান্তরিত না হইলে কেহ হিন্দু নাম ছাড়িয়া মুসলমান নাম ব্যবহার করেন না।

দবির খাস কথাটি ফার্সী শব্দ। ইহার শুদ্ধরূপ 'দবির-ই-খাস'। 'খাস' মানে নিজস্ব এবং 'দবির' মানে লেখক, মুন্সী। 'দবির-ই-খাস' শব্দের অর্থ নিজস্ব কর্মসচিব বা প্রাইভেট সেক্রেটারী।[২] কেহ কেহ খাসকে 'খাসা' ধরিয়া 'খাসা' মানে উত্তম ও 'দবির' মানে লেখক করিয়া উত্তম লেখক বলিয়াছেন।[৩] যেখানে 'দবির-ই-খাস' শব্দটিই পাওয়া যাইতেছে সেখানে খাসকে 'খাসা' ধরিবার কোনরূপ আবশ্যকতাই নাই। শিবাজীর রাজ্যশাসন ব্যবস্থায় 'দবির' নামক একটি পদের পরিচয় পাওয়া যায়,—

'The foreign secretary (Persian Dabir, Sanskrit Sumanta)-He was the king's adviser on relation with foreign states, war and peace. It was also his duty to keep intelligence about other countries, to receive and dismiss foreign envoys and maintain the dignity of the state abroad.'[৪]

দিল্লীর সুলতানদের আমলে 'দবির-ই-খাস' নামেই একটি পদের সৃষ্টি হইয়াছিল দেখা যায়,—'The third office was the diwani-i-insha which dealt with royal correspondence. It has rightly been called the treasury of secrets for the dabir-i-khas who presided over this department, was also the confidential clerk of the state···The dabir-i-khas was assisted by a number of dabirs, men who had already established their reputation as masters of style··· The dabir-i-khas was always at hand so that he could be summoned to draft an urgent letter or even take down notes of any conversation worth recording'.[৫]

১ *Chaitanya and his Companions*, p. 15
২ Steingas—*Persian-English Dictionary*, p. 459
৩ ভারতবর্ষ, ১৩৩৭, জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৯০৭
৪ Jadunath Sarkar—*Shivaji and his Times*, 2nd. ed., p. 373
৫ Quereshi. I. H.—*Administration of the Sultanate of Delhi*, 4th ed., pp. 16-87

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি দুইটি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে দবির খাস একটি উচ্চ রাজপদ মাত্র, ইহা কাহারও নাম নহে। 'সাকর মল্লিক' শব্দটিকে সাকর এবং মল্লিক এইভাবে পৃথক করিয়া লইলে 'মল্লিক' শব্দটি যে উপাধি হিসাবে ব্যবহার হইয়াছিল তাহা দেখা যায়। চৈতন্যচরিতামৃত হইতে সনাতনের কনিষ্ঠ বল্লভের মল্লিক উপাধি ছিল জানিতে পারা যায়।

অনুপম মল্লিক তাঁর নাম শ্রীবল্লভ।
রূপ গোসাঞির ছোট ভাই পরম বৈষ্ণব ॥—চৈ. চ. ২।১৯।৩৫

হোসেন শাহের দ্বিতীয়বার ত্রিপুরা আক্রমণে যে সৈন্যাধ্যক্ষ নেতৃত্ব করিয়াছিলেন তাঁহার নাম গৌরাই মল্লিক ছিল জানা যায়।

হোসেন শাহা গৌড়পতি ই কথা শুনিয়া।
গৌরাই মল্লিক ভেজে বহু সৈন্য দিয়া ॥
—ব. সা. প. পুঁথি নং ২২৫৯, পৃঃ ১৯

এই মল্লিকও উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত মনে হয়।

মল্লিক কথাটি কাহারও কাহারও মতে 'মহল্লিক' শব্দজাত।[১] পালি ভাষায় 'মহল্লিক' শব্দের অর্থ বৃদ্ধ, পূজ্য।[২] মল্লিক শব্দটি সংস্কৃতে প্রচলিত আছে, 'মল্লিকনৃণামুপাধিবিশেষঃ'।[৩] ফার্সী কিংবা আরবীতে মল্লিক শব্দের প্রয়োগ নাই। 'মলিক', 'মুলিক' শব্দের প্রয়োগ আছে। 'মল্লিক', 'মলিক' হইতে উৎপন্ন হইতে পারে মনে হয়। আরবি 'মলিক' শব্দের অর্থ A king, a sovereign.[৪]

মোটামুটিভাবে মল্লিক শব্দটি যে বিশেষ মর্যাদাজ্ঞাপক তাহা বোঝা যাইতেছে এবং ইহা যে নাম নহে, উপাধিবিশেষ তাহাও স্পষ্ট জানা যাইতেছে। 'সাকর' অর্থে কেহ কেহ দাতা বা মুক্তহস্ত বলিয়াছেন, সাকর অর্থাৎ সাওকর বা সাওগর শব্দের অর্থ দাতা এবং মুক্তহস্ত।[৫] কেহ কেহ সাকর না বলিয়া সকর বলিতে চাহিয়াছেন এবং এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, 'শ্রীসনাতনের রাজকীয় উপাধি যে সকর মল্লিক তাহার অর্থ হইল প্রধান (স), রাজস্ব (কর) বিভাগীয় শ্রেষ্ঠ কর্মচারী (মল্লিক) অর্থাৎ রেভেনিউ মিনিস্টার।[৬] ইহা কষ্টকল্পনা মাত্র।

[১] গৌড়ীয়, ১৩৪১, ২৬শে শ্রাবণ, পৃঃ ২৫
[২] *The Pali Text Society's Pali English Dictionary*, p. 151
[৩] শব্দকল্পদ্রুম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৮০
[৪] *A Glossary of Judicial and Revenue Terms*, p. 325
[৫] বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ, ১৩৩০, আশ্বিন-কার্তিক, পৃঃ ১৫১
[৬] দৈনিক যুগান্তর, ১৩৬৮, ৫ই ভাদ্র, পৃঃ গ

যেখানে হংসদূতের উপান্ত্যশ্লোকে শ্রীরূপ 'সাকরতয়া' শব্দের সাহায্যে সাকর কথাটিকেই সূচিত করিয়াছেন এবং চরিতগ্রন্থগুলিতে সাকরমল্লিক উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি সেখানে 'সকর' পাঠ ধরার কোনই যৌক্তিকতা নাই। 'সাকর' শব্দটি সম্ভবতঃ আরবি 'সাগির' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সাগির ছোট, উপ; মল্লিক নৃপ; রাজার পরেই যাঁহার স্থান—ছোট খাট রাজা=মন্ত্রী।[১] এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে কিছু অসঙ্গত হয় না। সনাতন যে মন্ত্রী ছিলেন তাহা তো চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যাইতেছে। বাংলা ভক্তমাল গ্রন্থে সাকর মল্লিক ও দবির খাস উপাধিসূচক বলা হইয়াছে।

শ্রীরূপ সনাতন দুই সহোদর।
উজির আছিলা দোঁহে গৌড়িয়া পাৎসার॥
দবির খাস আর সাকর মল্লিক।
খেতাবে দোঁহার সর্ব খেতাবে অধিক॥ —২য় মালা

সুতরাং সাকর মল্লিক ও দবির খাস রূপসনাতনের মুসলমান ধর্মান্তরিত হইবার ফলে নামস্বরূপ ছিল, ইহা কিছুতেই বলা যায় না।

কেহ কেহ রূপের সাকর মল্লিক এবং সনাতনের দবির খাস উপাধি ছিল উল্লেখ করিয়াছেন।[২] আবার কেহ কেহ রূপের দবির খাস এবং সনাতনের সাকর মল্লিক উপাধি ছিল বলিয়াছেন।[৩] আবার কাহারও কাহারও মতে 'নবাব দরবারে কার্য করায় (রূপ, সনাতন ও অনুপম) তিন জনেই মল্লিক উপাধি লাভ করেন'।[৪] রূপের যে মল্লিক উপাধি ছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। অনুপমের মল্লিক উপাধি ছিল পূর্বেই বলিয়াছি। সনাতনের উপাধি যে সাকর মল্লিক ছিল তাহা হংসদূতের উপান্ত্যশ্লোক হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। ঐ শ্লোকটি নিম্নরূপ—

প্রপন্নঃ প্রেমাণাং ভগবতি সদা ভাগবতভাক্
পরাচীনো জন্মাবধি ভবরসাদ্ ভক্তিমধুরঃ।

১ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বাংলা ভাষার অভিধান, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৩২
২ বাংলাচরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য, পৃঃ ২২৫; গৌড়ের ইতিহাস (২য় খণ্ড), পৃঃ ১০৪; বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃঃ ২৬৯; রূপসনাতনশিক্ষামৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০; সপ্ত গোস্বামী, পৃঃ ৬৯
৩ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্য, পৃঃ ৪৬; বৃহৎ বঙ্গ (২য় খণ্ড), পৃঃ ৭১৭; প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৪৭৫; প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, পৃঃ ১৫১; গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর, পৃঃ ২৬৮
৪ গৌড়ীয়, ১৩৩৯, ৬ই ফাল্গুন, পৃঃ ৪৪০

চিরং কোঽপি শ্রীমান্ জয়তি বিদিতঃ সাকরতয়া
ধুরীণো ধীরাণামধি ধরণি বৈয়াসকিরিব ॥

অর্থাৎ ভগবানে একান্ত প্রেমবান্, সর্বদা ভাগবতশাস্ত্রে নিমগ্ন, আজন্ম বিষয়রসের প্রতি বিমুখ, ভক্তিমধুর 'সাকর' এই উপাধিখ্যাত শুকদেবের ন্যায় জ্ঞানীশ্রেষ্ঠদের মুকুটমণি, অনন্তগুণে গুণী কোনও শ্রীযুক্ত পুরুষ পৃথিবীতে সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন।

গোপাল চক্রবর্তী তৎকৃত হংসদূত টীকায় (রচনাকাল ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দ) 'সাকরতয়ার' ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন 'স্বজ্যেষ্ঠং সনাতনং বা বর্ণয়তি তত্রাপ্যয়মর্থঃ' (হংসদূত, কৃষ্ণদাস বাবাজী সং, পৃঃ ২৩২)। 'সাকর' যে সনাতনকে উদ্দিষ্ট করিতেছে সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কেহ কেহ ইহার অন্যরূপ অর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর স্বকৃত টীকাতে 'সাকরতয়া' শব্দের অর্থ 'সংদ্বশীয়তয়া' করিয়াছেন। এক্ষেত্রে গোপাল চক্রবর্তীকেই প্রামাণ্য মনে করা উচিত। কেহ কেহ 'বিদিতঃ সাকরতয়া' পাঠটির পরিবর্তে 'বিদিতঃ সৎকবিতয়া' পাঠ ধরিতে চাহেন। কিন্তু প্রায় সকল পুঁথিতে ও মুদ্রিত গ্রন্থে 'বিদিতঃ সাকরতয়া' পাঠই রহিয়াছে।[১]

স্বাধীন গৌড়ের দুই মন্ত্রী যখন শ্রীচৈতন্যকে রামকেলিতে দর্শন করিতে আসেন তখন নিত্যানন্দ ও হরিদাস শ্রীচৈতন্যকে বলিতেছেন,—

রূপ সাকর আইলা তোমা দেখিবারে। —চৈ. চ. ২।১।১৭৪

রূপ এবং সাকর (মল্লিক) এখানে দুইজনের আগমনের কথাই জানান হইতেছে। রূপকে একজন ধরিলে সাকর (মল্লিক), সনাতন ভিন্ন অন্য কে হইবে ?

চৈতন্যভাগবতে আছে,—

সাকর মল্লিক আর রূপ দুই ভাই।
দুই প্রতি কৃপা দৃষ্ট্যে চাহিলা গোসাঞি ॥ —৩।১০

এখানেও দেখা যাইতেছে সাকর মল্লিক আর রূপ দুইজনের কথা বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন। সাকর মল্লিক কে ?

সাকর মল্লিক নাম ঘুচাইয়া তান।
সনাতন অবধূত থুইলেন নাম ॥ —৩।১০

বৃন্দাবনদাস স্পষ্ট করিয়াই জানাইলেন যে, সাকর মল্লিক হইতেছেন সনাতন। সাকর মল্লিক যে সনাতনের উপাধি ছিল তাহা দেখা গেল। এখন দবির খাস

[১] ব. সা. প. পুঁথি নং ১৯ ; বরাহনগর গ্রন্থমন্দির পুঁথি নং ২৩০ ; পুরীদাস সং ; কাব্যমালা সং ; কৃষ্ণদাস বাবাজী সং

কাহাকে বলা হইত, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী বলিয়াছেন যে, সনাতনই দবির খাস ও সাকর মল্লিক এই দুই নামে অভিহিত ছিলেন।[১] ধনকৃষ্ণ অধিকারী লিখিয়াছেন, 'গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের নিকট পিরোজপুরের মিঞা সাহেবের আরবি দলিলে দেবনাগর অক্ষরে শ্রীরূপের হস্তাক্ষরে লিখিত আছে, গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক শ্রীল শ্রীযুক্ত সনাতন দবির খাস এবং কদমরশুল দরগার দলিলে নাগরী অক্ষরে সনাতন প্রভুর স্বাক্ষর আছে 'শ্রীসনাতন দবির খাস'।[২] ইহা সত্য হইলে সনাতন দবির খাস ছিলেন মনে করা যায়। 'দবির খাস'-এর কাজ যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল পূর্বেই দেখানো হইয়াছে। স্যার যদুনাথ সরকারের মতে 'দবির' শব্দে পররাষ্ট্রসচিব বুঝাইতেছে। যুদ্ধের সময় এরূপ মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া স্বাভাবিক। সেইজন্য হোসেন শাহ উড়িষ্যায় অভিযানের সময় সনাতনকে সঙ্গে লইতে চাহিয়াছিলেন মনে করা যায়। এই দিক হইতে বিচার করিলে সনাতন দবির খাস ছিলেন ভাবিবার বাধা থাকে না।

অধ্যাপক কুরেশীর মতে দবির খাস হইলেন গোপনীয় লেখ প্রস্তুত ও সংরক্ষণের ভারপ্রাপ্ত সচিব। হাতের অক্ষর তাঁহাদের ভালো হওয়া একান্ত আবশ্যক। চৈতন্যচরিতামৃত হইতে রূপের হস্তাক্ষর উত্তম ছিল জানিতে পারা যায়,—

> শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি
> প্রীত হঞা প্রভু করে অক্ষরের স্তুতি ॥ —৩।১।৮৭

বৈষ্ণবগ্রন্থসমূহ নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিলে ধারণা জন্মে যে, রূপ ও সনাতন দুইজনেই দবির খাস বলিয়া আখ্যাত হইতেন।

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে রূপ সনাতন সম্পর্কে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। গ্রন্থের প্রারম্ভে রূপসনাতনের বন্দনাটুকু মাত্র আছে,—

> রূপ সনাতন বন্দোঁ পণ্ডিত দামোদর।

আর শেষ খণ্ডে আছে—নীলাচলে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের সময়—

> কাশীমিশ্র সনাতন আর হরিদাস।
> উৎকলের সভে কান্দি ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥

এই সনাতন আবার সনাতন গোস্বামী কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে দুই ভ্রাতা সম্পর্কে লোচন অপেক্ষা একটু বেশী তথ্য

১ শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ, পৃঃ ১৪৭-১৪৯
২ সনাতন ও রূপ গোস্বামীর জীবন চরিত (১২৯৮ সালে প্রকাশিত), পৃঃ ২৯

পাওয়া যায়। বৃন্দাবনদাস আদিখণ্ডের প্রথম ও নবম অধ্যায়ে এবং অন্ত্যখণ্ডের দশম অধ্যায়ে ইঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

শেষ খণ্ডে শ্রীগৌরসুন্দর মহাশয়।
দবীর খাসেরে প্রভু দিলা পরিচয়॥
প্রভু চিনি দুই ভাইর বন্ধ বিমোচন।
শেষে নাম থুইলেন রূপ সনাতন॥ —১।১
হেনমতে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের রঙ্গ॥
'তাহান কৃপার এই স্বাভাবিক ধর্ম।
রাজ্যপদ ছাড়ি করে ভিক্ষুকের কর্ম॥
কলিযুগে তার সাক্ষী শ্রীদবীর খাস।
রাজ্যপাট ছাড়ি যার অরণ্যে বিলাস॥ —১।৯
দবির খাসেরে প্রভু বলিতে লাগিলা।
এখনে তোমার কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হইলা॥
অদ্বৈতের প্রসাদে হয় প্রেমভক্তি।
জানিহ অদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি॥
কথোদিন জগন্নাথ শ্রীমুখ দেখিয়া।
তবে দুই ভাই মথুরায় থাক গিয়া॥
তোমা সভা হইতে যত রাজস তামস।
পশ্চিমা সভারে দিয়া দেহ ভক্তিরস॥ —৩।১০

প্রথম উদাহরণে শ্রীচৈতন্য দবির খাসের রূপ সনাতন নাম রাখিলেন দেখা যাইতেছে। 'দবির খাস' দুইটি পৃথক শব্দ নহে। ইহা একটি শব্দ। সুতরাং একটি মাত্র শব্দ দিয়া দুইজনকে দ্যোতনা করা যায় না। উভয় ভ্রাতাই দবির খাস ছিলেন মনে করিলে দবির খাস নাম ঘুচাইয়া রূপ সনাতন নাম রাখা অসঙ্গত হয় না। দ্বিতীয় উদাহরণ হইতে বোঝা যাইতেছে, দবির খাস রাজ্যপাট ছাড়িয়াছিলেন। দুই ভাই যেখানে রাজ্যপাট ছাড়িয়াছিলেন সেখানে একজনকে দবির খাস ধরা ঠিক হয় না। তৃতীয় উদাহরণে বৃন্দাবনদাস বক্তব্য আরম্ভ করিয়াছেন এইভাবে, 'দবীর খাসেরে প্রভু বলিতে লাগিলা'। একজনকেই দবির খাস বলিয়া সম্বোধন করা হইলে পরে বৃন্দাবনদাস কি করিয়া বলেন, 'তবে দুই ভাই মথুরায় থাক গিয়া'। মনে হয় বৃন্দাবনদাস দবির খাস বলিতে দুই ভাইকেই বুঝাইয়াছেন।

চৈতন্যচরিতামৃত হইতেও মনে করা যাইতে পারে যে, দুই ভাই-ই দবির খাস ছিলেন।

দবির খাসেরে রাজা পুছিলা নিভৃতে ।
গোসাঞি মহিমা তিঁহো লাগিলা কহিতে ॥ —২।১।১৬৫
তবে দবির খাস আইলা আপনার ঘরে । —২।১।১৭১
শুনি প্রভু কহে, শুন রূপ দবীর খাস ।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস ॥
আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপ সনাতন ।
দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন ॥ —২।১।১৯৪-১৯৫

প্রথম ও দ্বিতীয় উদাহরণ হইতে দবীর খাস কে ছিলেন স্পষ্ট করিয়া বলা চলে না। তৃতীয় উদাহরণ হইতে রূপ ও দবির খাস দুইজন ব্যক্তি বলিয়া ধারণা হয়। ইহা দবির খাস উপাধিধারী রূপও এমন ব্যাখ্যাত হইতে পারে। দুইজন ব্যক্তি ধরিলে সনাতন দবির খাস হয় এবং ইহাই অধিকতর সম্ভাব্য হয় কারণ একজনকে রূপ দবির খাস বলিয়া সম্বোধন করিয়া পর মুহূর্তেই 'তুমি দুই ভাই' সম্বোধন হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, 'আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপ সনাতন' এই ছত্রের সনাতন 'দবির খাস'-এর পরিবর্তেই বলা হইল মনে হয়। এই অর্থ গ্রহণে কোন বাধা নাই কারণ সনাতন যে কার্য নির্বাহ করিতেন তাহা দবির খাস পদের উপযুক্ত। কেহ কেহ 'শুনি মহাপ্রভু কহে শুন দবির খাস' পাঠ ধরেন। বহু পুঁথি ও মুদ্রিত সংস্করণে এই পাঠ আছে।[১] এই পাঠ যদি প্রকৃত পাঠই হয় তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য দুই ভাই-ই দবির খাস ছিলেন ইহা অধিকতর সমর্থিত হয়।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল হইতে আমাদের ধারণার দৃঢ় সমর্থন পাওয়া যায়।

হেনকালে দবির খাস ভাই দুই জনে।
দেখিঞা চৈতন্য চিনিলেন ততক্ষণে ॥
মহাবৈরাগ্যমূর্তি মৃত্তিকার ভাণ্ড সঙ্গে ।
নিরবধি প্রেমধারা পুলক সর্বাঙ্গে ॥
যতেক সম্পদ তারা তৃণ জ্ঞান করি ।
বৃন্দাবনে ভ্রমে অকিঞ্চন বেশ ধরি ॥
ঈশ্বর দবিশ খাস ভাই সনাতন ।
গৌড়েন্দ্র সম্পদ ছাড়ি হৈলা অকিঞ্চন ॥

*　*　*

১ জগদীশ্বর গুপ্ত সং, বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী সং, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি ৩৭৩ নং ও ৩৭৬ নং (লিপিকাল ১০৬৮ সাল ও ১০৮৭ সাল)

চৈতন্য দর্শনে যাঁর শাপ বিমোচন।
গোসাঞি নাম থুইলেন রূপ সনাতন॥
গোসাঞি বলেন হৈলা রূপ দবির খাস।
রূপ সনাতন করি খ্যাতির প্রকাশ॥—তীর্থখণ্ড

এই উদ্ধৃতির 'ঈশ্বর দবিশ খাস ভাই সনাতন' পাঠটি অত্যন্ত ভ্রান্ত। শুদ্ধপাঠ হইবে, 'ঈশ্বর দবির খাস তাই সনাতন' (এসিয়াটিক সোসাইটি পুঁথি নং জি ৫৭৩৮)। ইহার অর্থ মনে হয়, সনাতন ঈশ্বরের দবির খাস হইলেন। তাই তিনি গৌড়েশ্বরের সম্পদ ত্যাগ করিলেন অর্থাৎ তিনি ভগবানের সেবক হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রহিলেন কুতূহলে।
দবির খাস দুই ভাই গেলা নীলাচলে॥
দবির খাসে ঘুচাইলা সংসার বন্ধন।
দুই ভাইর নাম হইল রূপ সনাতন॥—উত্তরখণ্ড

প্রথম ও দ্বিতীয় উদাহরণ হইতে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে, জয়ানন্দ রূপ ও সনাতন দুইজনকেই দবির খাস বলিয়াছেন। দ্বিতীয় উদাহরণে দবির খাস দুই ভাইয়ের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে বলা চলে, 'দবির খাস দুই ভাই গেলা নীলাচলে'।

সুতরাং রূপ ও সনাতন দুইজনেই দবির খাস ছিলেন ধরিতে পারা যায়। সনাতনের যেরূপ গুরুত্ব চৈতন্যচরিতামৃত হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তাহা হইতে তাঁহার পক্ষে সাকর মল্লিক এবং দবির খাস দুইটি পদের ক্ষমতায় আসীন থাকা অসম্ভব নহে। স্যার যদুনাথ সরকার ও কুরেশীর 'দবির' ও 'দবির-ই-খাস' শব্দের ব্যাখ্যা হইতে দুই ভাইয়েরই এই গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

রূপ সনাতন সত্যই কি শ্রীচৈতন্যপ্রদত্ত নাম?

শ্রীচৈতন্য দুই ভ্রাতার নূতন নামকরণ করিয়াছিলেন বলা হয়।

শ্রীচৈতন্য দর্শনে তাঁর শাপবিমোচন।
গোসাঞি নাম থুইলেন রূপ সনাতন॥
—চৈতন্যমঙ্গল (জয়ানন্দ),

প্রভু চিনি দুই ভাইর বন্ধ বিমোচন।
শেষে নাম থুইলেন রূপ সনাতন॥—চৈ. ভা. ১।১
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥
আজি হইতে দোঁহার নাম রূপ সনাতন।
—চৈ. চ. ২।১।১৯৪-১৯৫

শ্রীচৈতন্যের নিকট নিত্যানন্দ যখন বলিতেছেন, 'রূপ, সাকর মল্লিক আইল তোমা দেখিবারে' (চৈ. চ. ২৷১৷১৭৪), তখন নিত্যানন্দের বলিবার ভঙ্গী হইতে মনে হয় রূপ, রূপ নামেই পূর্বপরিচিত ছিলেন। চৈতন্যভাগবতে যেখানে আছে,

সাকর মল্লিক নাম ঘুচাইয়া তান।
সনাতন অবধূত থুইলেন নাম ॥ —চৈ. ভা. ৩৷১০

সেখানে মনে হয় কোন নূতন নামকরণ না করিয়া শ্রীচৈতন্য উপাধিটুকু খসাইয়া দিলেন মাত্র, কারণ ইহার কিছু পূর্বেই বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন,—

এই মত রূপ সনাতন দুই ভাই।
স্তুতি করে শুনে প্রভু চৈতন্য গোসাঞি ॥ —চৈ. ভা. ৩৷১০

শ্রীচৈতন্য যখন দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করেন, তখন তিনি গোপাল ভট্টকে রূপ, সনাতনাদির সহিত মিলিত হইবার আশ্বাস দিয়াছিলেন দেখা যায়।

ইহা সভে সিদ্ধি পাইলে যাইহ বৃন্দাবনে।
সেখানে আমার প্রিয় রূপ সনাতন ॥
অচিরাতে পাঠাইবা নাহিক সংশয়।
দোঁহার সহিত তোমার হইবে প্রণয় ॥

—অনুরাগবল্লী, ১ম মঞ্জরী

বৃন্দাবনে শ্রীরূপ সনাতনের সঙ্গে।
সেখানে পাইবে বহু সুখের তরঙ্গে ॥ —কর্ণানন্দ, ৫ম নির্যাস
পুনঃ কহে অচিরে যাইবা বৃন্দাবন।
মিলিব দুর্লভ রত্ন রূপ সনাতন ॥ —ভ. র. ১৷১২৩

বিষয়কূপ হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় রূপসনাতন শ্রীচৈতন্যকে পত্র লিখিতেন তাহা চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায় (চৈ. চ. ২৷১)। উপরোক্ত বিবৃতিগুলি হইতে অনুমান করা যায় যে, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্বে শ্রীচৈতন্য রূপ, সনাতনের পত্র পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের দৈন্যপত্রী পাইয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার-পূর্বক বৃন্দাবনে পাঠাইবার সংকল্প হয়তো করিয়া থাকিবেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে তিনি তাঁহার পূর্বসংকল্প গোপাল ভট্টের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকিতে পারেন। তাই তিনি গোপাল ভট্টকে বলিলেন—তুমি বৃন্দাবনে যাইও, সেখানে রূপ সনাতনকে আমি শীঘ্র পাঠাইব, তাঁহাদের সহিত তুমি মিলিত হইবে।

শ্রীচৈতন্য যদি রামকেলিতে সাক্ষাতের পর রূপ, সনাতন নামকরণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে ইহার পূর্বে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে গোপাল ভট্টের নিকট রূপ সনাতনের কথা কি করিয়া বলেন! তাই মনে হয়, রূপ, সনাতন শ্রীচৈতন্য প্রদত্ত নাম নহে। ঐ নাম পূর্ব হইতেই ছিল। ১৫১০-১৫১২ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য

ভ্রমণকালে ১৫১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে দুই ভাইয়ের নাম রূপ সনাতন দিবেন এরূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন বলা চলে না।

জানা যায় যে গৌড়ে কদমরশুল দরগার দলিলে সনাতনের নিজের হাতে শ্রীসনাতন দবির খাস স্বাক্ষর আছে।[১] এই দলিল কতটা প্রামাণিক বলা যায় না। যদি ইহা প্রামাণিক বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই সনাতন নাম ছিল বলা যায় কারণ শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের পর সনাতন শ্রীচৈতন্যপ্রদত্ত নাম হইয়া থাকিলে ইহার সহিত দবির খাস যুক্ত হইতে পারে না। কারণ শ্রীচৈতন্য তো দবির খাস পূবে ত্যাগ করাইয়াছেন।

জীবের বংশপরিচায়িকায় রূপ সনাতন নাম রহিয়াছে। সুলতানের মন্ত্রী হইবার পূর্বে তাঁহাদের নিশ্চয়ই কোন হিন্দু নাম ছিল। সেই নাম যদি রূপ সনাতন ছাড়া অন্য কিছু হইত তাহা হইলে জীব তাঁহার আভাস দিতেন। আদি শ্রীচৈতন্যচরিতকার মুরারি গুপ্ত তাঁহার গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য কর্তৃক রূপ সনাতন নাম প্রদত্ত হইয়াছিল এরূপ কোন ইঙ্গিত দেন নাই। এই সব কারণ হইতে মনে হয়, রূপ সনাতন শ্রীচৈতন্যের প্রদত্ত নাম নাও হইতে পারে।

রূপসনাতন কি বিবাহ করিয়াছিলেন ?

রূপসনাতন বিবাহ করিয়াছিলেন কি না তাহা একটি বিতর্কের বিষয়। প্রাচীন কোন বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে এই দুই ভ্রাতার বিবাহ সম্পর্কে কোনরূপ বিবরণ না থাকায় সমস্তটাই অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। কাহারও কাহারও মতে রূপসনাতন অকৃতদার ছিলেন।[২] আবার কাহারও কাহারও মতে তাঁহারা কৃতদার ছিলেন।[৩] সতীশচন্দ্র মিত্র মন্তব্য করিয়াছেন, রামকেলিতে সস্ত্রীক সনাতন ও রূপ শ্রীচৈতন্যকে পূজা করেন (সপ্ত গোস্বামী, পৃঃ ৮১)। এই মন্তব্যের সমর্থনে তিনি জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল হইতে প্রমাণবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন,—

সনাতন রাজপণ্ডিত মহাশয়।
দাম্পত্যে পূজিল গৌরচন্দ্র কৃপাময় ॥ —নদীয়াখণ্ড

এই দুই ছত্রের পূর্বপ্রসঙ্গ যদি তিনি লক্ষ্য করিতেন তবে দেখিতেন এই সনাতন, সনাতন গোস্বামী নহেন। ইনি সনাতন মিশ্র, বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা। প্রেমবিলাস গ্রন্থের ২৩শ বিলাসে রূপসনাতনের পত্নীর সংবাদ পাওয়া যায়। মুদ্রিত প্রেম-

১ ধনকৃষ্ণ অধিকারী—সনাতন ও রূপ গোস্বামীর জীবনচরিত, পৃঃ ২৯
২ রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ সং, গোপালচম্পূ ভূমিকা, পৃঃ ১১
৩ *The Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal*, p. 40

বিলাসের ষোড়শ বিলাসের পরে কিছুই যে বিশ্বাস্য নহে তাহা ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সুষ্ঠুভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।[১] রামচরণঠাকুর রচিত অসমীয়া গ্রন্থ 'শঙ্করচরিত'-এ আছে,—শঙ্করের সহিত সাক্ষাৎকারের ফলে দুই ভাই গৃহত্যাগ করেন এবং রূপের পরমাসুন্দরী পত্নী তাহাতে কাতরতা প্রকাশ করেন।

প্রভাততে পাছে লরিল শংকর
দুইভায়ো এড়িলা ঘর।
রূপের যে ভার্যা পরমাসুন্দরী
করন্ত বহু কাতর॥

'শঙ্করচরিত' গ্রন্থ বিশেষ প্রামাণিক নহে, সুতরাং ইহার বিবরণ হইতে রূপ সনাতন বিবাহিত ছিলেন বলিয়া কোনরূপ দৃঢ় ধারণা করা যায় না।

রূপসনাতন ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা কোনরূপ অধর্মীয় কার্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে ইহা বিশ্বাস করা যায় না। রূপসনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভ বিবাহিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার কৃতদার হইবার পূর্বে কনিষ্ঠ ভ্রাতার কৃতদার হওয়া একটি গুরুতর পাপ বলিয়া পরিগণিত ছিল। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য তাঁহার উদ্বাহতত্ত্বে বলিয়াছেন, 'জ্যেষ্ঠেঽনির্বিষ্টে কনীয়ান্ নির্বিশন পরিবেত্তা ভবতি পরিবিন্নো জ্যেষ্ঠঃ পরিবেদনীয়া কন্যা পরিদায়ী দাতা পরিকর্তা যাজকঃ তে সর্বে পতিতা ইতি'।[২] সুতরাং এইরূপ ভয়ংকর পাপে তাঁহারা নিমজ্জিত হইয়াছিলেন মনে করা যায় না। চৈতন্যচরিতামৃতে ও ভক্তিরত্নাকরে তাঁহাদের পরিবার পরিজনাদির উল্লেখ হইতে মনে হয়, তাঁহারা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্তানাদি হয়তো ছিল কিন্তু ভক্তিপথে আসেন নাই বলিয়া তাঁহাদের কোন নাম পাওয়া যায় নাই।

রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যের সহিত রূপসনাতনের সাক্ষাৎ

রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যের সহিত রূপসনাতনের সাক্ষাৎ বৈষ্ণব ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগপূর্বক নিষ্কিঞ্চন জীবনযাপনের যে মহান আদর্শ দুই ভ্রাতা দেখাইয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎকারেরই ফল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে শাস্ত্রীয় ভিত্তির উপর সুদৃঢ় করিয়া ইহার সুমহান গৌরব বৃদ্ধির মূলে দুই ভ্রাতার অবদান অসামান্য। রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যের আগমন না ঘটিলে এই দুই ভ্রাতাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পুরোভাগে পাওয়া সম্ভব হইত না। রামকেলিতে

১ চৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃঃ ৪৭৭-৪৮৫
২ জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সং, পৃঃ ১১৭

শ্রীচৈতন্যের সহিত রূপসনাতনের সাক্ষাতের মত উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিন্তু কবিকর্ণপুর, লোচন, জয়ানন্দ বা বৃন্দাবনদাস কেহ উল্লেখ করেন নাই। ইহা আশ্চর্যের বিষয়। বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের সাক্ষাৎকালে বর্তমান ছিলেন বলিয়া চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়। সুতরাং বৃন্দাবনদাস তাঁহার নিকট এই ঘটনা শুনিয়া থাকিবেন অনুমান করা যায়। শ্রীচৈতন্য রামকেলিতে যে গিয়াছিলেন বৃন্দাবনদাস তাহা বলিয়াছেন কিন্তু রূপসনাতনের সহিত সাক্ষাতের কথা বলেন নাই। বোধ হয়, ভাবাবেশে লিখিবার সময় তিনি ইহা বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন। মুরারি গুপ্ত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যের সহিত রূপসনাতনের সাক্ষাতের বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন।

রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যের সহিত রূপ ও সনাতনের সাক্ষাৎকাল নির্ণয় করিতে গিয়া ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন একস্থানে ১৫১০ খৃষ্টাব্দ[১] এবং অন্যত্র ১৫১৬ খৃষ্টাব্দ[২] নির্ধারণ করিয়াছেন। সতীশচন্দ্র মিত্র ১৫১৩ খৃষ্টাব্দ[৩] এবং গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী ১৫১৪ খৃষ্টাব্দ[৪] স্থির করিয়াছেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের সহিত রূপসনাতনের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে করিয়াছেন।[৫]

১৫১০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি নীলাচলে গমন করেন এবং দুই বৎসরকাল দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর দুই বৎসর নীলাচলে থাকিয়া সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষে গৌড়ে আগমন করেন। সুতরাং ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের একটি মত ১৫১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য রামকেলিতে আসেন কিছুতেই গ্রহণ করা চলে না। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সুষ্ঠুভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ফাল্গুনের শেষভাগের মধ্যে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে আসিয়াছিলেন।[৬] শ্রীচৈতন্য প্রায় দেড়মাস পুরীতে অবস্থান করিয়া বৈশাখের প্রথমে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের জন্য বাহির হন।

বৈশাখের প্রথমে দক্ষিণে যাইতে হৈল মন। —চৈ. চ. ২।৭।৫

সকলের নিকট দাক্ষিণাত্য গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন,—

দিন চারি রহি প্রভু ভট্টাচার্য স্থানে।
চলিবার লাগি আজ্ঞা মাগিল আপনে॥ —চৈ. চ. ২।৭।৪৮

১ বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭১৭
২ *The Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal*, p. 39
৩ যশোহর খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৩৭২
৪ শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ, পৃঃ ১৩৫
৫ চৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃঃ ১৫৬-১৫৭
৬ চৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃঃ ১০-১৪

ইহার পরদিন আলালনাথে উপস্থিত হইয়া রাত্রি কাটাইলেন,—

এইরূপে সেই ঠাঁই ভক্তগণ সঙ্গে।
সেই রাত্রি গোঙাইলা কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥ —চৈ. চ. ২।৭।৮৮

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে বৈশাখের প্রথম তারিখে দাক্ষিণাত্য যাইবার সংকল্প, তাহার পর চারদিন ভট্টাচার্যগৃহে অবস্থান ও তাহার পরদিন আলালনাথে অবস্থান মোট ছয়দিন অতিবাহিত হইল। বৈশাখের ৭ই তারিখে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে শ্রীচৈতন্য বাহির হইলেন। ইহা সম্ভবতঃ ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে-২২শে এপ্রিল হইবে। প্রায় দুই বৎসর দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিয়া জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা বা স্নানযাত্রার পূর্বে নীলাচলে ফিরিয়া আসেন (চরিতামৃতং মহাকাব্য ১৩।৫০, চৈ. চ. ২।১।১১২)। ইহা সম্ভবতঃ ১৫১২ খৃষ্টাব্দের জুন-জুলাই হইবে। রথযাত্রার পূর্বে স্নানযাত্রা হয়, রথযাত্রা প্রায়শঃই জুলাই মাসে হইয়া থাকে। ইহার পর দুই বৎসর নীলাচলে অবস্থান করেন এবং সন্ন্যাসের পঞ্চমবর্ষে বিজয়াদশমীর পর গৌড়ে যাত্রা করেন (চৈ. চ. ২।১৬।৯৩)। ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী হইতে ১৫১৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে চারি বৎসর পূর্ণ হয়। ১৫১৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী হইতে ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে পঞ্চম বৎসর পূর্ণ হয়। সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষে বিজয়াদশমীর পর যাত্রা করিলে ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে গৌড় যাত্রা করেন দেখা যায়। এই হিসাব সন্ন্যাস গ্রহণের দিন হইতে বৎসর গণনা করিয়া হইতেছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শকের হিসাব ছাড়িয়া কি এইরূপ হিসাব করিবেন? শকের হিসাবেও দেখা যাইবে, ১৫১৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ে গমন করিয়াছিলেন।

১৪১৩ শকের মাঘমাসে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১৪৩২ শকের বৈশাখমাসে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বাহির হন এবং দুই বৎসর থাকিবার পর জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা বা স্নানযাত্রার পূর্বে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্য ১৪৩৪ শকের জ্যৈষ্ঠমাসে (১৫১২ খৃষ্টাব্দের জুন-জুলাই) নীলাচলে ফেরেন। নীলাচলে ফিরিয়া শ্রীচৈতন্য উত্তরভারতভ্রমণে যাইতে ইচ্ছুক কিন্তু ইচ্ছা ফলবতী হইতেছে না।

দক্ষিণ যাঞা, আসিতে দুই বৎসর লাগিল।
আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে।
রামানন্দ হঠে প্রভু না পারে চলিতে ॥
—চৈ. চ. ২।১৬।৮৩-৮৪

'তেন তদুপরোধান্মথুরাং জিগমিষুরপি বর্ষদ্বয়মদ্যশ্চ ইতি কৃত্বা বিলম্বিতো ভগবান্' (চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৯ম অঙ্ক)। ১৪৩৪ শকে স্নানযাত্রার পূর্বে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে ফিরিয়াছেন। ইহার পর বৃন্দাবনে যাইবেন সংকল্প করিয়াছেন কিন্তু রামানন্দাদির

জন্য যাওয়া হইয়া উঠিতেছে না। রামানন্দাদির অনুরোধ এড়াইয়া যখন যাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন সার্বভৌম, রামানন্দের বিনীত মিনতি,—

দোঁহে কহে এবে বর্ষা চলিতে নারিবা।
বিজয়া দশমী আইলে অবশ্য চলিবা ॥ —চৈ. চ. ২।১৬।৭২

১৪৩৪ শকের বর্ষাকাল হইতে (স্নানযাত্রার কিছু পরেই বর্ষাকাল) ১৪৩৬ শকের বর্ষাকাল দুই বৎসর পূর্ণ হয়। বৃন্দাবনে দুই বৎসর ধরিয়া যাইবার চেষ্টা ১৪৩৬ শকের বর্ষার পর বিজয়া দশমীতে পূর্ণ হইল।

আনন্দে মহাপ্রভু কৈল সমাধান।
বিজয়াদশমী দিনে করিল পয়ান ॥ —চৈ. চ. ২।১৬।৭৪

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে প্রচলিত শকের হিসাব করিলেও শ্রীচৈতন্যের রামকেলিতে গমন ১৪৩৬ শকই হয়। ১৪৩৬ শকে বর্ষার পর বিজয়াদশমীতে অর্থাৎ ১৫১৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর–অক্টোবরেই শ্রীচৈতন্য গৌড় যাত্রা করেন। ১৪৩৬ শক হইলে ১৪৩১ শকে সন্ন্যাস ধরিয়া সন্ন্যাসের পঞ্চমবর্ষ হয়না সত্য কিন্তু সন্ন্যাসের পঞ্চমবর্ষ ১৪৩৫ শক ধরিলে নীলাচলে ও দাক্ষিণাত্যে প্রায় চারিবৎসর অবস্থান সম্ভব হয় না। শ্রীচৈতন্য ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে বিজয়া দশমীর পর গৌড় যাত্রা আরম্ভ করেন, তাহা পূর্বে দেখানো হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপে পোঁছাইতে পনের দিন এবং সেখান হইতে রামকেলিতে গমনে দিন দশ, মোট প্রায় একমাস লাগে। পথে শান্তিপুর ইত্যাদিতে কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সুতরাং খুব বেশী হইলে দেড় মাস সময় লাগে। সুতরাং রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যের সহিত রূপ সনাতনের সাক্ষাৎ নভেম্বর বড় জোর ডিসেম্বরের মধ্যে হওয়া উচিত। কিন্তু রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যের গমন উপলক্ষ্যে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহার কাল জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি। এই উৎসবের ঐতিহ্যে বিশ্বাস করিলে রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যের সহিত রূপ সনাতনের সাক্ষাৎকার ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাস হয়। শ্রীচৈতন্য সনাতনের উপদেশে রামকেলি হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন এবং একাকী বৃন্দাবনে যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। বৃন্দাবনে যাইবার জন্য যখন প্রস্তুত, তখন গদাধর পণ্ডিত বলিলেন,—

এই আগে আইল প্রভু বর্ষা চারিমাস।
এই চারিমাস কর নীলাচলে বাস ॥ —চৈ. চ. ২।১৬।২৭১

সকলের ইচ্ছায় শ্রীচৈতন্য চারিমাস থাকিয়া শরৎকালে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন (চৈ. চ. ২।১৬।২৮২)। শ্রীচৈতন্য যদি অক্টোবর কিংবা নভেম্বরে রামকেলিতে গিয়া থাকেন তাহা হইলে নীলাচলে ফিরিয়া আসিতে তাঁহার বড় জোর ফেব্রুয়ারী লাগিবার কথা। ফেব্রুয়ারী মাসে নীলাচলে প্রত্যাগত শ্রীচৈতন্যকে গদাধর পণ্ডিত কি করিয়া বলেন, "এই আগে আইল প্রভু বর্ষা চারিমাস"। ফেব্রুয়ারী মাস

বসন্তকাল। অন্ততঃ জুন মাস না আসিলে এই আগে বর্ষা চারিমাস বলা চলে না। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে রামকেলিতে গমনের ঐতিহ্যে আস্থাবান হইলে নীলাচলে শ্রীচৈতন্য জুলাইয়ের প্রথম দিকে ফিরিয়া আসিতে পারেন এবং গদাধরের 'এই আগে আইল প্রভু বর্ষা চারিমাস' উক্তিও সম্ভব হয়। জুন মাসে সাক্ষাতের ঐতিহ্যের ব্যাপারটি আরও এক দিক দিয়া সমর্থন করা যায়। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীচৈতন্যের বৃন্দবান গমনের সংবাদ পাইয়া রূপও যাত্রা করেন।

১৫১৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে রূপ বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। ১৫১৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকিলে বিষয় সম্পত্তি দেখিবার মত এক বৎসর সময় পাইয়াছিলেন মনে করা যায় (চৈ. চ. ৩।৪।২০৫-২০৬)। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পরে এক বৎসর সময় লাগিল কেন? ইহা হইতে মনে হয়, ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সাক্ষাতের পর ঐ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বৃন্দাবন যাত্রা করায় বিষয়সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাই পর বৎসর গৌড়ে গিয়া এক বৎসর থাকিয়া বিষয়-সম্পত্তির বন্দোবস্ত করেন।

এই সব হইতে মনে হয়, ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসেই রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যের সহিত রূপসনাতনের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল।

দীক্ষা ও পুরশ্চরণ

শ্রীচৈতন্যের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া দুই ভাই গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং শীঘ্রই যাহাতে শ্রীচৈতন্যচরণপ্রাপ্তি ঘটে তাহার জন্য ব্রাহ্মণ বরণপূর্বক কৃষ্ণমন্ত্রে পুরশ্চরণ করাইলেন।

দুই ভাই বিষয় ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল ॥
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।
অচিরাতে পাইবারে চৈতন্য চরণ ॥ —চৈ. চ. ২।১৯।৩-৪

মন্ত্রশুদ্ধির জন্য অনুষ্ঠানবিশেষকে পুরশ্চরণ বলে। পুরশ্চরণ ব্যতীত মন্ত্র শক্তিহীন বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহা পঞ্চাঙ্গ-অভিষেক, জপ, তর্পণ, হোম ও ব্রাহ্মণ-ভোজন।

জপহোমৌ তর্পণঞ্চাভিষেকোবিপ্রভোজনম্।
পঞ্চাঙ্গোপাসনং লোকে পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥

হরিভক্তিবিলাসে বিধি আছে যে, পুরশ্চরণ করিবার পূর্বে দীক্ষাগ্রহণ করিতে হয়।

শ্রীগুরোর্মন্ত্রমাসাদ্য পুরশ্চরণকর্মণি।
দীক্ষাং কৃত্বা পুনস্তেনাহনুজ্ঞাতঃ প্রারভেত তৎ ॥ —হ. ভ. বি. ১৭।৩

সুতরাং মনে করিতে হয় যে, রূপসনাতন যখন পুরশ্চরণ করাইয়াছিলেন তখন তাঁহারা নিশ্চয়ই পূর্বে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। দুইভাই দীক্ষাগ্রহণ করিয়া থাকিলে তাঁহাদের দীক্ষাগুরু কে ছিলেন? ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মনে করেন শ্রীচৈতন্য সনাতনের গুরু।[১] ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ বলিয়াছেন বৈষ্ণবতোষণীর মঙ্গলাচরণে উক্ত বিদ্যাবাচস্পতিই গুরু।[২] ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মত গ্রহণ করিলে উহা বৈষ্ণবসমাজের প্রচলিত ধারণার বিরোধী হয়। ইঁহাদের মতে শ্রীচৈতন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তিনি নিজে কাহাকেও দীক্ষা দেন না। কিন্তু এই ধারণা খুব যুক্তিসহ মনে করা যায় না।

সনাতনের বৃহদ্ভাগবতামৃত পাঠ করিলে দৃঢ় ধারণা জন্মে যে শ্রীচৈতন্যই তাঁহার গুরু ছিলেন। এই গ্রন্থের দশম ও একাদশ শ্লোকে তিনি স্পষ্টতঃই শ্রীচৈতন্যকেই গুরু বলিয়া প্রণাম জানাইয়াছেন।

নমঃ শ্রীগুরুকৃষ্ণায় নিরুপাধিকৃপাকৃতে।
যঃ শ্রীচৈতন্যরূপোহভূৎ তন্বন্ প্রেমরসং কলৌ ॥
ভগবদ্ভক্তিশাস্ত্রাণাময়ং সারস্যসংগ্রহঃ।
অনুভূতস্য চৈতন্যদেবে তৎপ্রিয়রূপতঃ ॥

অর্থাৎ যিনি কলিযুগে প্রেমরস বিস্তারের জন্য শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ, সেই নিরুপাধিকৃপাকারী শ্রীকৃষ্ণরূপ গুরুবরকে নমস্কার করি। এই গ্রন্থ ভগবদ্ভক্তি-শাস্ত্রসমূহের সারভূত এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা হইতে অনুভূত বলিয়া তাঁহারই সংগ্রহ।

সনাতন ইহার টীকারম্ভে লিখিয়াছেন,—'শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়রীত্যা স্বস্যেষ্টদেবতরূপং শ্রীগুরুবরং প্রণমতি—নম ইতি।' এই বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থ সনাতনগোস্বামীর আধ্যাত্মিক অনুভবের রূপক বলা যাইতে পারে। গোপকুমার স্বয়ং সনাতন মনে করা যায় এবং ব্রাহ্মণকুমার জয়ন্তকে শ্রীচৈতন্য বলা চলে। ভগবদ্-অনুচরগণ গোপকুমারকে বলিলেন,—

গৌড়ে গঙ্গাতটে জাতো মাথুরব্রাহ্মণোত্তমঃ।
জয়ন্তনামা কৃষ্ণস্যাবতারস্তে মহান্ গুরুঃ ॥ —২।৩।১২২

অর্থাৎ গৌড়দেশে গঙ্গাতটে জয়ন্ত নামে যে এক মাথুর ব্রাহ্মণোত্তম আছেন, তিনি

[১] চৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃঃ ১৩৭
[২] চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য পরিশিষ্ট, পৃঃ ২৵০-২৶০

শ্রীকৃষ্ণের অবতার এবং তিনিই তোমার মহান্ গুরু। গৌড়দেশে গঙ্গাতীরে কৃষ্ণের অবতার শ্রীচৈতন্য ছাড়া আর কে আবির্ভূত হইয়াছিলেন? রূপকের মাধ্যমে সনাতন শ্রীচৈতন্যকেই গুরু বলিয়াছেন অনুমান করা যায়।

কেশীতীর্থে ব্রাহ্মণকর্তৃক গোপকুমারকে দশাক্ষর মন্ত্রদান শ্রীচৈতন্যকর্তৃক সনাতনকেই মন্ত্রদানের ইঙ্গিত করে।

এবমেতং ভবন্মন্ত্রং স্নাতায়োপদিদেশ মে।
পূর্ণকামোঽনপেক্ষ্যোঽপি স দয়ালুশিরোমণিঃ॥—২।১।১২১

অর্থাৎ তিনি পূর্ণকাম এবং সর্ববিষয়ে অনপেক্ষ হইয়াও দয়ালুশিরোমণি বলিয়া আমি স্নান করিবার পর আমাকে এই মন্ত্রটি উপদেশ দিলেন। পরবর্তী শ্লোকে পূজাবিধিও শিখাইয়াছিলেন, বলা হইয়াছে।

এই গ্রন্থের ২।১।১১৫-১২২, ১৮৫, ১৯৪-১৯৫, ২।৩।৩-৪, ১২২ ও ২।৪।৩-৪ ইত্যাদি শ্লোকসমূহ পাঠ করিলে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে সনাতন শ্রীচৈতন্যের প্রসঙ্গই এই সমস্ত স্থানে উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি এই সমস্ত শ্লোকের টীকাতে অনেকস্থানে শ্রীচৈতন্যকে গুরুবর বলিয়া প্রণামও জানাইয়াছেন।

হরিভক্তিবিলাসের টীকাতেও মঙ্গলাচরণের 'চৈতন্যদেবং ভগবন্তমাশ্রয়ে'র টীকায় 'পরমগুরুরূপং শ্রীমদিষ্টদৈবতং শরণত্বেনাশ্রয়তি চৈতন্যেতি' বলিয়াছেন। এখানে শ্রীচৈতন্যকে গুরুই বলা হইয়াছে। প্রথম বিলাসের ১৯৩ শ্লোকের 'প্রভুং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যং তং নতোঽস্মিগুরূত্তমং'-এর টীকায় 'পরমগুরুং শ্রীভগবন্তং প্রণমতি-প্রভুমিতি' বলিয়াছেন। এই সকল প্রমাণ হইতে অনুমান করা যায় যে, শ্রীচৈতন্যই ইঁহাদের দীক্ষাগুরু ছিলেন। শ্রীচৈতন্য কর্তৃক দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াই তাঁহারা পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন মনে হয়।

বিদ্যাবাচস্পতি শিক্ষাগুরু ছিলেন এই প্রমাণই পাই। দীক্ষাগুরু হইয়া থাকিলে অনুরাগবল্লী, ভক্তিরত্নাকর ইত্যাদি গ্রন্থে সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইত।

কয়েকটি হিন্দী গ্রন্থে রূপসনাতনকে নিত্যানন্দ শিষ্য বলা হইয়াছে এবং তাঁহারই আজ্ঞাক্রমে রূপসনাতন বৃন্দাবনে আগমন করেন, এইরূপ কথাও বলা হইয়াছে।[১] এই মন্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থে এরূপ কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। সনাতন বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীর মঙ্গলাচরণে এবং রূপ রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকার প্রারম্ভে একবার মাত্র নিত্যানন্দের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

১ সংসারকে মহান্ পুরুষ, পৃঃ ২৯৩; ভক্তকল্পদ্রুম, পৃঃ ৪৮; ভক্তমালটীকা-ভক্তিসুধাস্বাদতিলক, পৃঃ ৫৯২

সনাতন ও রূপের রাজসভা ত্যাগ

শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের পর দুইভ্রাতা সম্ভবতঃ পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে রূপ আগে পালাইবেন, তাহার পর সনাতন রাজসভা ত্যাগ করিবেন। রূপ স্বোপার্জিত অর্থাদি লইয়া বাসভূমি ফতেহাবাদে চলিয়া আসেন এইরূপ একটি বিবরণ নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকর হইতে পাওয়া যাইতেছে। পরিবারবর্গাদি তিনি আগে হইতেই সরাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

পূর্বে পরিজনে পাঠাইলা সাবহিতে।
কত চন্দ্রদ্বীপে কত ফতেহাবাদেতে॥
শ্রীরূপ বল্লভ সহ নৌকায় চড়িয়া।
বহু ধন লৈয়া গৃহে গেলা হর্ষ হইয়া॥

—ভ. র. ১৷৬৪৮-৬৪৯

চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যাইতেছে, রূপ সঞ্চিত অর্থের অর্ধেক ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবকে ও বাকী অর্ধেকের অর্ধাংশ আত্মীয়স্বজনের পোষণের জন্য দিয়া আকস্মিক দণ্ডবন্ধনাদি বিপত্তির জন্য বাকী অংশ সজ্জন ব্রাহ্মণের নিকট জমা রাখিলেন এবং সনাতনের ব্যয়ের জন্য দশহাজার মুদ্রা মুদির নিকট গচ্ছিত রাখিলেন (চৈ. চ. ২৷১৯৷৬-৮)। ইহা হইতে রূপ সনাতন যে বিপুল অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে বলিয়াছেন, 'বাইশ লক্ষ স্বর্ণ পোঁতা থাকিল সে গৌড়ে'। ইহা হইতেও তাঁহাদের অতুল বৈভবের অনুমান করা যায়। রূপের রাজসভা ত্যাগের পর সনাতন অসুস্থতার ভাণ-পূর্বক রাজসভায় যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। প্রেরিত বৈদ্য, সনাতনের কোন অসুখ হয় নাই জানাইলে স্বয়ং হোসেন শাহ সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। রাজকার্যে বিরতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সনাতন বলিলেন তিনি আর রাজকার্য করিতে পারিবেন না। উড়িষ্যার সহিত যুদ্ধে তখন হোসেন শাহ লিপ্ত। তিনি সনাতনকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সনাতন তাহাও প্রত্যাখ্যান করিলেন। রূপ পালাইয়া গিয়াছেন, সনাতনও পালাইতে পারেন এই আশঙ্কা করিয়া হোসেন শাহ সনাতনকে বন্দী করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। গৌড়ের কারাগারে সনাতন নিক্ষিপ্ত হইলেন। গৌড়ে যখন সনাতন কারাগারে বন্দী হইয়াছেন সেই সময় শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। রূপ আপনার নিযুক্ত লোকের সাহায্যে শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন গমনের সংবাদ পাইয়া সনাতনকে পত্র দিলেন, আমি ও বল্লভ দুইজনে বৃন্দাবনে চলিলাম। তুমি মুদির নিকট রক্ষিত দশ হাজার মুদ্রার সাহায্যে আত্মবিমোচনের ব্যবস্থা করিয়া অতি শীঘ্র বৃন্দাবনে চলিয়া আইস।

সতীশচন্দ্র মিত্র বলিয়াছেন সনাতনের বন্দীদশার কথা রূপ পথে জানিয়া পত্র

প্রেরণ করেন।[১]. ডঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন রূপ প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া সনাতনকে পলাইবার পরামর্শ দিয়া চিঠি দেন।[২] কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে দেখিতে পাই, রূপ বাংলাদেশে থাকিতেই সনাতনের বন্দীদশার কথা জানিতে পারেন এবং শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন গমনের সংবাদ পাইয়া অনুপমের সহিত বৃন্দাবন যাত্রারম্ভ করিবার পূর্বেই সনাতনকে আত্মবিমোচনের জন্য পত্র লেখেন।

তবে সেই দুই চর শ্রীরূপ ঠাঁই আইলা।
বৃন্দাবন চলিলা প্রভু আসিয়া কহিলা॥
শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল সনাতন ঠাঞি।
বৃন্দাবনে চলিলা শ্রীচৈতন্য গোঁসাঞি॥
আমি দুই ভাই চলিলাম তাঁহারে মিলিতে।
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তাঁহা হৈতে॥
দশসহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদি স্থানে।
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্মবিমোচনে॥
যৈছে তৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন॥
এত লিখি দুই ভাই করিলা গমন॥ —চৈ. চ. ২৷১৯৷৩০-৩৪

কারাগারে বন্দী থাকাকালীন সনাতন রূপের পত্র পাইলেন এবং পত্রানুযায়ী কারাগার-রক্ষককে সাতহাজার মুদ্রা উৎকোচ দিয়া মুক্তি পাইলেন।

লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া।
রাত্র্যে গঙ্গাপার কৈল দাড়ুকা কাটিয়া॥ —চৈ. চ. ২৷২০৷১৪

কেহ কেহ এই কারারক্ষকের নাম মীর হাবুল,[৩] আবার কেহ কেহ শেখ হবু[৪] ছিল, এইরূপ বলিয়াছেন। কোনও বৈষ্ণবগ্রন্থে কারারক্ষকের এই উভয় নামের কোনটিই পাওয়া যায় না। শেখ হবু নামটি সম্ভবতঃ পরবর্তী কালের সহজিয়া গ্রন্থাদি হইতে প্রচলিত হইয়াছে।

শেখ হবুকে ডাকিয়া বলেন সনাতন।
আমাকে দুঃখ দিয়া তোমার কোন প্রয়োজন॥
—শ্রীরূপ সনাতন সম্বিদ উপাসনা—নরোত্তম দাস।
(ক. বি. পুঁথি নং ১১৭০)

১ সপ্ত গোস্বামী, পৃঃ ৮৬
২ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, ৩য় সং, পৃঃ ২৯০
৩ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন—বৃহৎবঙ্গ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭১৯
৪ রজনীকান্ত চক্রবর্তী—গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৯

এই সব গ্রন্থের মধ্যে বর্ণিত ঘটনা অত্যন্ত হাস্যকর। যেমন সনাতন যখন গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন, তখন কুম্ভীররাজ আসিয়া সনাতনকে গঙ্গা পার করিয়া দিল।

সমুদ্র তরঙ্গ দেখি কান্দে উভরায়।
কেমনে হইব পার না দেখি উপায়॥
এই দুঃখ মনে ভাবি রহে কতক্ষণ।
হেনকালে কুম্ভীররাজ দিলা দরশন॥
হরিনাম মহামৃত কর্ণে দিল যার।
তার পৃষ্ঠে চড়িয়া সেই নদী হইলা পার॥ ইত্যাদি

১৫১৫ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন গমন করেন। সেই সময়ে রূপের বৃন্দাবন যাত্রা ও সনাতনের বন্দীদশার কথা জানিতে পারা যাইতেছে। সুতরাং ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে সনাতন কারাগারে বন্দী হন ও উহার কিছুকাল পরে পলায়ন করেন মনে করা যায়।

বৃন্দাবন যাত্রা ও কাশীতে শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলন

সেবক ঈশানকে সঙ্গে লইয়া সনাতন ছদ্মবেশে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে গৌড় হইতে বহির্গত হইলেন। সনাতন পলাতক রাজবন্দী—তাই তিনি ধরা পড়িবার ভয়ে প্রধান রাজপথ গড়িদ্বার দিয়া গেলেন না। ভিন্ন পথে পাতড়া পর্বত হইয়া চলিলেন। দিবারাত্রি অবিরাম চলিতে চলিতে পাতড়া পর্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথাকার ভূম্যধিকারীর নিকট গিয়া পর্বত পার করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ভূমিকের সঙ্গে একজন গণৎকার ছিল। সেই গণৎকার গণনা করিয়া ভূমিককে জানাইল যে, 'ইঁহার ঠাঁই সুবর্ণের অষ্ট মোহর হয়' (চৈ. চ. ২।২০।১৯)। ইহা জানিয়া ভূমিক সনাতন ও ঈশানকে খুবই আদর আপ্যায়ন করিল এবং বলিল রাত্রিতে নিজের লোক দিয়া পার করিয়া দিব। এখন আপনি রন্ধন ভোজনাদি করুন। সনাতন নদীতে স্নান করিয়া আসিলেন। দুই দিন উপবাস গিয়াছে। তাই রন্ধনাদি করিয়া ভোজন করিলেন। রাজমন্ত্রী সনাতন ভূমিকের আদর আপ্যায়ন দেখিয়া মনে চিন্তা করিলেন এই ভূঁইঞা তাহাদের এত আদর যত্ন করিতেছে কেন। ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার ঠাঁই জানি কিছু দ্রব্য আছয়'। ঈশান বলিল তাহার নিকট সাতটি মোহর আছে। ইহা শুনিয়া সনাতন এই কাল-যমকে সঙ্গে আনিবার জন্য ঈশানকে খুব ভর্ৎসনা করিলেন এবং ঈশানের নিকট হইতে ঐ সাতটি মোহর লইয়া ভূমিকের সম্মুখে ধরিলেন। সাতটি মোহর লইয়া পর্বত পার করিবার জন্য সনাতন ভূমিককে অনুরোধ করিলেন। ভূঁইয়া ইহাতে খুব সন্তুষ্ট হইয়া বলিল তোমাদের নিকট আটটি মোহর আছে আমি পূর্বেই

জানিয়াছিলাম। আজি রাত্রে তোমাদের হত্যা করিয়া উহা লইতাম, 'তোমা মারি মোহর লৈতাম আজিকার রাত্রে'। ভাল হইল আমি তোমাদের হত্যাপাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। যাহা হউক, আমি আর মোহর লইব না। পুণ্যের জন্য তোমাদের পর্বত পার করিয়া দিব। সনাতন তদুত্তরে বলিলেন, এই মোহর তুমি না লইলে অন্য কেহ আমাদের মারিয়া লইবে। সুতরাং তুমিই লইয়া আমাদের প্রাণরক্ষা কর। ভূঁইয়া তখন তাহাই গ্রহণ করিয়া চারিজন পাইককে সঙ্গে দিয়া সনাতন ও ঈশানকে পাতড়া পর্বত পার করিয়া দিলেন। পর্বত পার হইয়া ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ঈশানের সঙ্গে আরও একটি মোহর আছে। তখন ঈশানকে ঐ মোহর লইয়া দেশে ফিরিয়া যাইবার আদেশ করিয়া হাতে করোয়া, ছেঁড়া কাঁথা লইয়া একাকী পথ চলিতে শুরু করিলেন। পথ চলিতে চলিতে সনাতন হাজিপুরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ভগিনীপতি শ্রীকান্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। শ্রীকান্ত বাদশাহের ঘোড়া কিনিবার জন্য তিন লক্ষ মুদ্রা লইয়া হাজীপুর আসিয়াছিলেন। এই হাজীপুরে কার্তিকী পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া একমাস ব্যাপী একটি মেলা হয়। ঐ সময় বহুসংখ্যক হাতী, ঘোড়া বিভিন্ন স্থান হইতে উক্ত স্থানে বিক্রীত হইবার জন্য আমদানী হয়। ভাল ঘোড়া কিনিবার পক্ষে সমগ্র ভারতে ইহাই উপযুক্ত স্থান ছিল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে কার্তিকী পূর্ণিমা হইতে পরবর্তী পূর্ণিমার মধ্যে কোন এক সময়ে সনাতন হাজীপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং সনাতন সম্ভবতঃ ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর-ডিসেম্বরের মধ্যে হাজীপুরে পৌঁছাইয়াছিলেন। হাজীপুর ঠিক পাটনার অপর পারে অবস্থিত। উহা সারণ জেলার অন্তর্ভুক্ত হরিহরক্ষেত্র বা শোণপুরের পাশের গ্রাম। কার্তিকী পূর্ণিমায় আরম্ভ হইয়া একমাস পর্যন্ত এখনও ঐ স্থানে মেলা হয় এবং হাতী, ঘোড়া বিক্রয় হয়।[১] শ্রীকান্ত ভগিনীপতিকে দুই-একদিন হাজীপুরে থাকিবার অনুরোধ করিলে সনাতন সম্মত হইলেন না। শ্রীকান্তের একান্ত অনুরোধে একটি মাত্র ভোটকম্বল লইয়া রাত্রে গঙ্গা পার হইয়া কাশী অভিমুখে চলিলেন। হাজীপুর হইতে যাত্রা করিয়া বেশ কিছুদিন পরে সনাতন কাশীতে উপস্থিত হইলেন। কাশীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে শ্রীচৈতন্যের সহিত সনাতনের সাক্ষাৎকার ঘটিল। শ্রীচৈতন্য ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে শরৎকালে নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তাহার পর মাঘ মাসে বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে প্রয়াগ হইয়া কাশীতে আসেন (চৈ. চ. ২।১৮।২১২)।

সুতরাং কাশীতে শ্রীচৈতন্যের সহিত সনাতনের সাক্ষাৎ মাঘ-ফাল্গুন অর্থাৎ ১৫১৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে হইয়াছিল। ডঃ সুশীলকুমার দে তৎসম্পাদিত

১ ষোড়শ শতকের পদাবলী সাহিত্য, পৃঃ ২৯১

পদ্যাবলীর ভূমিকায় লিখিয়াছেন কাশীতে রূপ, অনুপমের ও শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ হয়।[১] ডঃ দের এইরূপ সিদ্ধান্তের সমর্থক কোন ঘটনার উল্লেখ কোনও চৈতন্য-চরিতগ্রন্থে নাই। অনুমান, কবি কর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের একটি শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া তিনি উক্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কবি কর্ণপূরের গ্রন্থদ্বয়ে রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যের সহিত সনাতনের মিলনের কথা লিখিত নাই। নাটকে সর্বপ্রথম শ্রীচৈতন্যের সহিত সনাতনের কাশীতে সাক্ষাতের কথা বর্ণিত হইয়াছে।[২]

নাটকে লিখিত আছে যে, শ্রীচৈতন্য প্রয়াগে রূপকে কৃপা করিবার পর বারাণসীতে আগমন করেন ও সনাতনকে কৃপা করেন। কিন্তু বারাণসীর ঘটনা বলিবার সময় প্রতাপরুদ্রকে বার্তাহারী নিম্নোক্ত সংবাদ জ্ঞাপন করেন,—

কালেন বৃন্দাবন কেলিবার্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতে নাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ —৯।৪৮

অর্থাৎ কালক্রমে বৃন্দাবনে কেলিবার্তা লুপ্তবর্তী হইলে তাহা সেই বৃন্দাবনে বিশিষ্ট-রূপে প্রকাশের জন্য দেব রূপ ও সনাতনকে কৃপামৃতে অভিষিক্ত করিলেন।

এই শ্লোকের চতুর্থ চরণস্থ তত্রৈব শব্দের অর্থ কি? বর্ণনার ক্রম হইতে মনে হয় 'তত্রৈব' বলিতে বারাণসীতে বুঝাইতেছে। শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত চৈতন্য-চরিতামৃতে 'তত্রৈব শ্রীবৃন্দাবন এব' (২য় সং, পৃঃ ৪৪৭) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ তৎসম্পাদিত চৈতন্যচরিতামৃতে 'তত্রৈব' অর্থাৎ 'প্রয়াগে কাশীপুর্য্যাঞ্চ যদ্বা বৃন্দাবনে' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে শ্রীচৈতন্যের সহিত রূপ ও অনুপমের প্রয়াগে সাক্ষাৎ হয়। শ্রীচৈতন্য প্রয়াগে কিছুদিন কাটাইবার পর কাশী গমন করিতে চাহিলে রূপ তাঁহার সঙ্গী হইতে চাহেন। শ্রীচৈতন্য তাহাতে নিষেধ করিয়া রূপকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন (চৈ. চ. ২।১৯।১৯৫-২০১)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যখন কাশীতে রূপ, অনুপম ও শ্রীচৈতন্যের সহিত সনাতনের সাক্ষাতের কথা বলেন নাই, তখন কর্ণপূরের 'তত্রৈব' শব্দের 'প্রয়াগে কাশীপুর্য্যাঞ্চ যদ্বা বৃন্দাবনে' এবম্বিধ ব্যাখ্যা গ্রহণ না করাই সঙ্গত। কেবল বারাণসীতে নহে, প্রয়াগ, বৃন্দাবন এবং নীলাচল এই তিন স্থানেও রূপসনাতন দুই ভাই একত্রে শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হইয়াছেন এইরূপ বিবরণ কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

১ Padyavali, Introduction, p. xlvii
২ চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৯ম অঙ্ক, পৃঃ ৫৮৩, (বহরমপুর সং)

বৃন্দাবনে আগমন

কাশীতে সনাতন দুই মাস ছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে দুই মাস ভক্তিসিদ্ধান্ত বুঝাইয়া বৃন্দাবনে যাইতে আদেশ করিলেন। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মধ্যে শ্রীচৈতন্যের সহিত সনাতনের কাশীতে মিলন হইয়াছিল তাহা দেখাইবার চেষ্টা পূর্বে করিয়াছি। দুই মাস অবস্থানের পর বৃন্দাবন যাত্রা করিয়া থাকিলে ১৫১৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল-মে মাসে সনাতন কাশী ত্যাগ করেন। শ্রীচৈতন্যও উক্ত সময়ে কাশী ত্যাগ করিয়া নীলাচলের পথে যাত্রা করেন। সনাতন যখন বৃন্দাবনাভিমুখীন সেই সময়ে রূপও অনুপমের সহিত সনাতনের অনুসন্ধানে বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগ যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু দুই ভ্রাতা পৃথক পথে যাইবার জন্য পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারিলেন না।

মাস মাত্র রূপ গোসাঞি রহিলা বৃন্দাবনে।
শীঘ্র চলি আইলা সনাতনানুসন্ধানে॥
গঙ্গাতীরপথে প্রভু প্রয়াগেতে গেলা।
ইহা শুনি দুইভাই সেই পথে চলিলা॥
এথা সনাতন গোসাঞি প্রয়াগে আসিয়া।
মথুরা আইল সরান রাজপথ দিয়া॥
মথুরাতে সুবুদ্ধি রায় তাহারে মিলিলা॥
রূপ অনুপম কথা সকলি কহিলা॥
গঙ্গাপথে দুই ভাই, রাজপথে সনাতন।
অতএব তাঁহা সনে না হৈল মিলন॥—চৈ. চ. ২।২৫।১৬০-১৬৪

কেহ কেহ বলিয়াছেন, সনাতন মথুরাতে রূপের সহিত মিলিত হন।[১] কিন্তু চৈতন্য চরিতামৃতে বা অন্য কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে সেরূপ কোন বিবরণ দৃষ্ট হয় না।

সনাতন যখন বৃন্দাবনে উপস্থিত হন তখন রূপ ও অনুপম তাঁহার সন্ধানে প্রয়াগে চলিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং ঐ সময়ে সনাতনের সহিত রূপের বৃন্দাবনে মিলন হয় নাই মনে করিতে পারা যায়। রাধাবল্লভ দাস তাঁহার সনাতনসূচকে এই সম্পর্কে একটু ভিন্ন কথা বলিয়াছেন।

শ্রীগোঁসাই সনাতন প্রবেশিলা বৃন্দাবন
রূপ সনাতনে হৈলা মিলন।
শেষে কৃষ্ণনেত্র স্মরি সনাতনের পদ ধরি
কাঁদে রূপ গদগদ বচন॥ —পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড

১ তমোনাশ দাশগুপ্ত—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৪৭৭

বর্ণনার ক্রম দেখিয়া ইহা প্রথমবারের বৃন্দাবন গমনের কথা মনে হয়। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত হইতে দেখানো হইয়াছে প্রথমবারে বৃন্দাবন গমনকালে সনাতন রূপের সহিত তথায় মিলিত হন নাই। রাধাবল্লভ দাস শ্রীনিবাসের শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার মন্তব্যের যথেষ্ট প্রামাণিকতা রহিয়াছে। কিন্তু যেখানে চৈতন্য-চরিতামৃতের সঙ্গে বিরোধ দেখা দিবে সেখানে আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজকেই প্রামাণ্য মনে করিব। পাণিহাটি গ্রন্থমন্দিরে নরহরি দাসের একটি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে ছয় গোস্বামীর কয়েকজনের 'সূচক' পদ রহিয়াছে। পদগুলি এখনও অপ্রকাশিত। 'সনাতন গোস্বামী'র সূচকে নরহরি যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজকেই সমর্থন করিতেছে।

মথুরা প্রবেশি সুখে সুবুদ্ধি মিশ্রেরে দেখে
তেহ সনাতনেরে চিনিলা।
মিশ্র মহাহর্ষ মনে পুছে সব সনাতনে
শুনিয়া গোঁসাই নিবেদিলা॥
যত্নে পুন মিশ্র কহে রূপ অনুপম দোঁহে
এথা আসি গেলা প্রভুস্থানে।
তুমি রাজপথে আইলা তেঁহো গঙ্গাপথে গেলা
এহেত না দেখা তার সনে॥
এতেক কহি সনাতনে লইয়া আইলা নিজস্থানে
করাইলা স্নান সুভোজন।
তথা হৈতে সনাতন গেলেন শ্রীবৃন্দাবন
বনে বনে করিলা ভ্রমণ॥
যত লুপ্ত তীর্থ ছিল তাহা সব প্রকাশিল
সতত রহয়ে প্রেমরসে।
সদা একেশ্বর ফিরে তার কতদিন পরে
মিলন হইল রূপ সঙ্গে॥

—পাণিহাটি গ্রন্থমন্দির পুঁথি নং ২৩

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে বৃন্দাবনে রূপসনাতনের সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাতের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

সমুদ্রঘাট কালীহ্রদ নন্দালয়।
একে একে দেখি বৃন্দাবনে জলাশয়॥
হেনকালে দবিরখাস ভাই দুইজনে।
দেখিয়া চৈতন্য চিনিলেক ততক্ষণে॥ —তীর্থখণ্ড

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ না করায় ইহা গ্রহণ করা গেল না, কারণ কৃষ্ণদাস জয়ানন্দ অপেক্ষা এ বিষয়ে অনেক প্রামাণ্য। সনাতন যখন প্রথম বৃন্দাবন গমন করেন তখন গোপাল ভট্ট তাঁহাকে বরণ করেন এইরূপ একটি বিবরণ পদকল্পতরুধৃত নরহরি দাসের (চক্রবর্তীর) গোপাল ভট্ট সূচকে পাওয়া যায়।

শ্রীবেঙ্কট ত্রিমল্লেরে আশ্বাসিয়া বারে বারে
দক্ষিণ ভ্রমণে প্রভু গেলা।
হেথা কথোদিন পরে গৃহ সুখ পরিহরি
শ্রীগোপাল ভট্ট ব্রজে আইলা॥
প্রভু আসি পুরুষোত্তমে যবে গেলা বৃন্দাবনে
তাহা হৈতে আসিবার কালে।
পথে রূপ সনাতনে শিক্ষা দিয়া দুইজনে
তবে প্রভু গেলা নীলাচলে॥
রূপ আর সনাতন যবে আইলা বৃন্দাবন
ভট্ট গোঁসাই মিলিলা সভায়।
প্রভু প্রিয় লোকনাথ মিলিলা সভার সাথ
সভে মিলি গৌর গুণ গায়॥ —পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড

এই নরহরি দাস (চক্রবর্তী) ভক্তিরত্নাকরে লিখিয়াছেন,—

লিখিলেন পত্রীতে রূপ সনাতন।
গোপাল ভট্টের বৃন্দাবন আগমন॥ —ভ. র. ১।১৮০

কোনটি সত্য ঃ

পদকল্পতরুতে ধৃত পাঠের সহিত পাণিহাটি গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত ও অমুদ্রিত নরহরি দাসের গোপাল ভট্ট সূচকের অমিল দেখিতে পাই।

শ্রীবেঙ্কট ত্রিমল্লেরে আশ্বাসিয়া বারে বারে
দক্ষিণ ভ্রমণে প্রভু গেলা।
এথা কথোদিন পরে গৃহসুখ ত্যাগ করি
শ্রীগোপাল ভট্ট ব্রজে আইলা॥
গৌরপ্রিয় লোকনাথে সনাতন রূপ সাথে
মিলি প্রেমার্ণবে ভাসি যায়।
যে সুখ শ্রীবৃন্দাবনে তাহা কে বর্ণিতে জানে
অনুক্ষণ গোরাগুণ গায়॥
—পাণিহাটি গ্রন্থমন্দির পুঁথি নং ২৩

পুঁথির এই পাঠটিতে একটি পূর্বাপর সঙ্গতি বজায় রহিয়াছে। ইহাই নির্ভরযোগ্য

পাঠ হিসাবে গ্রহণ করিলে ভক্তিরত্নাকরের সহিত কোনও বিরোধ দেখা যায় না, উপরন্তু অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থে বর্ণিত বিবরণের সহিত সামঞ্জস্য থাকে।

শ্রীভট্ট গোসাঞি যবে বৃন্দাবনে গেলা।
শ্রীরূপ সনাতন সঙ্গেই রহিলা॥ —কর্ণানন্দ, ৫ম নির্যাস

সর্ব সমাধান করি উদাসীন হঞা।
বৃন্দাবন আইলেন প্রেমে মত্ত হঞা॥
আসিয়া পাইল রূপ সনাতন সঙ্গ।
দুই রঘুনাথসহ প্রেমার তরঙ্গ॥ —অনুরাগবল্লী, ১ম মঞ্জরী

এইকালে সনাতনের পত্রিকা আইলা।
গোপাল ভট্টের আগমন সকল লিখিলা॥ —প্রেমবিলাস, ১ম বিলাস

রূপ সনাতনের আগে গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে বাস করিয়া থাকিলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বোধ হয় ইহার উল্লেখ করিতেন। অবশ্য বৈষ্ণবসমাজের ঐতিহ্য এই যে গোপাল ভট্ট কৃষ্ণদাস কবিরাজকে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে মানা করিয়াছিলেন।

নীলাচলে আগমন

সনাতন ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে সম্ভবতঃ এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। রূপ ও অনুপম কিংবা গোপাল ভট্ট কেহই তখন সেখানে ছিলেন না দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসের মধ্যে রূপ প্রয়াগে যাত্রা করেন এবং গৌড় দেশ হইয়া নীলাচলে গমন করেন। নীলাচলে পৌঁছিয়া সেখানে রূপ দোলযাত্রা পর্যন্ত ছিলেন দেখা যায়।

দোল অনন্তরে প্রভু রূপে বিদায় করিলা।
অনেক প্রসাদ করি শক্তি সঞ্চারিলা॥
বৃন্দাবন যাহ তুমি রহিও বৃন্দাবনে।
একবার ইহা পাঠাইও সনাতনে॥ —চৈ. চ. ৩।১।১৬০-১৬১

ইহা হইতে রূপ যখন নীলাচলে সনাতন তখন বৃন্দাবনে ছিলেন জানা যাইতেছে। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে সনাতন কাশীতে উপস্থিত হন এবং সেখানে দুই মাস শ্রীচৈতন্যের নিকট ভক্তির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন। তাহা হইলে শ্রীচৈতন্য মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত কাশীতে ছিলেন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং ঐ বৎসরের দোলে (মার্চে অনুষ্ঠিত) শ্রীচৈতন্যের পক্ষে নীলাচলে থাকা সম্ভব নহে। ইহা হইতে রূপের দোলের সময়ে উপস্থিতি ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের মার্চে অনুষ্ঠিত দোল ভিন্ন অন্য দোলোৎসবকে বোঝায় না। আরও বলা যায় যে, রূপ

নীলাচলে দশমাস অতিবাহিত করেন ('প্রভু কহে ইহা রূপ ছিলা দশমাস'—চৈ. চ. ৩৷৪৷২৫)। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের দোলের কথা না বুঝাইলে রূপ কি করিয়া দশমাস নীলাচলে অবস্থান করিতে পারেন। সুতরাং ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের মার্চে রূপ যখন দোলযাত্রার পর গৌড়যাত্রা আরম্ভ করেন, তখন সনাতন মথুরা হইতে নীলাচলাভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন দেখা যায়।

নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা।
মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচলে আইলা ॥ —চৈ. চ. ৩৷৪৷২

ঝারিখণ্ডের পথে সনাতন নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়ীয়েরাও নীলাচলে আসিয়াছিলেন। সনাতন তাঁহাদের সহিত পরিচিত হইয়া কৃষ্ণভাবনায়, কৃষ্ণধ্যানে সুখে দীর্ঘকাল কাটাইলেন। শ্রীচৈতন্য সনাতনকে দোলযাত্রা পর্যন্ত আপনার কাছে রাখিয়া পশ্চাতে বিদায় দিলেন।

দোলযাত্রা দেখি প্রভু তাঁরে বিদায় দিলা।
বৃন্দাবনে যে করিবেন সব শিখাইলা ॥ — চৈ. চ. ৩৷৪৷১৭৮

সনাতন ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে রথযাত্রার পূর্বে নীলাচলে পৌঁছাইয়াছিলেন। দোলযাত্রার পর বিদায় লইয়া থাকিলে ১৫১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল নাগাদ নীলাচল ত্যাগ করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ নীলাচলে রূপের সহিত সনাতনের সাক্ষাতের কথা বলেন নাই। তাঁহার মতে সনাতন যখন নীলাচলে পৌঁছিলেন তখন—

প্রভু কহে ইহা রূপ ছিলা দশ মাস।
ইহা হৈতে গৌড়ে গেলা হৈলা দিন দশ ॥ —চৈ. চ. ৩৷৪৷২৫

ইহার পরেও যে রূপ সনাতন নীলাচলে আসিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ মিলে না। কবি কর্ণপুর তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে তিন ভ্রাতার সহিত শ্রীচৈতন্যের নীলাচলে সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়াছেন,—

সসনাতনানুপমরূপরূপিণঃ
স্বপদাব্জভক্তিরসসাগরত্রয়ান্
প্রদদর্শ বিস্ফুরিতভাববীচিভিঃ
জগদাপ্লুতং বিদধতঃ কৃপানিধি ॥ —১৭শ সর্গ

অর্থাৎ যাঁহারা বিস্ফুরিত ভাব-উর্মি দ্বারা জগতকে পরিপ্লুত করিতেছেন এবং পদকমলের ভক্তিরসের তিনটি সাগরতুল্য ও জগন্নাথদেবের অনুপমরূপে রূপী অর্থাৎ প্রভুরূপধারী সেই জনত্রয়কে অর্থাৎ সনাতন, অনুপম ও রূপ এই তিনকে কৃপানিধি গৌরচন্দ্র অবলোকন করিলেন।

চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায় যে, প্রয়াগে রূপ ও অনুপমের সহিত শ্রীচৈতন্যের মিলন ঘটে। রূপ ও অনুপম ইহার পর বৃন্দাবন হইয়া নীলাচলে

আসিবার উদ্যোগ করেন এবং গৌড় হইয়া নীলাচলে আসিবার জন্য যাত্রাও করেন। কিন্তু পথিমধ্যে গৌড়ে গঙ্গাতীরে অনুপমের তিরোধান হয়। ফলে রূপ একাকীই নীলাচলে আসেন। সুতরাং নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের সহিত রূপ ও অনুপমের একত্রে সাক্ষাৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজে বিশ্বাস করিলে সম্ভব হয় না।

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে রূপ, সনাতনের সহিত শ্রীচৈতন্যের নীলাচলে সাক্ষাতের কথা বলিয়াছেন। মুরারি গুপ্তের নাতিপ্রামাণিক চতুর্থ প্রক্রমের সপ্তদশ সর্গে নরেন্দ্রসরোবরে রূপ, সনাতনের সহিত শ্রীচৈতন্যের জলকেলির কথা বর্ণিত হইয়াছে। লোচনদাস শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব কালে নীলাচলে সনাতনের উপস্থিতির কথা বলিয়াছেন।

> কাশীমিশ্র সনাতন আর হরিদাস।
> উৎকলের সভে কান্দি ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥ —চৈতন্যমঙ্গল

এই সনাতন, সনাতন গোস্বামীকেই লক্ষ্য করিয়াছে কিনা বুঝা যায় না।

কতিপয় উড়িয়াগ্রন্থে রূপসনাতনের একত্রে নীলাচলে অবস্থানের উল্লেখ রহিয়াছে। চৈতন্যভাগবতকার ঈশ্বরদাস বলিতেছেন, শ্রীচৈতন্য নীলাচলে প্রত্যাবর্তনপূর্বক যখন ভক্তবৃন্দ সঙ্গে জগন্নাথমন্দিরে গিয়াছিলেন, তখন রূপসনাতনও সঙ্গে ছিলেন।

> বলরামদাস গোপাল।
> রামানন্দ যে সঙ্গ মেল ॥
> রূপ সনাতন যে দুই।
> সঙ্গেতে জগাই মাধাই ॥ —৪৭ অধ্যায়

'শূন্যসংহিতা' নামক গ্রন্থে কেবলমাত্র রূপসনাতন নহে, জীব এবং গোপাল ভট্টেরও নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের সহিত একত্র অবস্থানের কথা বলা হইয়াছে।

> নিশি অবশেষে বন্দাপনা হন্তি দেবাধি যে দেবরাজা।
> পরিছা বেত ধরিণ বেগে উভাকালে মহারাজা পূজা ॥
> দেউল শোধি গহল ভাজি গলা প্রতাপদেব রাজন।
> দক্ষিণ দুয়ারে জাঁই বিজেকলে কল্পবটমূলেন ॥
> বৈষ্ণবমণ্ডলী খোল করতালি বজাই বোলন্তি হরি।
> চৈতন্য ঠাকুর মধ্যে নৃত্য করি দণ্ড কমণ্ডলু ধারী ॥
> রূপ সনাতন আদি অভিরাম শ্রীজীব গোপালভট্ট।
> কীর্তন আবেশ হোই শ্রীনিবাস অচিনাম করি নাট ॥
> প্রতাপ রাজন আনন্দিত মন প্রভুঙ্ক দর্শন করি।
> বেঢ়া প্রদক্ষিণ রাজন করিণ বটমূলে বিজে করি ॥

দিবাকর দাসের জগন্নাথচরিতামৃতে অতি অদ্ভুত কথা বলা হইয়াছে। সেখানে

বলা হইতেছে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথদাসকে অতি বড় বলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা ক্ষুব্ধ হন এবং রূপসনাতনাদি সেই কারণে নীলাচল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান। এইভাবে 'এমন্তরে ষড় গোঁসাই মহিমা বিকাশিলা তঁহি'। পরে শ্রীচৈতন্য রূপ সনাতনকে ডাকিয়া আনিবার জন্য মথুরা দাসকে প্রেরণ করেন এবং রূপ, সনাতন পনরায় নীলাচলে আসেন। কেবল তাহাই নহে, ইহার পর হইতে প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময় তাঁহারা নীলাচলে আসিতেন।

মথুরা দাস চলি গেলে।
বৃন্দাবনে প্রবেশ হেলে॥
কহিলে প্রভু আজ্ঞা মান।
তা শুনিল রূপ সনাতন॥
কুড়িয়ে মূর্তি সঙ্গ কলে।
গুণ্ডিচা যাত্রাকু আইলে॥
দেখিলে চৈতন্য গোঁসাই।
রথ পেলন্তি মুণ্ড দেই॥
সেকেলে দণ্ডবত মান।
প্রভু হি কলে আলিঙ্গন॥
প্রেমেরে হোই জরজর।
না জানিলে আপনা পর॥
আদ্যেন প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীসনাতনটী আনন্দ॥
শ্রীরূপক যেঁউ গোঁসাই॥
শ্রীরঘুনাথ দাসের ঠাঁই॥
শ্রীজীবেক যেঁউ গোঁসাই।
শ্রীগোপাল দাসেন রহই॥
এসব বড় বৈষ্ণব।
অধিক কি তাহা লিখিব॥
জগন্নাথ করি দরশন।
করি বৃন্দাবন গমন॥
প্রতি বরষরে আসন্তি।
গুণ্ডিচা গহন খটন্তি॥
সারি গুণ্ডিচা দরশন।
পুন বৃন্দাবন গমন॥

রূপ, সনাতন, জীব ও গোপাল ভট্টের একত্রে নীলাচলে অবস্থান ও প্রতিবর্ষে নীলাচলে আগমনের বিবরণ অন্য কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। পূর্বেই বলিয়াছি, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীদের প্রত্যক্ষ সাহচর্যে ধন্য ছিলেন। তিনি তাঁহাদের সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহাই প্রথমে গ্রহণীয়। অন্য কোনমত তাঁহার প্রদত্ত বিবরণের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে গ্রহণযোগ্য নহে।

বৃন্দাবনে বসবাস

সনাতন ১৫১৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিলে নীলাচল ত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং ১৫১৮ খৃষ্টাব্দের জুন-জুলাই মাসের মধ্যে তিনি বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া থাকিবেন। বৃন্দাবনে আসিয়া সনাতন লুপ্ততীর্থ ও বিগ্রহ উদ্ধার এবং ভক্তিশাস্ত্রপ্রণয়ন কার্যে ব্রতী হইলেন। চৈতন্যচরিতামৃত হইতে তিনটি বিগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়।

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎ সর্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥ —১।১।১৫

অর্থাৎ আমি পঙ্গু এবং মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন, এইরূপ আমার একমাত্র গতি যাঁহারা, যাঁহাদের শ্রীচরণকমলই আমার সর্বস্ব, সেই দয়ালু শ্রীরাধামদনমোহন জয়যুক্ত হউন।

দিব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা শ্রীল গোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥
—১।১।১৬

অর্থাৎ পরমশোভাযুক্ত বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষতলে রত্নময়গৃহমধ্যে রত্নসিংহাসনে আসীন এবং প্রিয় সখিগণ কর্তৃক সেবিত রাধা এবং শ্রীগোবিন্দদেবকে স্মরণ করি।

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেনুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথ শ্রিয়েঽস্তুনঃ॥ —১।১।১৭

অর্থাৎ বংশীরবদ্বারা গোপীদিগকে যিনি আকর্ষণ করেন, বংশীবটতটে অবস্থিত এবং রাসরসপ্রবর্তক ও সর্বার্থপরিপূর্ণ সেই গোপীনাথ আমাদের কুশল বিধান করুন।

এই তিন বিগ্রহ ছাড়াও জীব ও গোপাল ভট্টের আরাধিত বিগ্রহ রাধাদামোদর ও রাধারমণের উল্লেখ আমরা পাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই দুই বিগ্রহের উল্লেখ কেন করিলেন না বোঝা গেল না।

রাধামদনমোহন বিগ্রহ আবিষ্কারের বেশ কিছুদিন পরে সম্ভবতঃ বামে রাধামূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে রাধামদনমোহন নাম হয় (ত্বৎসঙ্গত্যা যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।—গোবিন্দলীলামৃত ৮।৩২)। নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকরে প্রদত্ত কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম জানা এই রাধাবিগ্রহ পাঠাইয়াছিলেন (ভ. র. ৬ষ্ঠ তরঙ্গ)।

সনাতন বিগ্রহ আবিষ্কার করিবার পর ইহার পূজাভার কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীকে অর্পণ করেন ('শ্রীসনাতনগোস্বামিনা স্বস্যাবতীবান্তরঙ্গায় শ্রীকৃষ্ণদাসব্রহ্মচারিণে শ্রীমদন-গোপালদেবস্য সেবা সমর্পিতা'—সাধনদীপিকা)।

এখন প্রশ্ন যে এই বিগ্রহ কখন প্রকট হইয়াছিলেন? পুলিনবিহারী দাস 'বৃন্দাবন কথা' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—'পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বনমালী গোস্বামী মহাশয়ের নিকট সেবাপ্রাকট্য ও ইষ্টলাভের দিন নির্ণয়' নামক একখানি অতি প্রাচীনত্বসূচক পুঁথি আছে। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, সম্বৎ ১৫৯০ (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ) মাঘমাসে সনাতন গোস্বামী মহাবনের পরশুরাম চৌবের বাটি হইতে মদনগোপাল বিগ্রহ লইয়া আসেন। ইহার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৯২ সম্বতে (১৫৩৫ খৃষ্টাব্দ) মাঘমাসে শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে গোবিন্দদেবের অভিষেক হয়' (পৃঃ ৩২)। এই নির্ণীতকাল গ্রহণযোগ্য কিনা বিচার্য। বৃহদ্ভাগবতামৃতে সনাতন বহু স্থানে (১৭।১০৩, ২।১।২৭, ২।১।৯৪, ২।১।১০৫ ইত্যাদি, পুরীদাস সং) ইষ্টদেব মদনগোপালের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং বৃহদ্ভাগবতামৃত রচনার পূর্বে মদনগোপাল প্রকট হইয়াছিলেন স্বীকার করিতে হয়। বৃহদ্ভাগবতামৃতের তৃতীয় শ্লোকটি নিম্নরূপ লিখিত আছে,—

স্বদয়িতনিজভাবং যো বিভাব্য স্বভাবাৎ
সুমধুরমবতীর্ণো ভক্তরূপেন লোভাৎ।
জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা
হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ॥

এই গ্রন্থের টীকাকার স্বয়ং সনাতন। তিনি এই শ্লোকের টীকাকালে লিখিয়াছেন,—'এষ ইতি সাক্ষাদনুভূততাং তদানীং তস্য বর্তমানতাং চ বোধয়তি'। এই বাক্য হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটকালীন অবস্থায় বৃহদ্ভগবতামৃত যে রচিত হইয়াছিল তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। সুতরাং বৃহদ্ভাগবতামৃতে মদনগোপালের উল্লেখে ইহাই জানা যায় যে শ্রীচৈতন্যের প্রকটকালে এই বিগ্রহ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং উপরিউক্ত পুঁথির কাল গ্রহণ করা যায় না। গোবর্ধনদাস তাঁহার 'শ্রীশ্রীব্রজধাম ও গোস্বামিগণ' গ্রন্থে (পৃঃ ১৬৫-১৬৬) বলিয়াছেন, 'শ্রীল সনাতন ও কবিরাজ গোস্বামীর সময় শ্রীমদনগোপাল নামই ছিল। শ্রীসনাতনের বৈষ্ণবতোষণীর মঙ্গলাচরণে এবং চৈতন্যচরিতামৃতের উপসংহারে মদনগোপাল নামই আছে'।[১] তাঁহার উক্তি হইতে এই কথাই প্রতীয়মান হয়, কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত

[১] বস্তুতঃ এই মন্তব্য গোবর্ধনদাসের স্বীয়চিন্তাপ্রসূত নহে। তিনি সতীশচন্দ্র মিত্রের সপ্ত গোস্বামী গ্রন্থ (পৃঃ ১১৪, পাদটীকা) হইতে তাঁহার মন্তব্যটি নকল করিয়াছেন।

রচনার পরবর্তীকালে কোনও একসময়ে মদনমোহন নাম হয়। কিন্তু তিনি চৈতন্যচরিতামৃতের আদিতে মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি ও অন্ত্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদটি লক্ষ্য করিলে রাধামদনমোহন নামটি দেখিতে পাইতেন।

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মমমন্দমতের্গতী।
মৎসর্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥ —চৈ. চ. ১।১।১৫

শ্রীরাধাসহ মদনমোহন।
শ্রীরাধাসহ গোবিন্দ চরণ॥
শ্রীরাধাসহ গোপীনাথ।
এই তিন ঠাকুর—সব গৌড়িয়ার নাথ॥

—চৈ. চ. ৩।২০।১৩৩-১৩৪

গোবিন্দলীলামৃতে আছে, 'ত্বৎসঙ্গত্যা যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ' (৮।৩২)। গোবিন্দলীলামৃত চৈতন্যচরিতামৃতের পূর্ববর্তী রচনা। গোবিন্দলীলামৃত রচনার পূর্ব হইতেই রাধা বামে প্রতিষ্ঠিত থাকায় মদনমোহন নামে আখ্যাত হন, মনে হয়। চৈতন্যচরিতামৃত রচনাকালে এই বিগ্রহ মদনমোহন ও মদনগোপাল দুই নামেই পরিচিত ছিলেন দেখা যায়।

এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥
সেই লিখি মদনগোপাল যে লিখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়॥

—চৈ. চ. ১।৮।৭৩-৭৪

বৈষ্ণবতোষণীতে মদনগোপাল উল্লেখে মনে হয়, বিগ্রহটি ইহার পূর্বে মদনমোহন আখ্যা পায় নাই। নারায়ণ ভট্টের ব্রজভক্তিবিলাসে 'মদনগোপালদর্শন প্রার্থনা' নামক যে মন্ত্র রহিয়াছে তাহা হইতেও মনে হয় তখনও রাধা বামে প্রতিষ্ঠিত হন নাই।

যশোদানন্দনায়ৈব শ্রীমৎ গোপালমূর্তয়ে।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় নমস্তে কমলেক্ষণ॥
ইতি সপ্তদশাবৃত্ত্যা নমস্কারং সমাচরেৎ।
লোকবল্লভতামেতি চিরজীবি ভবেদ্ভুবি॥

—কৃষ্ণদাস বাবাজী সং, পৃঃ ২২৮

ব্রজভক্তিবিলাসের রচনাকাল ১৫৫২ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায় আর বৈষ্ণবতোষণীর রচনাকাল ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দ ছিল, তাহা পাইতেছি।

তিরোভাব

গোস্বামীদের আবির্ভাব সম্পর্কে যেরূপ কোন সঠিক কাল নির্ণয় করা সম্ভব নহে, তেমনি তিরোভাব কাল সম্পর্কেও সঠিক কিছু বলা চলে না।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে (পৃঃ ২১১) সনাতনের তিরোভাব কাল ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দ লিখিয়াছেন। এই মত তিনি তাঁহার ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত A History of Bengali Language and Literature গ্রন্থেও পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে The Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal গ্রন্থে (p. 39) তিনি ঐ মত পরিত্যাগ করিয়া ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে সনাতন তিরোহিত হন, এইরূপ বলিয়াছেন। জগদ্বন্ধু ভদ্র গৌরপদতরঙ্গিণীতে (পৃঃ ৪৮) এবং হরিলাল চট্টোপাধ্যায় বৈষ্ণব ইতিহাসে (পৃঃ ৬৩) লিখিয়াছেন যে, সনাতন ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে তিরোহিত হন। সতীশচন্দ্র মিত্র সপ্ত-গোস্বামীগ্রন্থে (পৃঃ ১৩৮) লিখিয়াছেন যে, ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে সনাতনের তিরোভাব হয়। অধুনাতনকালে ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা গ্রন্থে (৩য় সং, পৃঃ ২৫) ১৫৯০-৯২ খৃষ্টাব্দ সনাতনের তিরোধানকাল ধরিয়াছেন। ডঃ সুকুমার সেন ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে সনাতন তিরোহিত হন, এইরূপ লিখিয়াছেন (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, ৩য় সং, পৃঃ ২৮৬)। গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ গ্রন্থে (পৃঃ ১৬) ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে সনাতনের তিরোভাবের কথা লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়াও বহুমত নির্বিচারে প্রদত্ত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে উল্লেখ করা হইল না।

এখন উপরোক্ত মতগুলি হইতে সনাতনের সর্বনিম্ন তিরোভাবকাল দাঁড়ায় ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দ, সর্বোচ্চ দাঁড়ায় ১৫৯১-৯২ খৃষ্টাব্দ। পূর্বেই যুক্তি ও প্রমাণ সাহায্যে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে ১৪৬৫-৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কিংবা উহার কাছাকাছি সময়ে রূপসনাতন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে সনাতনের তিরোভাব হইলে তাঁহার জীবৎকাল প্রায় ১২০-১২৫ বৎসর হয়। ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। রূপ, সনাতন তাঁহাদের বৃন্দাবন বাসকালে দীর্ঘ সময় অমূল্য শাস্ত্রাদি প্রণয়নে অতিবাহিত করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা সর্বদা একটুও কালক্ষেপ না করিয়া অমূল্য গ্রন্থপ্রণয়নে নিজদিগকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ আটত্রিশবৎসর কাল একখানিও ভক্তিগ্রন্থ রচনা না করিয়া নিষ্ক্রিয় জীবনযাপন করিয়াছিলেন, ইহা মনে হয় না। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে রচিত বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী সনাতনের সর্বশেষ রচনা এবং বৈষ্ণবতোষণীতে উল্লিখিত উজ্জ্বলনীলমণি সম্ভবতঃ রূপের শেষ রচনা। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহারা আরও শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন অনুমান করা যায়।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন যে জীব সনাতনের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়া লঘুতোষণী লিখেন। সুতরাং তিনি লঘুতোষণী রচনার পরেও অর্থাৎ ১৫৮২ খৃষ্টাব্দের পরেও জীবিত ছিলেন।[১]

লীলাস্তবষ্টিপ্পনী চ সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী।
যা সংক্ষিপ্তা ময়া ক্ষুদ্র জীবেনাপি তদাজ্ঞয়া॥

এই শ্লোক হইতে মনে করা চলে না যে জীব সনাতনের সাক্ষাৎ আদেশ অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় আদেশ লইয়া লঘুতোষণী রচনা করিয়াছিলেন।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার জীবের মাধবমহোৎসব হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে সনাতনের তিরোভাব হয়, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।[২]

শ্লোকটি এই—

অঙ্ঘ্রিযুগ্মমিহ সার-সারস-স্পর্দ্ধিমূর্দ্ধনি দধাতু মামকে।
যঃ সনাতনতয়া স্ম বিন্দতে বৃন্দকারণমমন্দমন্দিরম্॥ —১ম উল্লাস

যিনি সনাতনস্বরূপে (নিত্যকালের জন্য) সুমহান (নিকুঞ্জ) মন্দিরমণ্ডিত বৃন্দাবন-লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কখনও অন্যত্র গমন করেন না, সেই কৃষ্ণ আমার এই মস্তকে তদীয় অত্যুৎকৃষ্ট কমলবিনিন্দী পাদপদ্ম দান করুন। (পক্ষান্তরে)—যিনি সনাতন নামে সুবিখ্যাত হইয়া শ্রীমান্ মহাপ্রভুর কৃপানির্দেশমত মহানিকুঞ্জমন্দিরভূষিত শ্রীবৃন্দাবনধামকে চিরবাস্তব্য রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই সনাতন গোস্বামীপাদ মদীয় শিরোদেশে তদীয় সুন্দর পদ্মবিজয়ী চরণযুগল অর্পণ করুন।

মাধবমহোৎসব ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে রচিত এবং বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে রচিত। উদ্ধৃত শ্লোকে সনাতনের বৃন্দাবনপ্রাপ্তি জানানো হইলে ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ও বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী রচনার পরে অর্থাৎ ১৫৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দে সনাতন তিরোহিত হইয়াছিলেন মনে করা যাইতে পারে।

সনাতন ও আকবর বাদশাহ

কয়েকটি গ্রন্থে রূপসনাতনের সহিত মোগলসম্রাট আকবর বাদশাহের সাক্ষাৎ হয়, এইরূপ একটি কথা লিখিত হইয়াছে।[৩] এই ধারণার মূলে গ্রাউসের মন্তব্যই কাজ করিয়াছে মনে হয়। গ্রাউস লিখিয়াছেন,—

১ *The Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal*, p. 39
২ ষোড়শ শতকের পদাবলী সাহিত্য, পৃঃ ১১৮
৩ বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী, পৃঃ ৯৭ ; গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্য, পরিশিষ্ট, পৃঃ ১০

৫

'On their arrival at Brindaban the first shrine which the Gossains erected was one in honour of the eponymous Goddess Brinda Devi. Of this no traces now remain, if (as some say) it stood in seva kunja which is now a large walled garden with a masonary tank near the Ras Mandal. Their fame spread so rapidly that in 1573 the Emperor Akabar was induced to pay them a visit and was taken blindfold into the sacred enclosure of the Vrindaban where such a marvellous vision was revealed to him, that he was fain to acknowledge the place as indeed holy ground' (*District Memoirs of Mathura,* 3rd., ed., p. 241).

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে গ্রাউস বৃন্দাবনে আকবরের আগমনের কথা বলিয়াছেন কিন্তু নির্দিষ্টভাবে রূপ সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল এমন কথা বলেন নাই। গ্রন্থটি আদ্যন্ত পাঠ করিলে দেখা যায় এমন কোন পূর্ব-প্রসঙ্গও নাই, যাহা হইতে ইহা রূপ, সনাতন সম্পর্কে বলা হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে।

আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী।[১] ঐ সময়ে তিনি চৌদ্দ বৎসরের বালক ছিলেন। তখন তাঁহার পক্ষে বিশৃঙ্খল রাজ্যে শৃঙ্খলাস্থাপনই একমাত্র করণীয় বস্তু ছিল। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি গুজরাট জয় এবং গুজরাটের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। সেই সময়ে বৃন্দাবনে তীর্থ-দর্শন ও সাধুসন্তের সহিত বিশ্রম্ভালাপে অবসরযাপন সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া, আকবরের সর্ব ধর্মমতের প্রতি উদারতা ও নবধর্মসৃষ্টির প্রেরণাকাল ৯৮৬ হিজরা বা ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দ। ঐ সময়ের পূর্বে তাঁহার পক্ষে হিন্দুদিগের তীর্থস্থানে আগমন ও তদ্‌মাহাত্ম্যে অভিভূত হওয়ার সংবাদ ভিত্তিহীন মনে হয়। গ্রাউস আরও বলিয়াছেন যে, ১০১৪ হিজরী সালে আকবর বৃন্দাবনে পশুপক্ষীবধ ও বৃক্ষলতাদির ছেদ নিবারণ জন্য সনাতন গোস্বামীকে একটি ফরমান লিখিয়া দেন।[২] আকবরের মৃত্যু ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে হয়।[৩] সুতরাং তিনি কিভাবে ১০১৪ হিজরী = ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে ফর্মান জারি করিতে পারেন। ইহাও ভিত্তিহীন কিংবদন্তী মাত্র। 'চৈতন্যপরিকর' গ্রন্থের প্রণেতা ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'নাভাজী বলেন যে আকবর পাৎশা সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করেন' (পৃঃ ৩৭০)।

১ Vincent Smith—*Akbar the Great Mogul,* 2nd. ed., p. 30
২ *District Memoirs of Mathura,* 3rd. ed., p. 220
৩ Vincent Smith—*Akbar the Great Mogul,* 2nd. ed., p. 323

এইরূপ কথা কি প্রমাণবলে তিনি বলিলেন তাহা বোঝা গেল না। নাভাজী কৃত ভক্তমালে এরূপ কোন কথা নাই। নাভাজী সনাতন গোস্বামী সম্পর্কে তাঁহার বিশিষ্ট গুণের উল্লেখ করিয়া একটি ছোট্ট ছপ্পয় লিখিয়াছেন মাত্র। এই ছপ্পয়ে এ জাতীয় কথার বিন্দুমাত্রও আভাস নাই।

সনাতন ও শঙ্করদেব

রামচরণ ঠাকুর কৃত অসমীয়া গ্রন্থ 'শঙ্করচরিত'-এ শঙ্করদেবের সহিত রূপসনাতনের বৃন্দাবনে সাক্ষাৎ হইয়াছিল এইরূপ একটি বিবরণ আছে।

আত অনন্তরে দেবতা শংকরে
সমস্তকে প্রবোধিলা।
বিদায়ক করি সবাকে সাদরি
বৃন্দাবন লাগি গেলা।
সবে পাণ্ডাগণে কান্দে দুখ মনে
যাত্রী সবে গৈলা ঘরে।
তীর্থক গমন মনে যবে গৈলা
শুন কথা অনন্তরে॥
পঞ্চ পঞ্চ যবে চলি গৈলা তবে
পাইলা রূপ সনাতন।
আসিলা শঙ্কর বুলিয়া সত্বর
চলি গৈল দুয়োজন।

কবি ভূষণদ্বিজ প্রণীত 'শঙ্করদেব' গ্রন্থে রূপ, সনাতনের সহিত শঙ্করদেবের সাক্ষাতের কথা নাই, তবে রূপ, সনাতনের খ্যাতি শঙ্করদেব শুনিয়াছিলেন এমন কথা আছে।

শঙ্করে বোলন্ত ইটো সন্ন্যাসী পণ্ডিত।
পুছিলন্ত শঙ্করে বলিয়া সঙ্গকৃত॥
দুইকো দুই আপনাম নাম কহিলন্ত।
সন্ন্যাসী বোলন্ত মোর শুনিয়ো বৃত্তান্ত॥
আছা রূপ সনাতন পরম ভকত।
বৈরাগ্য তেজিলা রাজ্যভোগ আছে যত॥
বৃন্দাবনে আনন্দে অছন্ত দুই ভাই।
হাতত মন্দিরা কৃষ্ণলীলা গুণ গাই॥

বস্তুতঃ রূপসনাতনের সহিত শঙ্করদেবের কোন পরিচয় তাঁহাদের গ্রন্থে কিংবা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না। বিদগ্ধমাধব নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধার বলিতেছেন,—'অদ্যাহং স্বপ্নান্তরে সমাদিষ্টোঽস্মি ভক্তাবতারেণ ভগবতা শ্রীশঙ্করদেবেন'। 'ভক্তাবতার শঙ্করদেব' ইত্যাদি বাক্য হইতে স্বাভাবিকভাবে মনে জাগিতে পারে যে আসামের শঙ্করদেবই বোধহয় উদ্দিষ্ট। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সেরূপ বুঝেন নাই। টীকার ব্যাখ্যাতে তিনি বলিতেছেন,—'শ্রীশঙ্করদেবেনেতি ব্রহ্মকুণ্ডতীরবর্তিনা গোপীশ্বরনাম্না।' বিদগ্ধমাধবে মাধুর্যরসের পরিস্ফুরণ করা হইয়াছে আর শঙ্করদেব জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সমর্থক, দাস্যভক্তির উপাসক—তাঁহার পক্ষে মাধুর্যরসপূর্ণ নাটক লিখিতে আদেশ করার কোনও রকম সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না।

সনাতন ও জাহ্নবা দেবী

'প্রেমবিলাস' গ্রন্থের ষোড়শ বিলাসে রূপসনাতনের সহিত জাহ্নবা দেবীর সাক্ষাৎ বর্ণিত হইয়াছে। প্রেমবিলাস এতবার প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে যে, উক্ত গ্রন্থের কোন বিবরণে সহসা বিশ্বাস করা যায় না। দ্বিতীয়বারের বৃন্দাবনগমন কথা বলার পরে কেহ কাহারও প্রথমবারের বৃন্দাবন গমনের বর্ণনা দেয় না। অথচ ঐ গ্রন্থের বর্তমান আকারে ঐরূপ বর্ণনাই দেওয়া হইয়াছে। নরোত্তমবিলাস (নবম বিলাস) ও ভক্তিরত্নাকর (দ্বাদশ তরঙ্গ) গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তী জীবের সহিত জাহ্নবা দেবীর সাক্ষাতের কিংবদন্তীর কথা বলিয়াছেন। প্রেমবিলাসে প্রথমে জীবের সহিত জাহ্নবা-দেবীর সাক্ষাতের বর্ণনার পর পরবর্তী বিলাসে রূপসনাতনের সহিত জাহ্নবার সাক্ষাতের কথা বলা হইয়াছে। প্রথমবার বৃন্দাবনগমনকালে জাহ্নবাদেবীর সহিত রূপসনাতনের সাক্ষাৎ হইয়া থাকিলে তাহার বর্ণনা আগে দেওয়াই সঙ্গত ছিল কিন্তু দ্বিতীয়বারের জাহ্নবাদেবীর বৃন্দাবনগমন বর্ণনা দেওয়ার পর প্রথমবারের বৃন্দাবন-গমনের কথা বলায় মনে হয় ঘটনাটি হঠাৎ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রেমবিলাস ছাড়া দুই একটি অপ্রামাণিক গ্রন্থেও এই মত দেখা যায়,—

> তারপর শুন সবে করি নিবেদন।
> জাহ্নবা কহেন শুন রূপ সনাতন॥
> আমারে দেখাও আগে গোবিন্দচরণ।
> তবেত করিব আমি পাক আয়োজন॥
>
> —মুরলীবিলাস, ১৬শ পরিচ্ছেদ

মুরলীবিলাস গ্রন্থ যে অর্বাচীন কালের রচনা তাহা ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁহার 'চৈতন্য চরিতের উপাদান' গ্রন্থে (২য় সং, পৃঃ ৪৬৮-৪৭৭) বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এইসব গ্রন্থের উক্তির কোনই মূল্য নাই। মুরলীবিলাসে

আছে যে গ্রন্থকারের গুরুদেব রামাই নাকি জাহ্নবার সঙ্গে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন ও প্রায় পাঁচ বৎসর বৃন্দাবনে থাকিয়া আসিয়া বাঘনাপাড়ায় মন্দির স্থাপন করেন। মন্দিরে খোদিত লিপি হইতে জানা যায় মন্দিরটি ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। তাহা হইলে রামাই ১৬১০ হইতে ১৬১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বৃন্দাবনে ছিলেন এবং সেই সময়ে জাহ্নবা সহযোগে গিয়া থাকিলে এবং রূপসনাতনের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়া থাকিলে রূপসনাতন ১৬১০ খৃঃ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন মনে করিতে হয়। কিন্তু ইহা অসম্ভব বলিয়াই ধারণা হয়।

সনাতনের রচিত গ্রন্থাবলী

সনাতনকৃত গ্রন্থরাজি সম্পর্কে জীবপ্রদত্ত তালিকাই সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য। লঘুতোষণীর উপসংহারে জীব বলিয়াছেন,—

অথাগ্রজকৃতেষ্বগ্র্যং শ্রীলভাগবতামৃতম্
হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকা দিক্‌প্রদর্শনী।
লীলাস্তবষ্টিপ্পনী চ সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী
যা সংক্ষিপ্তা ময়া ক্ষুদ্র জীবেনাপি তদাজ্ঞয়া ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজও ইহারই সমর্থন করিয়াছেন,—

হরিভক্তিবিলাস আর ভাগবতামৃত।
দশমটিপ্পনী আর দশমচরিত ॥
এইসব গ্রন্থ কৈলা গোসাঞি সনাতন।
রূপ গোসাঞি কৈল যত, কে করে গণন।

—চৈ. চ. ২।১।৩০-৩১

ভক্তিরত্নাকরে নরহরি চক্রবর্তীও বলিতেছেন,—

সনাতন গোস্বামীর গ্রন্থ চতুষ্টয়।
টীকাসহ ভাগবতামৃত খণ্ডদ্বয় ॥
হরিভক্তিবিলাস টীকা দিগ্‌দর্শনী।
বৈষ্ণবতোষণী নাম দশমটিপ্পনী ॥
লীলাস্তব দশম চরিত যাহে কয়।
সনাতন গোস্বামীর এই চতুষ্টয় ॥—ভ. র. ১।৮০৬-৮০৮

উপরিউক্ত তালিকাভুক্ত গ্রন্থগুলি সনাতন কৃত এ সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায়। কিন্তু এতদ্ব্যতীত বহু গ্রন্থ সনাতনের নামে আরোপিত হইয়াছে। সেইগুলির যথার্থ রচনাকার সনাতন গোস্বামী কিনা তাহা বিবেচ্য।

দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় 'রূপসনাতন' নামক গ্রন্থে (পৃঃ ৬৩) লিখিয়াছেন যে,

'সনাতন সিদ্ধান্তমালা রচনা করেন'। এই গ্রন্থের কোন পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র মিত্রের নিম্নলিখিত বাক্যের ঠিক অর্থ উদ্ধার করিতে না পারিয়া 'সিদ্ধান্তরত্নমালা' একটি গ্রন্থ হিসাবে ধরিয়াছেন। সতীশচন্দ্র মিত্র বলিয়াছেন, 'সনাতন গোস্বামী আধুনিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের ব্যাসদেব। তিনিই প্রথম সুপ্রাচীন বৈষ্ণবশাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া এই মতের পরিপোষক সিদ্ধান্তরত্নমালা সংগ্রহ করেন' (সপ্ত গোস্বামী, পৃঃ ১১৭)। অফ্রেত তাঁহার Catalogus Catalogorum গ্রন্থে (Vol. I, p. 693) সনাতনের নামে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আরোপ করিয়াছেন। গ্রন্থগুলি এই—উজ্জ্বলরসকণা, উজ্জ্বল-নীলমণি টীকা, ভক্তিবিন্দু, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ভক্তিসন্দর্ভ, ভাগবতক্রমসন্দর্ভ, ভাগবতামৃত, বৈষ্ণবতোষণী, স্তবমালা ও হরিভক্তিবিলাস। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁহার Indian Philosophy গ্রন্থে (Vol. II, p. 394) কোনরূপ বিচার না করিয়া অবিকল এইগুলি সনাতনের নামে উদ্ধৃত করিয়াছেন। অফ্রেতের তালিকা বহু ভুলের আধার। অবশ্য একক প্রচেষ্টায় এই ধরনের বৃহৎকর্মে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনাই বেশী। যাহাই হউক, স্তবমালা এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধু যে রূপের এবং উজ্জ্বল-নীলমণি টীকা, ভক্তিসন্দর্ভ, ভাগবতক্রমসন্দর্ভ যে জীবের লেখা ইহা সুপ্রমাণিত ও সর্বজনবিদিত। উজ্জ্বলরসকণা ও ভক্তিবিন্দুদ্বয়ের পরিচয় Catalogue of Mss. in Oudh গ্রন্থে (Vol. V, No-263 ; Vol. XXI, No-152) পাওয়া যায়। কিন্তু এখন কোন পুঁথিও নাই, বিবরণও নাই। সম্ভবত এই দুইটি রূপের গ্রন্থ-দ্বয়েরই সংক্ষেপ এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু ও উজ্জ্বলনীলমণি-কিরণের মতই মনে হয়। সনাতনের লেখা বলিয়া যোগশতব্যাখ্যানের নাম রায়মুকুট করিয়াছেন। কিন্তু এই রায়মুকুট অমরকোষের পাদচন্দ্রিকা টীকাকার, সনাতনের পূর্ববর্তী লেখক। সুতরাং এই যোগশতব্যাখ্যান সনাতন গোস্বামীর লেখা হইতে পারে না। নগেন্দ্রনাথ বসু মন্তব্য করিয়াছেন যে, রূপ ও সনাতন একত্র ভক্তিরসামৃতসিন্ধু রচনা করেন (বিশ্বকোষ, ১৬শ খণ্ড, পৃঃ ৬৯১)। কিন্তু ইহা সত্য মনে হয় না। রূপ সনাতন সহযোগে এই গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিলে সে সম্পর্কে নিশ্চয় উল্লেখ করিতেন। মাদ্রাজের Govt. Oriental Manuscript Library-র পুঁথির তালিকায় সনাতনকৃত একটি গদাধর অষ্টকের উল্লেখ রহিয়াছে (A Triennial Catalogue of Mss. Vol. IV, Part I, Sanskrit A. R. No-3053)। এই অষ্টকটি 'গৌরাঙ্গসেবক' পত্রিকা (১৩২৬, ফাল্গুন সংখ্যা) ও গৌড়ীয় পত্রিকায় (১৩৪৯, আষাঢ় সংখ্যা) মুদ্রিত হইয়াছে। অষ্টকটির আরম্ভ ও অন্ত্য নিম্নরূপ,—

আরম্ভ ঃ অখিল ভুবন বন্দ্যং প্রস্ফুরৎ প্রেমসারং।
প্রবল করুণয়াঢ্যং প্রেমভক্তিস্বতন্ত্রং ॥

ব্রজবিপিনবিরাজচ্ছ্রীলবৃন্দাবনেন্দ্রং।
মধুরমধুররূপং নৌমি রাধাস্বরূপম্ ॥

অন্ত্য ঃ রাধাস্বরূপস্য গদাধরস্য।
স্তোত্রং মুদাকারি সনাতনেন ॥
প্রেম্না পঠন্ নিত্যবিলাসশালিনঃ।
প্রাপ্নোতি নাভীষ্টপদং হি হিতস্য ॥

ইতি শ্রীসনাতন গোস্বামী বিনির্মিতং শ্রীযুত গদাধর পণ্ডিত গোস্বাম্যষ্টকং সমাপ্তম্। অষ্টক নাম করিয়া ইহাতে এগারটি শ্লোক আছে। রচনারীতি অত্যন্ত দুর্বল। ইহা সনাতন গোস্বামীর লেখা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

India Office Catalogue গ্রন্থে (Vol. VII pp. 422-23) কালিদাসের মেঘদূতের উপর তাৎপর্যদীপিকা নামে একটি টীকার দুইটি পুঁথির পরিচয় পাওয়া যায়। টীকাকারের নাম সনাতন আছে।

উপনীতং নবনীতং করতলমণ্ডিতো ব্রজগৃহিণীভিরদন্
মাধুকরবৃত্তির্যতিরিব করপত্রী নন্দজো জয়তি।
প্রাচ্যাং ব্যাখ্যাঃ সমালোচ্য শ্রীসনাতন শর্মণা
তন্যতে মেঘদূতস্য টীকা তাৎপর্যদীপিকা ॥

এই টীকাতে কোনও শ্রীচৈতন্যনমস্ক্রিয়াদি নাই। ইহা সনাতন গোস্বামীর লেখা কিনা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। ইহা তাঁহার রচনা হইলেও হইতে পারে।

উপরোক্ত Triennial Catalogue গ্রন্থে (Vol. IV, Part I, Sanskrit A. R. 3053-a 47) গোপালপূজা নামক একটি গ্রন্থ সনাতন গোস্বামীর নামাঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। আরম্ভ ও অন্ত্য নিম্নরূপ,—

আরম্ভ ঃ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে গচ্ছন্তু শিবাজ্ঞয়া ॥

অন্ত্য ঃ অথ নৈবেদ্যম্—বিকচোৎপলসন্নিভাং গ্রাসমুদ্রাং প্রদর্শ্য মূলমন্ত্রমুচ্চার্য্য শ্রীকৃষ্ণায় নৈবেদ্যং স্বাহা, শ্রীকৃষ্ণায় আচমনম্, মূলমন্ত্রমষ্টোত্তরং শতং জপেৎ, পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ প্রদক্ষিণম্।

ইতি শ্রীসনাতন গোস্বামী বিরচিতা গোপালপূজা সমাপ্তা।

এই ধরনের শিথিল রচনারীতি সনাতনের বলিয়া মনে করা যায় না।

জীবগোস্বামী রচিত হরিনামামৃত ব্যাকরণ সূত্রাকারে সনাতন প্রথমে লেখেন এইরূপ একটি মত পাওয়া যায়।[১]

১ হরিনামামৃত ব্যাকরণ ভূমিকা—রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং, পৃঃ ২

এই মতের মূলে হরিনামামৃত ব্যাকরণের টীকাকার হরেকৃষ্ণ আচার্যের উক্তি কাজ করিয়াছে মনে হয়। তিনি বলিয়াছেন,—'বৈষ্ণবানাং হিতাভিলাষপরবশতয়া শ্রীনামগ্রহণপূর্বক বিশিষ্টব্যুৎপত্তিবাঞ্ছয়া শ্রীকৃষ্ণদেবপ্রসাদমধিগম্য শ্রীমচ্ছ্রীল সনাতন গোস্বামিনাং সূত্রানুসারেণ শ্রীজীবগোস্বামি নামা গ্রন্থকারঃ পরমমঙ্গলমনোহরমধুর-হরিনামাবলিভিঃ সঙ্কেতীকুর্ব্বন্—ইত্যাদি। ঊনবিংশ শতাব্দীর হরেকৃষ্ণ আচার্যের এই মন্তব্যের সমর্থক উক্তি পূর্ববর্তী কোনও লেখকের রচনায় পাওয়া যায় না।

হরিনামামৃতের একটি সংক্ষিপ্তরূপ রূপের নামাঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায় (বরাহনগর গ্রন্থমন্দির পুঁথি নং, ব্যাকরণ ৩৭)। জীবের হরিনামামৃত ব্যাকরণের পরিশিষ্টে ইহা পুরীদাস কর্তৃক ১৩৫৪ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। রূপ ইহা লিখিবার পর জীব তাহা বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছেন বলা যাইতে পারে কিন্তু ঐরূপ ঘটিলে জীব উহার উল্লেখ করিতেন।

রূপ সংকলিত পদ্যাবলীতে সনাতনকৃত একটি শ্লোকের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইহা অন্য কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। শ্লোকটি এই,—

সত্যং শৃণোমি সখি নিত্যনবপ্রিয়োঽসৌ
গোপস্তথাপি হৃদয়ং মদনো দুনোতি।
যুক্ত্যা কথঞ্চন সমং গমিতেঽপি তস্মিন্
মাং তস্য কালমুরলী কবলী করোতি॥

পুলিনবিহারী দাস 'বৃন্দাবনকথা' গ্রন্থে (পৃঃ ৬৮) 'সিদ্ধান্তসার' নামে একটি গ্রন্থ সনাতনকৃত বলিয়াছেন। কিন্তু ঐরূপ কোন গ্রন্থের পরিচয় অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই।

বৃহদ্ভাগবতামৃত—জীবপ্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, সনাতন ইহার রচয়িতা। ইহার টীকাটি যে গ্রন্থকারের লিখিত তাহা প্রারম্ভ শ্লোকে বলা হইয়াছে।

নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় স্বনামামৃতসেবিনে
যদ্রূপাশ্রয়ণাদ্‌যস্য ভেজে ভক্তিময়ং জনঃ।
অভিপ্রেতার্থবর্গাণামেকদেশস্য দর্শনাৎ
দিগ্‌দর্শিনীতি নাম্নীয়ং স্বয়ং টীকাপি লিখ্যতে॥

টীকার নাম যে দিগ্‌দর্শিনী ছিল তাহা জানা যাইতেছে।

গ্রন্থটির অন্ত্যে কোন রচনাকাল দেওয়া নাই। তবে শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালেই যে গ্রন্থটি রচিত হইয়াছিল তাহার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ রহিয়াছে। উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় শ্লোক এইরূপ,—

স্বদয়িতনিজভাবং যো বিভাব্য স্বভাবাৎ।
সুমধুরমবতীর্ণো ভক্তরূপেণ লোভাৎ।

জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা
হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ ॥

ইহার টীকায় সনাতন বলিয়াছেন, 'এষ ইতি সাক্ষাদনুভূততাং তদানীং তস্য বর্তমানতাং চ বোধয়তি'। ইহা হইতে টীকাসহ গ্রন্থটি শ্রীচৈতন্যের অপ্রকট হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হইয়াছিল সুস্পষ্ট জানা যাইতেছে।

বৃহভাগবতামৃত একাধারে সনাতন গোস্বামীর আধ্যাত্মিক আত্মচরিত, মনোরম উপাখ্যান এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বব্যাখ্যা। ইহাতে অসমান দুইটি খণ্ড আছে। প্রথম খণ্ডের সাতটি অধ্যায়ে ৭৬৪টি শ্লোকে ভগবানের সবচেয়ে কৃপাপাত্র কে তাহা দেখানো হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের সাতটি অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা ১৭১২ এবং উহার বিষয়বস্তু হইতেছে ভক্তির বিভিন্ন সোপান বর্ণনা (শ্লোক সংখ্যা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সংস্করণ অনুসারে দেওয়া হইল, সাউরী প্রপন্নাশ্রম সংস্করণ অনুসারে ঐ শ্লোকের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৯৮ এবং ১৭১৬)। প্রথম খণ্ডের নায়ক হইতেছেন নারদ। তিনি মাঘমাসে প্রয়াগতীর্থে এক ব্রাহ্মণকে ভগবানের পরমপ্রিয় মনে করেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের এক ক্ষত্রিয় রাজাকে শ্রেষ্ঠ কৃপাপাত্ররূপে নির্দেশ করেন। নারদ ঐ রাজার নিকট যাইলে তিনি ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা আবার শিবকে, শিব প্রহ্লাদকে, প্রহ্লাদ পাণ্ডবদিগকে, পাণ্ডবেরা যাদবদিগকে বিশেষ করিয়া উদ্ধবকে, উদ্ধব গোপীদিগকে ও তন্মধ্যে শ্রীরাধাকে ভগবানের প্রিয়তম বলিয়া ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয় খণ্ডের নায়ক হইতেছেন গোবর্ধনবাসী এক গোপকুমার যাঁহার গুরু হইতেছেন গৌড়দেশে গঙ্গাতটে জাত জয়ন্ত নামক ব্রাহ্মণ। জয়ন্তের প্রেমোন্মত্ততা যে ভাবে সনাতন বর্ণনা করিছেন তাহাতে সন্দেহ থাকেনা যে তিনি শ্রীচৈতন্যেরই নামান্তর। সেইজন্য বলিতে হয় যে সনাতন স্বয়ং হইতেছেন ঐ গোপকুমার। তিনি গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিতে করিতে ক্রমান্বয়ে প্রয়াগে, পুরীতে, বৃন্দাবনে, গঙ্গাতীরে স্বর্গলোকে, তপোলোকে, সত্যলোকে, জনলোকে গমন করিয়া কখনও রাজা হন, কখনও ইন্দ্রত্ব পান এবং শেষে ব্রহ্মার পদ লাভ করেন। কিন্তু কোন ঐশ্বর্য ও প্রভুত্বই তাঁহার ভজনাকাঙ্খাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। তাই তিনি এক লোক হইতে অন্য লোকে যাইয়াও তাঁহার উপাস্যদেব শ্রীকৃষ্ণের চরণে ভজনের প্রার্থনা জানান। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে কৃপা করিয়া বিভিন্ন প্রকারের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া চরম চরিতার্থতার অভিমুখে লইয়া যান। ব্রহ্মত্ব ত্যাগ করিয়া গোপকুমার মথুরায় যাইলেন। তারপর ক্রমান্বয়ে শিবলোক, বৈকুণ্ঠ, অযোধ্যা হইয়া দ্বারকায় আসিলেন। দ্বারকা বৈকুণ্ঠের সমপর্যায়ভুক্ত কিন্তু ব্রজভূমি হইতেছে গোলোক। গোপকুমার গোলোকে যাইয়া মদনগোপালের দর্শন লাভ করিলেন। পরে তাঁহার

নিত্যলীলায় প্রবেশ লাভ ঘটিল। চিত্তাকর্ষক আখ্যায়িকার ভিতর দিয়া সনাতন গোস্বামী দেখাইয়াছেন যে কিভাবে মহৎজনের কৃপা ও ভক্তসেবা হইতে দীক্ষালাভ হয় এবং মন্ত্রজপ, সৎসঙ্গ, শ্রীমূর্তি দর্শন ও সেবা, শাস্ত্রশ্রবণ ও স্বরূপের অনুভূতি হইতে সকল বন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তারপর ভক্তিলাভ হইলে প্রথমে গৌরবমিশ্রা প্রীতি, পরে ভগবানের প্রতি সখ্যভাব এবং অবশেষে বিশুদ্ধ মাধুর্যভাবের উপলব্ধি হয়। গ্রন্থখানির মধ্যে প্রচুর সিদ্ধান্তের অবতারণা করা হইলেও ইহা পাঠ করিবার সময় পাঠকের আগ্রহ ও কৌতূহল কোথাও নিবৃত্ত হয় না। সনাতন গোস্বামী পুরাণের আকারে ইহাকে সাজাইয়াছেন। ইহার বক্তা পরীক্ষিৎ ও শ্রোত্রী তাঁহার মাতা উত্তরাদেবী। শ্রীমদ্ভাগবতরূপ সমুদ্রমন্থন করিয়া সারসিদ্ধান্তরূপ অমৃত উত্তোলিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম ভাগবতামৃত। রূপ গোস্বামীর রচিত অবতার ও ভক্তগণের তারতম্য বর্ণনামূলক গ্রন্থ লঘু ভাগবতামৃত ও সনাতনের গ্রন্থ বৃহৎ ভাগবতামৃত নামে পরিচিত। কিন্তু সনাতন নিজে বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীতে সর্বত্র এই গ্রন্থকে শুধু ভাগবতামৃত নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

হরিভক্তিবিলাস—এই গ্রন্থটির গ্রন্থকর্তা কে তাহা লইয়া বিদ্বজ্জনের মধ্যে বহু অলোচনা হইয়াছে কিন্তু কেহই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কৃষ্ণদাস এবং জীব ইহা সনাতনকৃত বলিয়াছেন। কিন্তু যে গ্রন্থ অধুনা প্রচলিত আছে তাহার প্রারম্ভ শ্লোকে ইহা গোপাল ভট্ট কৃতই বলা হইয়াছে। এই শ্লোকটি যে প্রক্ষিপ্ত তাহা বলা চলে না। সকল পুঁথিতেই এই নিম্নোক্ত শ্লোকটি রহিয়াছে।

ভক্তেবিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধা-
নন্দস্যশিষ্যো ভগবৎ প্রিয়স্য।
গোপাল ভট্টো রঘুনাথদাসং
সন্তোষয়ন্ রূপ সনাতনৌ চ॥

নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকরে বলিয়াছেন,—

করিতে বৈষ্ণবস্মৃতি হৈল ভট্টমনে।
সনাতন গোস্বামী জানিলা সেইক্ষণে॥
গোপালের নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন।
করিলা শ্রীহরিভক্তিবিলাস বর্ণন॥ —ভ. র. ১।১৯৭-১৯৮

সনাতনকৃত গ্রন্থকে নিজের নামে গোপাল ভট্ট চালাইয়া দিলেন ইহা বিশ্বাস করা যায় না। গোপালের নাম দিয়া সনাতন গ্রন্থ লিখিলে গোপাল ভট্ট রূপসনাতনের সন্তোষের জন্য গ্রন্থ লিখিতেছি ইহা বা কি করিয়া লেখেন। সত্যবাদী ধর্মনিষ্ঠ বৈষ্ণবেরা এইরূপ একটি অসত্য প্রচার করিয়াছেন মনে করা যায় না।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন সনাতনের নাম হরিভক্তি-

বিলাসের সহিত জড়িত করা হয় নাই কারণ তিনি যবন সংসর্গে জাতিচ্যুত ছিলেন। বৈষ্ণবদের আচারগ্রন্থ জাতিভ্রষ্ট সনাতনের নামে প্রচারিত হইলে তাহা কেহ গ্রহণ করিতে না পারে এই আশঙ্কায় গোপাল ভট্টের নাম সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে।[১] রূপসনাতন যে জাতিচ্যুত ছিলেন না তাহা পূর্বে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি সুতরাং ইহার কোন যৌক্তিকতা নাই বলিয়া মনে করি।

অনুরাগবল্লী রচয়িতা মনোহর দাস যাহা বলিয়াছেন তাহাই এই সমস্যার সমাধান হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন,—

শ্রীসনাতন গোসাঞি গ্রন্থ করিল।
সর্বত্র আভোগ ভট্ট গোসাঞি দিল॥
শ্রীরূপসনাতন রঘুনাথ দাস।
ইহা সভায় সুখ দিতে হরিভক্তিরবিলাস॥
সংগ্রহ করিল শ্রীভাগবত প্রধান।
সর্বপুরাণের বাক্য করিয়া সন্ধান॥ —১ম মঞ্জরী

মনে হয়, সনাতন প্রথমে একটি সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণবস্মৃতি রচনা করেন। পরে গোপাল ভট্ট ইহার পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেন। প্রতি বিলাসের শেষে 'ইতি শ্রীগোপাল ভট্ট বিলিখিতে' লেখা হইতে ইহা দ্যোতিতও হয়। বিলিখিত অর্থাৎ বিশেষরূপে লিখিত বা পরিমার্জিত অর্থ সূচিত করে। গোপালভট্ট 'লিখিত' শব্দটির প্রয়োগ করিতে পারিতেন কিন্তু এই কারণে করেন নাই মনে হয়। এই অনুমানের সমর্থনে বলা যাইতে পারে যে বৃন্দাবনের ভক্তিবিদ্যালয়ে, জয়পুরে গোবিন্দ গ্রন্থাগারে এবং রাজসাহী বরেন্দ্রানুসন্ধান সমিতিতে সনাতনকৃত লঘুহরিভক্তি-বিলাসের একটি পুঁথির পরিচয় পাওয়া যায়। বৃন্দাবনে ভক্তিবিদ্যালয়ে পুঁথিটি দেখিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু সফল হইতে পারি নাই। যেদিন উক্ত বিদ্যালয়ে পুঁথিটি দেখিবার জন্য যাই সেদিনের কিছুকাল পূর্বে গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য স্থানীয় কোন পণ্ডিত লইয়া গিয়াছেন এইরূপ সংবাদ গ্রন্থাগারিক দেন। উক্ত পণ্ডিতের অনুসন্ধানে গেলে তিনি অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার জন্য তাঁহারও সাক্ষাৎ পাই নাই।

কাহারও কাহারও মতে গ্রন্থের নাম আগে ভগবদ্‌বিলাস ছিল, পরে ছন্দানুরোধে হরিভক্তিবিলাস করা হয়।[২] এই মতের কোনই যৌক্তিকতা নাই। সনাতন বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণীর ২২।৯৯ ও ২৯।২৪ অধ্যায়ে হরিভক্তিবিলাস, ২০।৩৪, ৩৯।৪০

১ *The Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal*, pp. 37-38; *Chaitanya and his Age*, p. 290; *Chaitanya Movement*, p. 137
২ বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ, ১৩৩০, আশ্বিন ও কার্তিক, পৃঃ ৩৯

অধ্যায়ে ভগবদ্‌ভক্তিবিলাস এবং ১।৪, ৫।১৬৩, ও ৮৬।৫৩ অধ্যায়ে ভগবদ্‌ভক্তি-বিলাস টীকা এবং বৃহদ্ভাগবতামৃতের ১।১০।২৬র টীকায় হরিভক্তিবিলাস টীকা লিখিয়াছেন। ছন্দানুরোধে হরিভক্তিবিলাস নামকরণ করা হইয়া থাকিলে ছন্দাদিহীন গদ্যে লিখিত গ্রন্থে সনাতন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দুইটি নাম ব্যবহার করিলেন কেন? সুতরাং মনে করা যায় একই কালে দুই নামেই গ্রন্থটি প্রচলিত ছিল।

হরিভক্তিবিলাসের রচয়িতা সম্পর্কে যেরূপ সংশয় বর্তমান, তেমনি ইহার টীকাকার কে তাহা লইয়াও মতদ্বৈধতা আছে। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ১২৮৯ সালে প্রথম হরিভক্তিবিলাস প্রকাশ করেন। তিনি টীকাটিকে জীবকৃত বলিয়াছেন। আবার কাহারও মতে টীকাটি গোপালভট্ট গোস্বামীর শিষ্য গোপীনাথ গোস্বামীর দ্বারা লিখিত।[১] এইরূপ বলিবার কারণস্বরূপ প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন, 'দিগ্‌দর্শিনী টীকা যদি সনাতন গোস্বামীকৃত হইত, তবে শ্রীরূপ গোস্বামীকে মহানুভব কখনও লিখিতেন না। গোপীনাথ দাস গোপাল ভট্টের শিষ্য, শ্রীরূপ গোস্বামীতে তাঁহার গৌরব বিশিষ্ট প্রীতি। তিনি লিখিলেন 'শ্রীমন্মহানুভবৈঃ'।

বৃহদ্ভাগবতামৃতের তৃতীয় শ্লোকের টীকায় সনাতন রূপকে 'বৈষ্ণববর' এবং বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণীতে 'মহানুভব' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, 'এতচ্চ শ্রীমন্মহানু-ভাবানাংললিতমাধবনাটকাদৌ ব্যক্তমেব' (৩৩।১৯), 'রসামৃতার্ণবে চ মহানুভাবৈঃ তত্তদ্বিশেষাভিব্যঞ্জনেন বিস্তারিতমস্তি' (২৯।১৫, পুরীদাস সং)। সুতরাং এই যুক্তির একেবারেই কোন মূল্য নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকাটির রচয়িতা সনাতন গোস্বামীই হইবেন। প্রথমতঃ, জীব লঘুতোষণীর অন্ত্যে হরিভক্তিবিলাস ও তট্টীকা দিক্‌প্রদর্শিনীকে সনাতনকৃত বলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, হরিভক্তিবিলাসে 'রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপ সনাতনৌ চ' ইত্যাদির টীকায় রঘুনাথদাসের পরিচয়দান প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে, 'শ্রীরঘুনাথ দাসো নাম গৌড়কায়স্থকুলভাস্করঃ পরমভাগবতঃ শ্রীমথুরাশ্রিতস্তদাদীন্ নিজসঙ্গিনঃ সন্তোষয়িতুমিত্যর্থঃ', কিন্তু রূপসনাতন সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই। সনাতন স্বয়ং টীকাকার বলিয়াই স্বপ্রসঙ্গে কিছু বলেন নাই মনে করা যায়। গোপীনাথদাস কিংবা অন্য কেহ টীকাকার হইলে রঘুনাথদাস সম্পর্কে এইরূপ বিস্তৃত মন্তব্য করিবার পর রূপসনাতন সম্পর্কে নীরব রহিতেন না। আলোচ্য মুদ্রিত টীকা প্রারম্ভে লিখিত আছে,—

> লিখ্যতে ভগবদ্‌ভক্তিবিলাসস্য যথামতি।
> টীকা দিগ্‌দর্শিনী নাম তদেকাংশার্থবোধিনী॥

১ বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ, ১৩৩০, আশ্বিন ও কার্তিক, পৃঃ ৩৯; পৌষ পৃঃ ২১০

দিক্‌প্রদর্শিনী ও দিগ্‌দর্শিনীর মধ্যে অর্থের কোন ভিন্নতা নাই। ছন্দানুরোধেই বোধ হয় জীব দিগ্‌দর্শিনীকে দিক্‌প্রদর্শিনী লিখিয়া থাকিবেন।

হরিভক্তিবিলাস ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উদ্ধৃত হইয়াছে (পূ. বি. ২।৭০)। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর রচনাকাল ১৫৪১ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং ইহা যে ১৫৪১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হইয়াছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই।

মহামতি কানে ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইহার রচনাকাল ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছেন।[১] কিন্তু এ সম্পর্কে কোন তথ্য প্রমাণাদির উল্লেখ তাঁহারা করেন নাই। সুতরাং এই মত গ্রহণ করা যায় না।

রঘুনন্দন তাঁহার একাদশীতত্ত্বে ও আহ্নিকতত্ত্বে হরিভক্তিবিলাসের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, কেহ কেহ মনে করেন।[২] কিন্তু ইহা সত্য নহে। একাদশীতত্ত্বে 'দেবী পরিধৃতং মস্তকোপরিধৃতম্ অধোবস্ত্রধৃতমন্তর্জলপ্রক্ষালিতঞ্চ পুষ্পং দুষ্টম্' ইতি 'হরিভক্তি' এইরূপ দেখিয়া 'হরিভক্তি'কে বোধ হয় ইহা হরিভক্তিবিলাস বলিয়া মনে করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এই শ্লোকটি হরিভক্তিবিলাসের কোথাও নাই। আহ্নিক-তত্ত্বেও ঐ উপরোক্ত শ্লোকটিই উদ্ধৃত হইয়াছে এবং ইতি 'হরিভক্তি' লেখা আছে।

লীলাস্তব—জীব 'লীলাস্তব' নামে একটি গ্রন্থ সনাতনকৃত বলিয়াছেন।

লীলাস্তবষ্টিপ্পনী চ সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী
যা সংক্ষিপ্তা ময়া ক্ষুদ্রজীবেনাপি তদাজ্ঞয়া।

এই লীলাস্তব কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্ত দশমচরিত হইতে যে অভিন্ন তাহা নরহরি চক্রবর্তীর বিবরণ হইতে জানা যায় (ভ. র. ১।৮০৭-৮০৮)। এই গ্রন্থটি সনাতনের অন্যান্য গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইবার বহু পরে আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবার পূর্বে ইহার সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা অনেকের মধ্যে ছিল। রূপের স্তবমালায় 'নন্দোৎসবাদি চরিতং হইতে আরম্ভ করিয়া রঙ্গস্থল ক্রীড়া নামক ২৩টি লীলাবর্ণনামূলক কবিতা রহিয়াছে। ইহার টীকায় বলদেব বিদ্যাভূষণ বলিতেছেন—'ভগবল্লীলাং বর্ণয়িষ্যন্ শ্রীরূপো ভগবন্নামোৎকর্ষং মঙ্গলমাচরিতি জীয়াদিতি।' রসিকলাল বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন, 'শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ গীতাবলী ও দশমচরিতকে শ্রীপাদ্ রূপবিরচিত বলিয়াই তদীয় টীকা প্রারম্ভে বিঘোষিত করিয়াছেন।' কিন্তু আমরা বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে এই কাব্যও

[১] *History of Dharmasastra, Vol. I*, p. 675

[২] *Nepal Darbar Catalogue*, Preface, p. xviii
Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1915, p. 354
গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পৃঃ ৪১৫ ; নবদ্বীপমহিমা, পৃঃ ১১১
হরিভক্তিবিলাস—পুরীদাস সং, পৃঃ ৶৹

শ্রীপাদ সনাতনের রচিত। শ্রীপাদ কবিরাজ যে শ্রীপাদ সনাতনলিখিত দশম-চরিতের নামোল্লেখ করিয়াছেন উহা এই স্তবমালাভুক্ত দশমচরিত ভিন্ন অন্য কোন কাব্য নহে বলিয়াই আমার ধারণা' (শ্রীমৎ রূপসনাতন শিক্ষামৃত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৮৮)। রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সনাতনের আবিষ্কৃত দশম চরিত না দেখায় উক্ত ২৩টি লীলাবর্ণনামূলক কবিতাকে সনাতন রচিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে হরিদাস দাস কর্তৃক এই গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়া প্রকাশিত হওয়ায় সত্য বিবরণ জানা গিয়াছে। গ্রন্থের নাম দশমচরিত কারণ ইহাতে শ্রীমদ্‌-ভাগবতের দশমস্কন্ধের পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় পর্যন্ত প্রত্যেক অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার আছে। গ্রন্থটির কোন রচনাকাল পাওয়া যায় না। তবে সনাতন ইহার শেষে শ্রীচৈতন্যের স্তবে যে ভাবে তাঁহাকে 'নীলাচলবিভূষণ' আখ্যা দিয়াছেন ও দীনহীন সনাতনকে কি কখনও স্মরণ করিবেন বলিয়াছেন, তাহা হইতে মনে হয় গ্রন্থখানি শ্রীচৈতন্যের পুরীধামে বর্তমান থাকাকালেই রচিত হইয়াছিল।

শ্রীমচ্চৈতন্যদেব ত্বাং বন্দে গৌরাঙ্গসুন্দর।
শচীনন্দন মাং ত্রাহি যতিচূড়ামণে প্রভো॥
আজানুবাহো স্মেরাস্য নীলাচলবিভূষণ।
জগৎপ্রবর্তিত স্বাদু ভগবন্নামকীর্তন॥
অদ্বৈতাচার্য সংশ্লাঘিন্ সার্বভৌমাভিনন্দক।
রামানন্দকৃতপ্রীত সর্ববৈষ্ণববান্ধব॥
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজ-প্রেমামৃত-মহাম্বুধে।
নমস্তে দীনদীনং মাং কদাচিৎ কিং স্মরিষ্যসি।

বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী—শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের সুবিস্তৃত টীকার নাম বৈষ্ণব-তোষণী। জীব ইহার সংক্ষেপ করিলে সনাতনের গ্রন্থ বৃহৎ ও জীবের গ্রন্থ লঘু বা সংক্ষেপ নামে আখ্যাত হয়। বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণীর রচনার হেতু গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীধরস্বামিপাদৈর্যা ব্যঞ্জিতা ন ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
সেয়ং শ্রীদশম স্কন্ধ টীকা বৈষ্ণবতোষণী॥

শ্রীধরস্বামী তাঁহার টীকায় (ভাবার্থদীপিকা) যে সকল কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন নাই, তাহাই সুব্যক্ত ও পরিস্ফুট করিবার জন্যই এই টিপ্পনী রচিত।

জীবের বৈষ্ণবতোষণীর অন্ত্যে প্রদত্ত বিবরণ হইতে ইহার রচনাকাল ১৪৭৬ শকাব্দ বা ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দ জানা যায়।

শকে ষট্‌সপ্ততিমনৌ পূর্ণেয়ং টিপ্পনী শুভা।
সংক্ষিপ্তা যুগশূন্যাগ্র পঞ্চৈকগণিতে তথা॥

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পূর্বে দশমচরিত ও বৃহদ্ভাগবতামৃত রচনা করেন এবং অপ্রকটের একুশ বৎসর পরে বৈষ্ণবতোষণী টীকা সমাপ্ত করেন। লঘুতোষণীর শেষে জীব যে তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে সনাতন তরুণ বয়স হইতেই শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। সম্ভবতঃ তিনি অন্ততঃ অর্ধশতাব্দীকাল ধরিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পর্যালোচনা করিয়া ১৫৫৪ খৃস্টাব্দে বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী টীকা রচনা সমাপ্ত করেন।

ভাগবতের দশম স্কন্ধের ব্যাখ্যা লিখিতে যাইয়া সনাতন গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব যথাসম্ভব পরিহার করিয়া তাঁহার বিশুদ্ধ মাধুর্যভাবের উপর জোর দিয়াছেন। শিশুকৃষ্ণ মাটি খাইয়াছিলেন, অথচ তিনি মায়ের কাছে সে কথা অস্বীকার করিয়া বলিলেন, 'এই দেখ আমি হাঁ করিতেছি, মাটি খাইলে তাঁহার চিহ্ন থাকিবে তো', যশোদা তাঁহার মুখের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইলেন এবং বলিলেন :

অহং মমাসৌ পতিরেষ মে সুতো
ব্রজেশ্বরস্যাখিলবিত্তপা সতী।
গোপ্যশ্চ গোপাঃ সহগোধনাশ্চ
মে যন্মায়য়েত্থং কুমতি স মে গতিঃ॥—১০।৮।৪২

শ্রীধর স্বামীর টীকার অনুসরণ করিয়া শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন, 'আমি যশোদানাম্নী গোপী, এই নন্দগোপাল আমার পতি; এই কৃষ্ণ আমার পুত্র; আমি ব্রজেশ্বরের যাবতীয় সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী; এই গোপী, গোপ ও গোধন, সমস্তই আমার; এই সকল কুমতি যাঁহার মায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তিনিই আমাকে ত্রাণ করুন।' কিন্তু সনাতন গোস্বামী বলেন যে, আমার পুত্রকে আমি যে বিশ্বরূপ ও জগদীশ মনে করিতেছি এই কুমতি আমার দূরীভূত হউক, তাঁহার প্রতি পুত্রবুদ্ধি দৃঢ় হউক—'তথাপি স্ববালে ইত্থং বিশ্বরূপাশ্রয়তেশ্বর বিশেষোহয়মিতি কুমতির্মে যন্মায়য়াভূৎ, স জগদীশো মে গতিঃ, কুমতিমেতামপনীয় পুত্রবুদ্ধিমেব দৃঢ়ীকুর্যাদিত্যর্থঃ'। আবার দামবন্ধনলীলায় (১০।৯।১২) আছে যে, যশোদা পুত্র ভয় পাইয়াছে বুঝিয়া লাঠি ফেলিয়া দিলেন। তিনি তাঁহার প্রভাব অবগত ছিলেন না—'অতদ্বীর্যকোবিদা' বলিয়া তাঁহাকে রজ্জুর দ্বারা বন্ধন করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু সনাতন গোস্বামী ঐ শব্দটির ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন 'অতোঽতদ্বীর্য-কোবিদা তৎপ্রভাবানুসন্ধানরহিতা স্নেহভারাক্রান্তচিত্তত্বেনান্যাস্ফূর্তেঃ, যদ্বা, তদ্বীর্য-কোবিদাপি বদ্ধুমিয়েষ, যদ্বা, তদ্বীর্যকোবিদা, তচ্চাপলভরদুর্বারেতাদ্যভিজ্ঞা, অতস্তং বদ্ধুমেবৈচ্ছৎ'। যশোদা কৃষ্ণের প্রতি এতই স্নেহাসক্তা যে তিনি তাঁহার ঐশ্বর্য-

প্রভাবাদির অনুসন্ধানই করেন না এবং তাঁহার চিত্তে ঐ ভাবের স্ফুরণই হয় না। অথবা বীর্য বলিতে তাঁহার দুষ্টামিই বুঝাইতেছে।

ভাগবতে স্পষ্টতঃ শ্রীরাধার নামের কোন উল্লেখ না থাকিলেও সনাতন-গোস্বামী বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণীর বহুস্থানে (১৷২৩, ২৷১৩, ২৷১৷১০, ২৯৷১, ২৯৷৩৬, ৩০৷২৮, ৩২৷৮, ৩৩৷১৩, ৩৪৷২৫, ৩৫৷৬-৭, ৩৬৷১০, ৪৭৷১, ৪৭৷১২) বলিয়াছেন যে, শ্রীরাধাই ঐ শ্লোকে উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। তিনি যোগমায়াকে (২৯৷১) ও রমাকে (২৯৷৩৬) রাধা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেখানে যেখানে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে যে গোপীরা শিশুদের দুধ খাওয়ানো ছাড়িয়া রাসে চলিলেন (২৯৷৬) অথবা কৃষ্ণ যেখানে তাহাদিগকে বলিতেছেন যে তাহাদিগকে তাহাদের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও পতিরা দেখিতে না পাইয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন (২৯৷২০), সেখানে সনাতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে ঐ শিশুরা গোপীদের নিজের ছেলে নহে, ভগিনীর পুত্রাদি এবং পুত্র বলিতে পুত্রতুল্য ব্যক্তিদিগকে বুঝাইবে। জীব, বিশ্বনাথ প্রভৃতি পরবর্তী ব্যাখ্যাকারেরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন, যে গোপীদের ছেলেদের বয়স এমন হইয়াছে যে তাহারা গভীর রাত্রে মাকে খোঁজ করিতে বাহির হইতে পারে তাঁহারা তো বয়সে জরতী, তাঁহারা রাসে নাচিবেন কি করিয়া, সুতরাং পুত্র বলিতে নিজের পুত্র কিছুতেই বুঝাইবে না। কিন্তু তিন-চার বছরের শিশুও তো ঘুম ভাঙ্গার পর মা কোথায় গেল বলিয়া কাঁদিতে ও মাকে খুঁজিতে পারে। রাসের যে যে শ্লোকে গোপীদের মুখ দিয়া কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন মূলক কথা বলানো হইয়াছে সেখানে সনাতন গোস্বামী শ্লেষার্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ ৩১৷৪ শ্লোকের 'ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানখিল-দেহিনামন্তরাত্মদৃক' ব্যাখ্যার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সনাতন বলেন তুমি যদি যশোদার মতন দয়ালু গোপীর ছেলে হইতে তাহা হইলে আমাদের এই বিরহক্লিন্ন দশা দেখিয়া দেখা দিতে ; আর যদি সকল দেবীর অন্তর্দ্রষ্টা হইতে, তাহা হইলেও আমাদের মনের ব্যথা বুঝিতে। তুমি ও সব কিছুই নহ। এরূপ ব্যাখ্যায় যেমন মৌলিকতা, তেমনি রসপারিপাট্য সাধিত হইয়াছে। বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী সনাতনের সূক্ষ্ম সমুজ্জ্বল প্রতিভার দীপ্তিতে বিচ্ছুরিত হইয়া রহিয়াছে।

সনাতনকৃত বৃহদ্ভাগবতামৃতের দুইজন অনুবাদকের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম অনুবাদকের নাম কানাই দাস ও তাঁহার পরবর্তী অনুবাদকের নাম জয়গোবিন্দ দাস। কানাই দাসের অনুবাদটি হরিদাস দাস নবদ্বীপ হইতে প্রকাশ করেন। ইহার রচনার কাল না থাকিলেও লিপিকাল পাওয়া গিয়াছে। ১২৪০ বঙ্গাব্দে ২০শে চৈত্র দেওয়ান রায় কালিগতি সিংহ মহাশয়ের আজ্ঞানুসারে লিপিকার্য সমাপ্ত হইল বলিয়া লিপিকার লিখিয়াছেন। গ্রন্থশেষে কানাই দাস যে আত্মপরিচয়

দিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে তিনি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুশাখাস্থ শ্রীশ্যামাদাসাচার্যের বংশ্য হরিপ্রসাদ গোস্বামীর শিষ্য। ইহা ছাড়া আর কিছু বলেন নাই। তিনি হরিভক্তি-বিলাসেরও অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে আছে,—

হরিভক্তিবিলাস আর ভাগবতামৃত।
মূল দেখি লিখিলাম যেমন সামর্থ্য ॥

হরিভক্তিবিলাসের অনুবাদের নাম হরিভক্তিবিলাসলেশ। ইহা মূলানুগ নহে, সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ মাত্র। ইহাতে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা উদ্ধৃত হওয়ায় অনুবাদক সপ্তদশ শতাব্দীর পরে বর্তমান ছিলেন বোঝা যাইতেছে। হরিভক্তি-বিলাসের শ্লোকের পুঁথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে। এখনও মুদ্রিত হয় নাই। কানাই দাস বৃহদ্ভাগবতামৃতের অনুবাদের নাম বৃহদ্ভাগবতামৃতকণা রাখেন। ইহার আরম্ভ ও অন্ত্য নিম্নরূপ,—

আরম্ভ : শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ

নমস্তে গুরুদেবায় সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনে।
সর্বমঙ্গলরূপায় সর্বানন্দবিধায়িনে ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈর্সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় শ্রীমুখারবিন্দ কৃষ্ণ দুই বর্ণ ॥
কান্তিতে অকৃষ্ণ অঙ্গ, যেন কাঁচা সোনা।
হ্লাদিনীর দ্যুতি সেই—কি তার উপমা ॥

অন্ত্য : শ্রীরূপ সনাতন চরণ চিন্তনে।
তাহাত হইল এই গ্রন্থ সমাপনে ॥
শ্রীহরি পরসাদ পাই এই আশ।
ভাগবতামৃতকণা কহে কানাই দাস ॥

জয়গোবিন্দ দাসের বৃহদ্ভাগবতামৃতের অনুবাদটি অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ১৩১০ সালে প্রকাশিত করেন। ইহা সমগ্র গ্রন্থের অনুবাদ নহে, অংশবিশেষের বিশেষতঃ আখ্যায়িকাভাগ অবলম্বনে রচিত। গ্রন্থের অন্ত্যে জয়গোবিন্দ দাস যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় তিনি জাতিতে কায়স্থ, উপাধি বসু। পিতার নাম গোকুলচন্দ্র এবং বেনাপুর গ্রাম তাঁহার নিবাস ছিল। ১৭৬৪ শকের ২রা চৈত্র তাঁহার অনুবাদকার্য শেষ হয়।

আরম্ভ : জয় জয় শ্রীচৈতন্য ভক্তগণ প্রাণ।
জয় জয় দীনবন্ধো কৃপার নিধান ॥

৬

জয় জয় শচীর নন্দন গোরাচাঁদ।
কোটি শশী জিনি মুখচন্দ্র প্রেমফাঁদ॥

*   *   *

এই ভাগবতামৃত শাস্ত্র সুগোপন।
বৈষ্ণবসকল মুখে করুন শ্রবণ॥
বিশেষেতে অবৈষ্ণবগণ শুষ্ক মনে।
রসের অভাবে শ্রদ্ধা না হবে শ্রবণে॥

অন্ত্য ঃ নমো নম সনাতন গোস্বামি চরণে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের যে হন নিত্যজনে॥
শ্রীগুরু পাদারবিন্দ বন্দি সাবধানে।
যাঁহার কৃপায় হৈল এ গূঢ় ব্যাখ্যানে॥
বেনাপুর নামে গ্রাম পরম সুন্দর।
বিরাজ করেন যাহে শ্রীশ্যামসুন্দর॥
তাঁহার সেবক বসু শ্রীগোকুলচন্দ্র।
প্রেমভক্তিরূপ গগনেতে যেন চন্দ্র॥
তাঁহার তনয় জয়গোবিন্দ সুদীন।
ভক্তিশ্রদ্ধা নিষ্ঠা আদি সকলে বিহীন॥
যথামিতি টীকামূল করিয়া ভাবনা।
করিল সম্প্রতি ভাষাবচনে রচনা॥
ইহাতে কামনা এই সদা মম মনে।
করিবেন কৃপা এ অধীনে সাধুগণে॥
শাকে বেদরসাশ্ব গণিতে চৈত্রে দ্বিতীয়ে অহনি
নত্বা শ্রীগুরু পাদপদ্মযুগলং শ্রীকৃষ্ণভক্তিপ্রদম্
শ্রীমদ্ভাগবতামৃতাখ্যকমিদং সৎপুস্তকং ভাষয়া।
পূর্ণং সর্বফলাকরং গুণযুতং হীনেন জাতং মুদা॥

তৃতীয় অধ্যায়

রূপ গোস্বামী

রূপের আবির্ভাব, বাল্যকাল ও শিক্ষা, হোসেন শাহের রাজদরবারে মন্ত্রিত্ব ও রাজসভাত্যাগ প্রভৃতি ঘটনাবলী প্রথম অধ্যায়ে সনাতন গোস্বামী প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে। সেইজন্য সেইগুলির এখানে পুনরাবৃত্তি করা হইল না। রূপের বৃন্দাবনযাত্রা ও তাহার পরবর্তী ঘটনাগুলি এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হইতেছে।

১৫১৫ খৃষ্টাব্দের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে শ্রীচৈতন্যের নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাত্রার সংবাদ পাইয়া রূপ কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমের সহিত সেই সময়ে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথে প্রয়াগে শ্রীচৈতন্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। শ্রীচৈতন্যের নিকট ভক্তিতত্ত্ব সম্পর্কে দশদিন শিক্ষালাভ করিয়া রূপ তাঁহার আদেশে প্রয়াগ ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন গমন করেন। বৃন্দাবনে এক মাস থাকিবার পর সনাতনের খোঁজে গঙ্গাতীরে পথে প্রয়াগে আসেন (চৈ. চ. ২।২৫।১৬০)। ভিন্ন পথ দিয়া দুই ভ্রাতার যাতায়াতের জন্য পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল না। রূপ প্রয়াগ হইয়া কাশীতে পৌঁছিলেন এবং সেখানে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের নিকট সনাতনের কাশীতে আগমন ও শ্রীচৈতন্যের নিকট শিক্ষা প্রাপ্তি প্রভৃতি সমূহ বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। ইহা ১৫১৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল হইবে কারণ পূর্বেই দেখাইয়াছি যে ১৫১৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে সনাতন কাশীতে শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হন ও দুইমাস সেখানে অবস্থান করেন। কাশীতে দশদিন থাকিয়া রূপ ও অনুপম গৌড় দেশ হইয়া নীলাচলে যাইবার জন্য যাত্রা আরম্ভ করিলেন। পথিমধ্যে গৌড়ে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটিল। ভ্রাতৃশোকে বিষণ্ণ রূপ একাই নীলাচলের উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। ইহা রথযাত্রার কিছু পূর্বের ঘটনা। গৌড়ীয় ভক্তেরা প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় নীলাচলে আসিলেন। রূপও তাঁহাদের সঙ্গে আসিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু অনুপমের আকস্মিক মৃত্যু ঘটায় তাহা পারেন নাই।

> অনুপম লাগি তাঁর কিছু বিলম্ব হৈল।
> ভক্তগণ পাশে আইল, লাগি না পাইল ॥ —চৈ. চ. ৩।১।৩৪

গৌড়ীয়দের নীলাচলে উপস্থিত হইবার পরে রূপ নীলাচলে উপস্থিত হইয়াছিলেন দেখা যাইতেছে। ইহা ১৫১৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস হইবে। রথযাত্রা দেখিবার পর আরও কয়েক মাস থাকিয়া দোলযাত্রার পর রূপ নীলাচল ত্যাগ করেন (চৈ. চ.

৩।১।১৬৫)। গৌড়ে ধনসম্পত্তি বণ্টনাদি সুব্যবস্থার জন্য রূপ নীলাচল হইতে গৌড়ে প্রথমে যাত্রা করেন। ইহা ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাস হইবে। বৃন্দাবনে কিছুদিন বাস করিয়া ও শ্রীচৈতন্যের নিকট প্রয়াগে ও পুরীতে শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াও রূপ যে ধনসম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করিবার কথা ভুলিয়া যান নাই ইহা তাঁহার প্রখর ব্যক্তিত্বের অনন্যসাধারণত্বের পরিচায়ক।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনানুসারে হোসেন শাহকে রূপ সম্বন্ধে কতকটা উদাসীন দেখা যায়। রূপ যখন গৌড় নগরী ত্যাগ করেন, তখন হোসেন শাহ সনাতনের নিকট কোনরূপ অনুযোগ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। আবার তিনি ফিরিয়া আসিয়া যখন বিষয়সম্পত্তি বিলি-ব্যবস্থা করিতেছেন তখনও সুলতানের নিকট হইতে কোন নিগ্রহ বা অনুগ্রহ পাইয়াছিলেন বলিয়া চরিতামৃতে লিখিত হয় নাই। রূপ এমন কৌশলে এবং সম্ভবতঃ গোপনতার সহিত ধনসম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে হোসেন শাহ বা তাঁহার কর্মচারীরা সে বিষয়ে বোধ হয় কিছুই জানিতে পারেন নাই অথবা জানিলেও তাঁহার কাজে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

যাহা হউক, গৌড়ে এক বৎসর কাটাইবার পর রূপ বৃন্দাবনে গমন করেন ও সনাতনের সহিত মিলিত হন। ইহা ১৫১৮ খৃষ্টাব্দের জুন-জুলাই মাস হইবে। কারণ শ্রীচৈতন্য ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের দোলযাত্রার পর রূপকে বৃন্দাবনে পৌঁছাইয়া সনাতনকে পাঠাইয়া দিবার কথা বলিয়াছিলেন। রূপের সহিত সনাতনের এই সময়ে সাক্ষাৎ ঘটে নাই। রূপ যখন বৃন্দাবনে আসিলেন তখন সনাতন নীলাচলে পৌঁছাইয়া গিয়াছেন। নীলাচলে সনাতন একবৎসর কাটাইবার পর বৃন্দাবনে ফিরিলে সেই সময় দুই ভাইয়ের সাক্ষাৎ হয় (চৈ. চ. ৩।৪।২০৪)। দোলযাত্রার পর রূপের নীলাচল ত্যাগের দিন দশেক পরে সনাতন যে নীলাচলে আসেন এবং পরবর্তী দোলযাত্রা পর্যন্ত থাকেন তাহা চরিতামৃত হইতে জানা যাইতেছে,—

সনাতন মহাপ্রভুর চরণে রহিলা।
দোলযাত্রাদিক প্রভুর সঙ্গে দেখিলা ॥ —চৈ. চ. ৩।৪।১০৮

সুতরাং ১৫১৮ খৃষ্টাব্দের জুন-জুলাইতে দুই ভ্রাতার বৃন্দাবনে প্রথম মিলন ঘটিল। রূপ এই যে ব্রজমণ্ডলে আসিলেন আর কখনও ইহা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন নাই।

গোবিন্দবিগ্রহ প্রকট ও মন্দিরনির্মাণ

কৃষ্ণদাস কবিরাজ যাঁহাদের ইচ্ছায় চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে হরিদাস পণ্ডিত অন্যতম। তিনি গদাধর পণ্ডিতের প্রশিষ্য ও অনন্ত আচার্যের

শিষ্য। হরিদাস পণ্ডিতের শিষ্য রাধাকৃষ্ণ দাস তাঁহার সাধনদীপিকা গ্রন্থে গোবিন্দবিগ্রহ প্রকটের নিম্নোক্ত রূপ বিবরণ দিয়াছেন। রূপ যখন বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্যের আদেশে অভীষ্ট দেবমূর্তির অনুসন্ধান করিতেছিলেন তখন একদিন শ্রীবিগ্রহ না পাইয়া বিষণ্ণচিত্তে যমুনার তীরে বসিয়াছিলেন। সেই সময় একজন পরম সুন্দর ব্রজবাসী আসিয়া সস্নেহে রূপের বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রূপ তাঁহাকে মহাপ্রভুর সমস্ত আদেশের কথা গোচর করিলেন। সেই কথা শুনিয়া ব্রজবাসী রূপ গোস্বামীকে গুমাটিলা নামক স্থানে লইয়া গেলেন এবং স্থানটিকে দেখাইয়া বলিলেন যে প্রত্যহ পূর্বাহ্নে একটি গাভী আসিয়া এখানে দুগ্ধ বর্ষণ করিয়া যায়। ইহার মর্ম উপলব্ধি করিয়া যাহা উচিত তাহা কর, এই বলিলে রূপ তাঁহার রূপে ও বাক্যে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে চৈতন্য পাইয়া সমস্ত রহস্য হৃদয়ংগম করিলেন এবং এই স্থানেই গোবিন্দদেব আছেন বুঝিয়া ব্রজবাসিগণকে জানাইলেন। ইহা শুনিয়া বালক বৃদ্ধ যুবা সকলে মিলিয়া ঐ স্থান খনন করিল এবং কোটিমন্মথমোহন যোগপীঠ মধ্যস্থিত গোবিন্দবিগ্রহকে পাইল (সাধনদীপিকা, অষ্টমকক্ষা)। নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকরে বলিয়াছেন যে বিগ্রহ আবিষ্কৃত হইবামাত্র রূপ পত্রযোগে তাহা শ্রীচৈতন্যকে জানান।

গোবিন্দপ্রকটমাত্রে শ্রীরূপগোসাঞি।
ক্ষেত্রে পত্রী পাঠাইলা মহাপ্রভু ঠাঞি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু পার্ষদ সহিতে।
পত্রী পড়ি আনন্দে না পারে স্থির হৈতে॥ —ভ. র. ২।৪৩৬-৪৩৭

ইহা সত্য হইলে শ্রীচৈতন্যের প্রকটাবস্থায় অর্থাৎ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এই বিগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিতে হয়।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রূপ গোবিন্দবিগ্রহের বর্ণনা দিয়াছেন (পূর্ববিভাগ ২।১১১)। ইহা হইতে ১৫৪১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে যে গোবিন্দবিগ্রহ প্রকটিত হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

রাধানাথ কাবাসী সম্পাদিত বৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার গ্রন্থে (৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৬১) মনোহর দাস নামে জনৈক পদকর্তা লিখিয়াছেন যে, সনাতন গোবিন্দসেবা প্রচার করেন।

জয় পঁহু শ্রীল সনাতন নাম।
সকলভুবন মাহা বহু গুণধাম॥

*   *   *

শ্রীগোবিন্দ সেবা পরচারি।
করল ভাগবত অর্থ বিচারি॥

সাধনদীপিকাকার রাধাকৃষ্ণ দাস রূপ গোস্বামীই গোবিন্দসেবা প্রচলন করেন, এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীমদ্‌গোবিন্দস্য সুখাধিকা।
বৃন্দাবনে যোগপীঠে সেবা সুপ্রকটীকৃতা॥
শ্রীচৈতন্যকৃপারূপ-রূপেণ করুণাকৃতা॥ —১ম কক্ষা

রাধাকৃষ্ণ দাস গোস্বামীর মতই অধিকতর প্রামাণ্য মনে করি।

এই গোবিন্দবিগ্রহ মদনগোপালদেবের মত প্রথমে রাধা বিহীন ছিলেন। পরবর্তী কালে উড়িষ্যা হইতে নীত শ্রীরাধামূর্তি ইহার বামে শোভা পাইতে থাকেন।

শ্রীরাধিকা ক্ষেত্র হৈতে বৃন্দাবন গেলা।
গৌড় উৎকলাদি দেশে সকলে জানিলা॥
যে দিবস বৃন্দাবনে প্রবেশ করিল।
সে দিবস সুখের সমুদ্র উথলিল॥
গোবিন্দের বামে বসাইলা সিংহাসনে।
হইল অদ্ভুত রঙ্গ দোঁহার মিলনে॥

—ভ. র. ৬।১০৭-১০৯

বৃন্দাবনে গোবিন্দদেবের ভগ্নচূড় প্রাচীন মন্দিরটি সকলেরই চোখে পড়ে। গোবিন্দদেবের মন্দিরের চারিদিকের প্রাচীরবেষ্টিত স্থানকে গোবিন্দের ঘেরা বলে। জগমোহনের দুইদিকে দুইটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে। উহার দক্ষিণ দিকের মন্দিরের অভ্যন্তর যোগপীঠ নামে খ্যাত। এই স্থানেই গোবিন্দদেব আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন বলা হইয়া থাকে। কয়েকটি সিঁড়ি পার হইয়া নীচে নামিলে একটি সংকীর্ণ অন্ধকারস্থানে আসা যায়, সেইখানে প্রদীপের আলোকে পূজারীগণ যোগমায়ার মূর্তি দেখাইয়া থাকেন। এই ছোট মন্দিরের উত্তর দিকের প্রাচীরে দেবনাগরী অক্ষরে নিম্নলিখিত লিপি খোদিত আছে,—

সংবৎ ৩৪ শ্রীশকবন্ধ আকবর সাহা রাজশ্রী কর্মকুল শ্রীপৃথ্বীরাজাধিরাজবংশ মহারাজ শ্রীভগবন্তদাসসুত শ্রীমহারাজাধিরাজ শ্রীমানসিংহদেব শ্রীবৃন্দাবন যোগপীঠ-স্থান মন্দির বনাও শ্রীগোবিন্দদেবকো কাম উপরি শ্রীকল্যাণদাস আজ্ঞাকারী মাণিকচংদ চৌপাড শিল্পকারি গোবিন্দদাস দিলবলী কারিগর। দঃ গণেশদাস বিমবল। অর্থাৎ আকবর বাদশাহের ৩৪তম রাজ্যাব্দে মহারাজ পৃথ্বীরাজের বংশীয় মহারাজ শ্রীভগবন্ত দাসের পুত্র মহারাজাধিরাজ মানসিংহদেব বৃন্দাবনের যোগপীঠ-স্থানে এই মন্দির নির্মাণ করেন। নির্মাণকার্যের প্রধান ব্যক্তি কল্যাণ দাস, শিল্পকারী মাণিকচাঁদ চোপাড এবং দিল্লীবাসী গোবিন্দদাস কারিগর ছিলেন। গণেশদাস বিমবল ইহা দস্তখত করিয়াছেন।

রাধাকৃষ্ণ দাস গোস্বামীর সাধনদীপিকা হইতেও মানসিংহ যে গোবিন্দদেবের মন্দির নির্মাণ করেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীমান্ প্রতাপী গোবিন্দপাদভক্তিপরায়ণঃ।
ভক্তশ্চৈতন্যপাদাব্জে মানসিংহো নরাধিপঃ।
প্রতাপরুদ্রস্তৈশ্বর্যসেবালগ্নমনা হরেঃ।
অয়ং মাধুর্যসেবায়াং লোভাক্রান্তমনা নৃপঃ॥
মহামন্দিরনির্মাণ কারিতং যেন যত্নতঃ।
অদ্যাপি নৃপ-তদ্বংশ্যাঃ প্রভুভক্তিপরায়ণঃ॥ —৮ম কক্ষা

চৈতন্যচরিতামৃতে আছে যে রঘুনাথ ভট্ট নিজশিষ্যকে বলিয়া গোবিন্দদেবের মন্দির নির্মাণ করেন।

নিজশিষ্য কহি গোবিন্দ মন্দির করাইল।
বংশী মকর কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল॥ —চৈ. চ. ৩।১৩।১৩০

এই শিষ্য মানসিংহ হইতে পারেন কিনা বলা যায় না। ভক্তিরত্নাকরে নরহরি চক্রবর্তী কিংবদন্তী সংগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন যে সনাতনের অপ্রকট হওয়ার পূর্বে রঘুনাথ ভট্ট অপ্রকট হন (ভ. র. ৪।১৯৪-১৯৮)। ইহা সত্য হইলে রঘুনাথ ভট্ট ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে তিরোহিত হন মনে করিতে হয় এবং তাহা হইলে মানসিংহকে বলিয়া ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পক্ষে মন্দির নির্মাণ করান সম্ভব হইতে পারে না বলিয়া ধারণা হয়।

গ্রাউস বলিয়াছেন যে রূপ ও সনাতনের তত্ত্বাবধানে মানসিংহ ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দদেবের মন্দির নির্মাণ করেন।[১] তিনি এই তথ্য কোথা হইতে পাইলেন তাহা বোঝা গেল না। প্রাচীরগাত্রে যে লিপি খোদিত আছে তাহা হইতে কিছুতেই মনে করা চলে না যে রূপসনাতনের তত্ত্বাবধানে মানসিংহ মন্দির নির্মাণ করেন। তাহা ছাড়া পূর্বেই দেখাইয়াছি যে সনাতন ১৫৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিরোহিত হন। সুতরাং সনাতনের পক্ষে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে মন্দির নির্মাণের তত্ত্বাবধান করা অসম্ভব ব্যাপার। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ গ্রাউসের মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়াই বলিয়াছেন ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে রূপসনাতনের তত্ত্বাবধানে মানসিংহ গোবিন্দদেবের মন্দির নির্মাণ করেন।[২] কিন্তু ইহা যে যুক্তিহীন তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

১ *District Memoirs of Mathura*, 3rd. ed., p. 243

২ *The Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal*, p. 39
চৈতন্যচরিতের ভূমিকা, ৩য় সং, পৃঃ ৭৫

মনে হয় গোবিন্দবিগ্রহ আবিষ্কৃত হইবার পরে বিগ্রহের জন্য একটি মন্দির নির্মিত হয়। সেই মন্দির খুব বৃহৎ ও কারুকার্যখচিত ছিল না। পরে আকবরের রাজ্যকালে তাঁহার সেনাপতি মানসিংহ কারুকার্যমণ্ডিত এই বিশাল মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

তিরোভাব

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (পৃঃ ২১১) এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত A History of Bengali Language and Literature (p. 509) গ্রন্থদ্বয়ে রূপ ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে তিরোহিত হন, এইরূপ লেখেন। পরে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত The Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal গ্রন্থে (p. 39) মত পরিবর্তন করিয়া ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে রূপের তিরোভাবের কথা লেখেন। মনে হয়, গ্রাউসের রূপ সনাতনের তত্ত্বাবধানে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে মানসিংহের মন্দির নির্মাণের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই মত পরিবর্তন করেন। জগদ্বন্ধু ভদ্র ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গৌর-পদতরঙ্গিণীতে (পৃঃ ৪১) রূপের ১৪৮০ শকে (১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে) তিরোভাব হয়, এইরূপ লেখেন। সম্ভবতঃ তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া ১৩১২ সালে প্রকাশিত বৈষ্ণব ইতিহাস (পৃঃ ৬৩) ও বিশ্বকোষ (পৃঃ ৬৯১) গ্রন্থদ্বয়ে হরিলাল চট্টোপাধ্যায় ও নগেন্দ্রনাথ বসু ১৪৮০ শকে (১৫৫৮ খৃষ্টাব্দ) রূপ তিরোহিত হন, এইরূপ লেখেন। অধুনাকালে ডঃ সুকুমার সেন রূপের তিরোভাবকাল ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দ, ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ ১৫৯১-৯২ খৃষ্টাব্দ এবং গিরিজাশংকর রায় চৌধুরী ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দ ধরিয়াছেন।[১] ইহা ছাড়াও বিভিন্নগ্রন্থে বিভিন্ন মত ব্যক্ত রহিয়াছে।

সনাতনের ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে তিরোধান হইয়াছিল পূর্বে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। রূপ সনাতনের অল্পকাল পরেই তিরোহিত হন এইরূপ একটি কিংবদন্তী ভক্তিরত্নাকরে নরহরি চক্রবর্তী দিয়াছেন।

> এই কথোদিনে শ্রীগোসাঞি সনাতন।
> মো সবার নেত্র হৈতে হইলা অদর্শন॥
> এবে অপ্রকট হৈলা শ্রীরূপ গোসাঞি।
> দেখিয়া আইনু যে দুঃখের সীমা নাঞি॥—ভ. র. ৪।১৯৭-১৯৮

[১] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, ৩য় সং, পৃঃ ২৮৬ ; চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা, ৩য় সং, পৃঃ ২৫ ; শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ, পৃঃ ১৩৩

ভক্তিরত্নাকরে নৃসিংহ কবিরাজের যে নবপদ্য উদ্ধৃত রহিয়াছে তাহা হইতেও রূপ ও সনাতনের অল্পকালের মধ্যে তিরোধানের বৃত্তান্ত পাওয়া যায় (৪র্থ তরঙ্গ)।

কর্ণপুর কবিরাজ কৃত শ্রীনিবাসাচার্যগুণলেশসূচক হইতেও রূপ ও সনাতনের অল্পসময়ের ব্যবধানে তিরোধানের সংবাদ পাওয়া যায়।

কৃত্বা যো হৃদি পাদপদ্মযুগলং শ্রীরূপগোস্বামিনঃ
স্তজ্জেষ্ঠস্য সনাতনস্য চ যদা গচ্ছন্ ব্রজং সত্বরম্ ।
শ্রুত্বা শ্রীমথুরাদ্যনাম্নি নগরে তদ্‌গোপনং যোঽপতৎ
সোঽয়ং মে করুণানিধি বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসপ্রভুঃ ॥ —১৯শ শ্লোক

অর্থাৎ রূপ গোস্বামীর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সনাতনের পাদপদ্মযুগল হৃদয়ে ধরিয়া তিনি সানন্দে সত্বর ব্রজে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু মথুরানগরে রূপ ও সনাতনের অপ্রকটের কথা শুনিয়া যে শ্রীনিবাস প্রভু মূর্ছিত হইয়াছিলেন আমার সেই করুণানিধি ঠাকুর শ্রীনিবাস প্রভুর জয় হউক।

এই সমস্ত কিংবদন্তীর পরিপ্রেক্ষিতে ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে সনাতনের তিরোধানের পর তাহার দুই এক বৎসরের মধ্যে রূপ তিরোহিত হইয়াছিলেন মনে করা যাইতে পারে।

রূপ ও মীরাবাঈ

বাংলা ভক্তমাল গ্রন্থে রূপের সহিত মীরাবাঈয়ের সাক্ষাতের কথা বর্ণিত আছে।

বৃন্দাবনে গিয়া বাঈ আনন্দে মগন।
বাঞ্ছা হৈল শ্রীরূপ গোস্বামী দরশন ॥
কহি পাঠাইল শ্রীরূপেরে কারো দ্বারে।
দরশন করি যদি কৃপা করে মোরে ॥

* * *

তবে বাঈ হৃষ্টমনে গোসাঞির স্থানে।
যাইয়া অষ্টাঙ্গ করি পড়িলা চরণে ॥
পরমাসুন্দরী বাঈ অল্প বয়েস।
গোপী উদ্দীপনে রূপের হৈল প্রেমাবেশ ॥ —২২শ মালা

বাংলা ভক্তমাল গ্রন্থ নাভাজীর ভক্তমাল ও প্রিয়দাসকৃত তট্টীকা অবলম্বনে লালদাস বা কৃষ্ণদাস দ্বারা রচিত। লেখক এমন বহু কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন যাহা মূল গ্রন্থে বা তাহার টীকায় নাই। সুতরাং এই গ্রন্থের উক্তিকে গ্রহণ করিতে আপত্তি আছে। ভক্তমালের মূলে মীরাবাঈজি সম্পর্কে এই ছপ্পয়টি রহিয়াছে।

লোক লাজ কুল শৃঙ্খলা তজি মীরা গিরিধর ভজী।
সদৃশ গোপিকা প্রেম প্রগট কলি জুগহিঁ দিখায়ৌ॥
নিরঙ্কুশ অতি নিড়র রসিক যশরসনা গায়ৌ॥
দুষ্টনি দোষ বিচারি, মৃত্যু কি উদ্দীম কিয়ৌ।
বারণ বাঁকৌ ভয়ৌ, গরল অমৃত জোঁ পীয়ৌ॥
ভক্তিনিশান বজায় কৈ কাহুতে নহিন লজী।
লোকলাজ কুলশৃঙ্খলা তজি মীরা গিরিবর ভজী॥

ইহাতে রূপের সঙ্গে সাক্ষাতের কোন কথাই নাই দেখা যাইতেছে।

গ্রন্থ পরিচয়

ছয় গোস্বামীর মধ্যে কবিত্বশক্তিতে রূপ গোস্বামী অধিকতর খ্যাতিবান্ ছিলেন। ধ্বনিমধুর বাণীবিন্যাসে, অলংকার প্রয়োগের কলাকৌশলে এবং রসগভীর ব্যঞ্জনায় তাঁহার সৃষ্ট কাব্য অতুলনীয় বলা যাইতে পারে। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের একটি প্রায়-পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ভ্রাতুষ্পুত্র জীব কৃত লঘুতোষণীর উপসংহার হইতে পাওয়া যায়।

জীব লিখিয়াছেন,—

তয়োরনুজসৃষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকম্।
শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশশ্ছন্দোঽষ্টাদশকং তথা॥
স্তবস্যোৎকলিকাবল্লী গোবিন্দবিরুদাবলী।
প্রেমেন্দুসাগরাদ্যাশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ॥
বিদগ্ধললিতাগ্রাখ্যমাধবং নাটকদ্বয়ম্।
ভাণিকা দানকেল্যাখ্যা রসামৃতযুগং পুনঃ॥
মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা।
সংক্ষিপ্ত শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ॥

জীব প্রদত্ত তালিকাটি ছাড়া জীবের শিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারী কৃত বলিয়া রূপের গ্রন্থের যে তালিকা ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে আরও চারিটি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়।

তয়োরনুজসৃষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকম্।
শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশঃ কৃষ্ণজন্মতিথেবিধিঃ॥
বৃহল্লঘুতয়া খ্যাতা শ্রীগণোদ্দেশদীপিকা।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়াণাঞ্চ স্তবমালা মনোহরা॥
বিদগ্ধমাধবঃ খ্যাতস্তথা ললিতমাধবঃ।

দানলীলাকৌমুদী চ তথা ভক্তিরসামৃতম্।
উজ্জ্বলাখ্যো নীলমণিঃ প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা ॥ —ভ. র. ১।৭৯৬-৭৯৯

লঘুতোষণীতে প্রদত্ত তালিকার প্রেমেন্দুসাগর, উৎকলিকাবল্লী ও গোবিন্দবিরুদাবলী পৃথক গ্রন্থভাবে প্রকাশিত না হইয়া স্তবমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। জীব ছন্দোঽষ্টাদশকম্ নামে যে পৃথক গ্রন্থের নাম করিয়াছেন, তাহাও ঐভাবে স্তবমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং লঘুতোষণী অনুসারে গ্রন্থসংখ্যা (১) হংসদূত, (২) উদ্ধবসন্দেশ, (৩) বিদগ্ধমাধব, (৪) ললিতমাধব, (৫) দানকেলিকৌমুদী, (৬) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, (৭) উজ্জ্বলনীলমণি, (৮) মথুরামহিমা, (৯) পদ্যাবলী, (১০) নাটকচন্দ্রিকা, (১১) সংক্ষিপ্ত ভাগবতামৃত এবং (১২) জীব কর্তৃক সংগৃহীত স্তবমালা লইয়া বারটি দাঁড়ায়। এই বারটির সঙ্গে কৃষ্ণদাস অধিকারীর প্রদত্ত তালিকার চারিটি (১) কৃষ্ণজন্মতিথিবিধি, (২) বৃহৎগণোদ্দেশ-দীপিকা, (৩) লঘুগণোদ্দেশদীপিকা এবং (৪) প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা যোগ করিলে ষোলটি হয়। ইহা ছাড়াও দুইটি গ্রন্থের বিবরণ নরহরি চক্রবর্তী দিয়াছেন। একটি হইতেছে,—

বৈষ্ণব ইচ্ছায় একাদশ শ্লোক কৈল।
কৃষ্ণদাস কবিরাজে বিস্তারিতে দিল ॥
অষ্টকাললীলা তাতে অতি রসায়ন।
ভাগাবন্ত জন সে করয়ে আস্বাদন ॥ —ভ. র. ১।৮১৮-৮১৯

অপরটি হইতেছে,—

সংক্ষেপে করিল আর বিরুদ লক্ষণ।
গ্রন্থের গণনামধ্যে না কৈল গণন ॥ —ভ. র. ১।৮২০

উপরিউক্ত গ্রন্থ দুইটির দ্বিতীয়টী সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজও উল্লেখ করিয়াছেন—'গোবিন্দবিরুদাবলী, তাহার লক্ষণ (চৈ. চ. ২।১।৩৫)। বলদেব বিদ্যাভূষণও গোবিন্দবিরুদাবলীর টীকাতে রূপকৃত বিরুদলক্ষণের কথা বলিয়াছেন। সুতরাং এই গ্রন্থটির অকৃত্রিমতায় বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু রূপ একাদশ শ্লোক করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজকে বিস্তারিত করিতে দিয়াছিলেন, নরহরি চক্রবর্তীর এই বিবরণে সন্দেহ জাগে। যদি কৃষ্ণদাস কবিরাজ রূপকৃত একাদশ শ্লোক বিস্তারিত করিয়া থাকিবেন, তবে তিনি তাহা উল্লেখ করিলেন না কেন? অবশ্য তিনি যে গোবিন্দলীলামৃতে রূপদর্শিত পথে অষ্টকালীয় লীলা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বলিয়াছেন।

শ্রীরূপদর্শিতদিশা লিখিতাষ্টকাল্যা
শ্রীরাধিকেশকৃতকেলিততি র্ময়েয়ম্। —২৩।৫৪

রূপের নামে আরোপিত এই একাদশ শ্লোক অষ্টকালিক শ্লোকাবলী বা 'স্মরণ-মঙ্গলৈকাদশম্' নামে কোন কোন পুঁথিতে দৃষ্ট হয়।[১] বহরমপুর হইতে প্রকাশিত গোবিন্দলীলামৃতের সংস্করণে এই একাদশটি শ্লোক যথাক্রমে ১ম সর্গের ৩য়, ৪র্থ ও ১০ম শ্লোক ; ২য় সর্গের ১ম ; ৫ম সর্গের ১ম ; ১৯শ সর্গের ১ম, ২০শ সর্গের ১ম ও ২১শ সর্গের ১ম শ্লোকরূপে দৃষ্ট হয়। স্মরণমঙ্গলের শেষের দুইটি শ্লোক অর্থাৎ ১০ম ও ১১শ শ্লোকের কোন কোন চরণের সঙ্গে গোবিন্দলীলামৃতের ২২শ সর্গের ১ম শ্লোকের কোন চরণের মিল আছে মাত্র। এ ছাড়া কোন মিল নাই। রূপের শ্লোক গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া থাকিলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিশ্চয়ই উল্লেখ করিতেন।

হরিদাস পণ্ডিতের শিষ্য সাধনদীপিকাকার রাধাকৃষ্ণ দাস এই শ্লোকগুলির ভাষ্য করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, এইগুলি রূপের আজ্ঞায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ লেখেন। সাধনদীপিকা গ্রন্থেও তিনি ইহা কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত বলিয়াছেন,—

> শ্রীমদ্‌রাধাপ্রাণবন্ধোর্নৈত্যিকং চরিতং হি যৎ
> শ্রীমৎ কৃষ্ণকবীন্দ্রেণ কৃপয়া প্রকটীকৃতম্।
> শ্রীমদ্‌রূপাজ্ঞয়া তেষাং পরমাপ্তবরেণ তু
> কৃতং তস্মিন্ ময়া ভাষ্যং তেষাং বাক্যপ্রমাণতঃ ॥ —১ম কক্ষা

সাধনদীপিকাকারের উক্তি অধিকতর প্রামাণ্য বিধায় এই একাদশ শ্লোকের রচয়িতা হিসাবে রূপের নামোল্লেখে আপত্তি রহিয়াছে।

নরহরি চক্রবর্তীর উল্লিখিত গ্রন্থ দুইটির প্রামাণিকতা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। এখন জীব ও জীবশিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারীর প্রদত্ত তালিকাটি আলোচনা করা প্রয়োজন। জীবের গ্রন্থতালিকা সম্পর্কে আমাদের সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। কিন্তু কৃষ্ণদাস অধিকারী প্রদত্ত অতিরিক্ত চারিটি গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদের সন্দেহের অবসর রহিয়াছে। জীবের লঘুতোষণীর রচনাকাল ১৫৮২ খৃষ্টাব্দ। উক্ত সময়ের মধ্যে চারিটি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল যদি মনে করি, তাহা হইলে জীব তাঁহার লঘুতোষণীতে ইহার উল্লেখ করিলেন না কেন? উক্ত গ্রন্থগুলি যে লঘু-তোষণীর পরে রচিত হইয়াছিল এমন মনে করার দৃঢ় কারণ নাই। আর তাহা ছাড়া, উক্ত চারিটি গ্রন্থের অন্ততঃ দুইটি যে লঘুতোষণীর পূর্বে রচিত হইয়াছিল

[১] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী *Notices of Skt. Mss.* পুস্তকে (2nd. Series, Vol. I, p. 418 No. 414) পঁয়ত্রিশ শ্লোকাত্মক 'স্মরণমঙ্গলৈকাদশ' নামক স্তবের একটি পুঁথির বিবরণ দিয়াছেন। ইহার পুষ্পিকা এইরূপ,—'ইতি শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামিনা বিরচিতং শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োরষ্টকালিক শ্লোকাবলী স্মরণমঙ্গলং সমাপ্তম্। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এগার শ্লোকাত্মক একটি পুঁথি (১১১৬ নং) আছে।

তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। বৃহৎ ও লঘু রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকার রচনাকাল এইরূপ উল্লিখিত রহিয়াছে।

শাকে দৃগশ্বশক্রে নভসি
নভোমণিদিনে ষষ্ঠ্যাম্।
ব্রজপতিসদ্মনি রাধাকৃষ্ণ
গণোদ্দেশদীপিকাদীপি ॥

অর্থাৎ ১৪৭২ শকাব্দে (১৫৫০ খৃষ্টাব্দ) শ্রাবণ মাসে রবিবারে ষষ্ঠী তিথিতে ব্রজপতিগৃহে রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

১৫৫০ খৃষ্টাব্দে লিখিত গ্রন্থ লঘুতোষণীতে (রচনাকাল ১৫৮২ খৃষ্টাব্দ) উল্লিখিত হইল না কেন? তাহা হইলে মনে করিতে হয় জীব এই গ্রন্থটি সম্পর্কে কিছু জানিতেন না এবং গ্রন্থটি নিতান্তই প্রক্ষিপ্ত।

অবশ্য জীব তাঁহার তালিকায় ইহার উল্লেখ করেন নাই বলিয়া ইহা রূপরচিত নহে এইরূপ বলা চলে না। রূপ গোবিন্দবিরুদাবলীর লক্ষণের কথা উল্লেখ করেন নাই কিন্তু ইহা যে রূপের রচিত তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা গ্রন্থটি যে জীবের নিকট অপরিচিত ছিল না তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দুর্গমসঙ্গমনী টীকার একস্থানে জীব বলিতেছেন —'অত্র শ্রীমদ্ব্রজসেবকানামপি তন্মহাবিরহানন্তরং নিত্যাস্থিতির্বক্ষ্যমাণস্য প্রেয়সো বৎসলস্য চান্তিমটীকানুসারেণ জ্ঞেয়া। তেষাং দিগ্‌দর্শনন্তু গণোদ্দেশদীপিকা দৃষ্ট্যা ক্রিয়তে' (৩৷২৷১৩৭)। কিন্তু গ্রন্থটির রচয়িতা যে তাঁহার পিতৃব্য রূপ এমন উল্লেখ এখানে পাই না।

সাধনদীপিকাকার রাধাকৃষ্ণ দাস গণোদ্দেশদীপিকাকে রূপরচিত বলিয়াছেন, 'এবং স্তবমালা স্তবাবলী গণোদ্দেশদীপিকাদিষু প্রকটাপ্রকটে বর্তমানাঃ পরকীয়াঃ লীলাঃ প্রার্থনীয়াঃ বর্তন্তে'। সাধনদীপিকাকার লঘুগণোদ্দেশদীপিকা হইতে যে প্রমাণ শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা মুদ্রিত লঘুগণোদ্দেশদীপিকাতেও রহিয়াছে।

শ্লোকটি এই,—

আভীরসুভ্রুবাং শ্রেষ্ঠা রাধাবৃন্দাবনেশ্বরী।
অস্যাঃ সখ্যশ্চ ললিতা বিশাখাদ্যাঃ সুবিশ্রুতাঃ ॥

—৩১শ শ্লোক, পুরীদাস সং

মনোহর দাসের অনুরাগবল্লীতে গণোদ্দেশদীপিকাকে রূপকৃত বলা হইয়াছে। মনোহর দাস অনুরাগবল্লীতে লিখিয়াছেন,—

প্রথমে করিল কৃপা শ্রীহরি নাম।
তবে রাধাকৃষ্ণ দুই মন্ত্র অনুপাম ॥

পঞ্চ নাম শুনাইয়া সিদ্ধ নাম দিল।
শ্রীমণিমঞ্জরী গুরুমুখেতে শুনিল ॥
আপনার নাম কহে শ্রীগুণমঞ্জরী।
শ্রীরূপ স্বাক্ষর গণোদ্দেশ মধ্যে ধরি ॥ —৩য় মঞ্জরী

ইহার পর মনোহর দাস 'তথাহি' বলিয়া যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা মুদ্রিত লঘুগণোদ্দেশদীপিকাতেও পরিদৃষ্ট হয়। তবে পাঠের সামান্য ভেদ আছে।

পদকর্তা শেখর একটি পদে রক্তক পত্রক নামোল্লেখ করিয়াছেন।

রক্তক পত্রক যতেক সেবক
কানুর সিনান তরে।
সুগন্ধি শীতল নির্মল সলিল
বেদীর উপরে ধরে ॥ —পদকল্পতরু, ৪র্থ খণ্ড

রূপের গণোদ্দেশদীপিকা ছাড়া অন্যত্র এই নাম পরিদৃষ্ট হয় না। এই সমস্ত তথ্য হইতে অনুমান করা যায় যে রূপ এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার এই গ্রন্থখানি রূপের রচিত নহে বলিয়া যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা এই,—'এই গ্রন্থে ২৪৬ সংখ্যক শ্লোকের পর 'সম্মোহন তন্ত্র' হইতে রাধিকার সখীদের নাম উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীরূপ অপর কোন গ্রন্থে কোন তন্ত্রের মত উল্লেখ করেন নাই। শ্রীজীবের প্রদত্ত তালিকায় বারখানি গ্রন্থের মধ্যে কোথাও শ্রীরূপ স্পষ্টতঃ নিত্যানন্দের বন্দনা করেন নাই'।[১]

কিন্তু রূপের লঘুভাগবতামৃতে সম্মোহনতন্ত্রের উল্লেখ আছে (১৷৮০১, পুরীদাস সং)। ইহা ছাড়াও রূপ লঘুভাগবতামৃতে সাত্বততন্ত্র ও ভার্গবতন্ত্র এবং ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে বৈষ্ণবতন্ত্র ও কেবলতন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। জীব, সনাতন প্রভৃতির গ্রন্থেও অন্যান্য তন্ত্রের সঙ্গে সম্মোহন তন্ত্রেরও নাম পাওয়া যায়। সুতরাং কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকাতে সম্মোহন তন্ত্রের নাম থাকায় ইহা রূপরচিত নহে বলার যৌক্তিকতা নাই। আর নিত্যানন্দের নাম অন্যত্র দেখা যায় না সত্য কিন্তু এই বিষয়ে কোনরূপ সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া চলে না। কবিকর্ণপুর চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে গোপাল ভট্ট ও জীবের নাম করেন নাই কিন্তু গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় উঁহাদের নাম করিয়াছেন। রূপের উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীচৈতন্যের কোন নমস্ক্রিয়া নাই কিন্তু ঐ গ্রন্থের পূর্বে রচিত বিদগ্ধমাধব, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ললিতমাধব ইত্যাদিতে শ্রীচৈতন্যের বিশেষ বন্দনা আছে। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের নমস্ক্রিয়া নাই বলিয়া যেমন উজ্জ্বলনীলমণি রূপের রচিত নহে এমন বলা চলে না, তেমনই

[১] চৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃঃ ১৪৮-১৪৯

নিত্যানন্দের বন্দনা রহিয়াছে বলিয়া রূপ রচিত নহে এমন বলা সঙ্গত নহে। ইহা হইতে পারে যে, রূপ কেবল এই গ্রন্থটিতে মাত্র নিত্যানন্দকে বন্দনা করিয়াছিলেন।

গোবর্দ্ধন দাস তাঁহার শ্রীশ্রীব্রজধাম ও গোস্বামিগণ গ্রন্থে বলিয়াছেন, 'শ্রীজীব গোস্বামীপ্রভু তাঁহার শ্রীলঘুতোষণীর উপসংহারে শ্রীরূপগোস্বামীপ্রভুকৃত 'কৃষ্ণজন্মতিথেবিধিঃ' নামে যাহা অভিহিত করিয়াছেন তাহাই শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথিমহোৎসবাদি বা শ্রীকৃষ্ণাভিষেক নামে দৃষ্ট হয়' (পৃঃ ২৭৩)। এই তথ্য তিনি লঘুতোষণীর উপসংহার হইতে কি ভাবে পাইলেন তাহা বোঝা গেল না। জীব তাঁহার গ্রন্থের তালিকায় কৃষ্ণজন্মতিথিবিধির উল্লেখ করিয়া থাকিলে গ্রন্থটির কৃত্রিমতা-অকৃত্রিমতা সম্পর্কে কোন আলোচনাই করিতে হইত না।

জীবের শিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারীর শ্লোক উদ্ধার করিয়া নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকরে বলিয়াছেন 'কৃষ্ণজন্মতিথিবিধিবিধান অশেষ' (প্রথম তরঙ্গ)। বৃন্দাবনে ভক্তিবিদ্যালয়ে 'কৃষ্ণজন্মতিথিবিধির' একটি পুঁথি রহিয়াছে। পুষ্পিকাতে ইহা রূপকৃত বলা হইয়াছে—'ইতি কৃষ্ণজন্মতিথিমহোৎসববিধিঃ সম্পূর্ণতামগমৎ। শ্রীরূপগোস্বামিনা কৃতঃ'।

অফ্রেতের Leipzig Catalogue (No. 62) গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথিবিধির বার পত্রযুক্ত একটি পুঁথির বিবরণ আছে, তবে গ্রন্থকারের কোন নাম নাই। সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগারেও ইহার একটি পুঁথি রহিয়াছে (বৈ ২০)। কিন্তু গ্রন্থকারের কোন পরিচয় নাই।

এই গ্রন্থটি হরিদাস দাস কর্তৃক ৪৫৭ চৈতন্যাব্দে 'শ্রীকৃষ্ণাভিষেক' নামে এবং পুরীদাস কর্তৃক ৪৬২ গৌরাব্দে 'কৃষ্ণজন্মতিথিবিধি' নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থের প্রারম্ভিক শ্লোক এই,—

নত্বা বৃন্দাটবীনাথৌ প্রভূণাং বিনিদেশতঃ।
লিখ্যতে শাস্ত্রলোকাভ্যাং কৃষ্ণজন্মতিথেবিধিঃ ॥

'প্রভূণাং' এই শব্দে সনাতনই ব্যঞ্জিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। রূপ তাঁহার বিবিধপ্রকার মঙ্গলাচরণে সনাতনকে প্রভুপাদ, প্রভু, শ্রীমহাপ্রভু প্রভৃতি শব্দে আখ্যাত করিয়াছেন দেখা যায়। এখানে 'প্রভূণাং' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া গ্রন্থটি রূপেরই হওয়া সম্ভব মনে হয়।

হরিভক্তিবিলাসে পঞ্চদশবিলাসের ১৩৩ সংখ্যা হইতে ২৪০ সংখ্যা পর্যন্ত জন্মাষ্টমীব্রতবিধি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে, তৎসত্ত্বেও সনাতন রূপকে কৃষ্ণজন্মতিথিবিধি লিখিতে বলিবেন কেন?

তদুত্তরে বলা যায় যে হয়তো হরিভক্তিবিলাসের সংকলন হইবার পূর্বে সনাতনের ইচ্ছায় রূপ একটি সংক্ষিপ্তবিধি রচনা করিয়া থাকিবেন কিংবা হরিভক্তি-

বিলাসের পর কৃষ্ণজন্মতিথির মহাভিষেক প্রকরণটির প্রকৃষ্ট বর্ণনার উদ্দেশ্যে ইহা রচিত হয়।

হরিভক্তিবিলাসের জন্মাষ্টমী ব্রত প্রকরণের সহিত কৃষ্ণজন্মতিথিমহোৎসব-বিধির বর্ণিত বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনায় ইহার বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইবে। হরিভক্তিবিলাসে আছে, (১) জন্মাষ্টমী ব্রতের নিত্যতা, (২) উৎপত্তি, (৩) ভগবৎপ্রীণন, (৪) অকরণে প্রত্যবায়, (ক) ভোজনে প্রত্যবায়, (খ) উপবাসানন্তর পূজোৎসবাদি ব্রতত্যাগে প্রত্যবায়, (৫) জন্মাষ্টমী মাহাত্ম্য, (৬) জন্মাষ্টমী ব্রতনির্ণয়, (ক) রোহিণীযুক্তা জন্মাষ্টমী, (খ) অর্ধরাত্রি জন্মাষ্টমী, (গ) সপ্তমীবিদ্ধজন্মাষ্টমী ব্রতনিষেধ, (৭) জন্মাষ্টমী পারণ ফল নির্ণয়, (৮) জন্মাষ্টমী ব্রতবিধি, (৯) বিশেষ বিধি, (১০) অষ্টমীর প্রভাতকালে সংকল্পমন্ত্র, (১১) সূতিকাগৃহ নির্মাণ-বিধি, (১২) পূজোপক্রম, (১৩) পূজোমন্ত্র. (ক) স্নানমন্ত্র, (খ) বস্ত্রদানমন্ত্র, (গ) ধূপদানমন্ত্র, (ঘ) নৈবেদ্যমন্ত্র, (ঙ) চন্দ্রার্ঘ্যদানমন্ত্র, (চ) সংকল্প, (ছ) দেবকীপূজা মন্ত্র, (জ) কৃষ্ণপূজামন্ত্র, (ঝ) অর্ঘ্যপ্রদানমন্ত্র, (ঞ) দেবকীপূজা মন্ত্র, (ট) উক্ত চন্দ্রার্ঘ্য-দানের মন্ত্র, (ঠ) উক্ত কৃষ্ণার্ঘ্যদানের মন্ত্র, (ড) উক্ত স্নানমন্ত্র, (ঢ) পাদ্যাদিদীপাদি প্রদান মন্ত্র, (ণ) নৈবেদ্যদান মন্ত্র, (ত) উক্ত দ্রব্যাদিদানের মন্ত্র, (থ) প্রণামমন্ত্র, (দ) প্রার্থনামন্ত্র।

আর কৃষ্ণজন্মতিথিমহোৎসব বিধিতে আছে,—(১) জন্মাষ্টমীর পূর্ব দিবস সপ্তমীর পূর্বাহ্ণকালে স্নান বেদীপরিক্রিয়া, (২) মঙ্গলবাদ্যগীতপূর্বক অঙ্গনে খাত খনন, চতুষ্কোণে কদলীস্তম্ভরোপণ, চন্দ্রাতপ ও পতাকারোপণ, মাঙ্গলিক দ্রব্যস্থাপন, (৩) জয়ন্তীদিন প্রাতঃকালে বৈষ্ণববৃন্দসহ বাদ্যাদি নৃত্যকীর্তনসহকারে দীপ ও মঙ্গলঘটাদিতে সুশোভিত স্নানবেদিকায় ছত্রচামরাদিদ্বারা সেবিত শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন, (৪) স্বস্তিবাচন ও প্রার্থনা, (৫) ভূতশুদ্ধি, (৬) ঘটস্থাপন, (৭) মহাভিষেকবিষয়ে সংকল্প ও প্রার্থনা, (৮) আসনাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণার্চন, (৯) পাদ্যাদি দীপান্ত বৈদিক মন্ত্র, (১০) বিবিধবিধানে স্নানপ্রক্রিয়া ও তদ্বিষয়ে মন্ত্র, (১১) অঙ্গমার্জন, বস্ত্রপরিধান ও যজ্ঞসূত্র নিবেদন, (১২) নির্মঞ্ছন, নয়নাঞ্জন ও তিলকরচনা, (১৩) পুষ্পমাল্য অষ্টোপচারাদি নিবেদন, (১৪) মহানীরাজন, (১৫) আরাত্রিক মন্ত্র, (১৬) শ্রীকৃষ্ণস্তব।

কৃষ্ণদাস অধিকারীর উক্ত 'প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা' নামক গ্রন্থটির কোনও পরিচয় বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও পাওয়া যায় নাই। হরিদাস দাস ৪৬৮ গৌরাব্দে 'প্রযুক্তাখ্যাতমঞ্জরী' নামে একটি গ্রন্থ রূপ প্রণীত বলিয়া প্রকাশ করেন এবং ইহাই রূপকৃত 'প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা বলেন। তিনি বরাহনগরের গ্রন্থমন্দিরের পুঁথি (ব্যাকরণ ১৮ নং) ও জয়পুরের গোবিন্দগ্রন্থাগারের পুঁথি অবলম্বনে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে, এইরূপ বলেন।

বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরের পুঁথিতে রূপ লিখিত বলিয়া কোন পুষ্পিকা নাই। মুদ্রিত গ্রন্থের সহিত সাদৃশ্য আছে। উপসংহার শ্লোক হইতে গ্রন্থটি রূপের বলিয়া আদৌ প্রতিভাত হয় না। উপসংহারে শ্লোকটি নিম্নরূপ,—

মুদা যথার্থ নাম্নীয়ং কবিসারঙ্গরঙ্গদা।
সেব্যতাং কোবিদগণৈঃ প্রযুক্তাখ্যাতমঞ্জরী ॥

হরিদাস দাস ভূমিকায় বলিয়াছিলেন যে 'প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকেতি শ্রীরূপগোস্বামী পাদকৃত—গ্রন্থনাম বিমর্ষে তথাখ্যাতচন্দ্রিকাভূমিকায়াং কবি সারঙ্গ কর্তৃকায়াশ্চ জাতে সংকলনেঽস্যা হতাঽদরোভবম্। জয়পুরীর গ্রন্থালয়ে খলু শ্রীমৎ শ্রীরূপহস্তাক্ষরৈঃ স্থলবিশেষে চূর্ণিকাসমাযুক্ত্যাং পুস্তিকাং দৃষ্ট্বা এষৈব শ্রীরূপপাদকৃতেতি মে সম্মতং মতম্। উপসংহারস্থিতস্য কবিসারঙ্গরঙ্গদেতি পদস্য সারঙ্গতি নাম কবের্নেতি নির্ণয়োঽপি সঞ্জাতঃ। গৌড়ীয়বৈষ্ণবসাহিত্যে সারঙ্গরঙ্গদেতি রসিকরঙ্গদেতি টীকা-নামৈবাসকৃদ্দৃশ্যতে। অতো গ্রন্থোঽয়ং শ্রীরূপপাদকৃত ইতি স্থিরো বিশ্বাসঃ জাতঃ। গীর্বাণবাণী প্রণয়িনাং প্রীতয়েঽধুনাস্য মুদ্রণং কৃতম্ শ্রীপাদহস্তলেখ প্রতিবিম্বসমুল্ল-সিতমিতি যেনাস্য প্রণয়িতৃবিষয়ক সন্দেহলেশোঽপি ন স্যাদিতি'।

রূপের হস্তাক্ষর বলিয়া যাহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা প্রকৃতই রূপের হস্তাক্ষর কিনা তাহার কোনরূপ প্রমাণ নাই। সুতরাং এই গ্রন্থকে রূপের রচিত বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না।

কৃষ্ণদাস অধিকারীর প্রদত্ত গ্রন্থগুলির প্রামাণিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হইল। এখন জীবপ্রদত্ত তালিকা অনুসারে রূপের গ্রন্থগুলির পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

হংসদূত—জীবকৃত গ্রন্থতালিকার প্রারম্ভেই হংসদূত থাকায় ইহাই রূপের কবি প্রতিভার সর্বপ্রথম অবদান মনে হয়। অবশ্য জীবকৃত তালিকা কালক্রম অনুসারে লিখিত হয় নাই। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নাটকচন্দ্রিকার উল্লেখ আছে সুতরাং তালিকাতে এই গ্রন্থের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্বে স্থান পাওয়া উচিত ছিল কিন্তু তাহা পায় নাই। হংসদূতের মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্যের নমস্ক্রিয়া নাই। হংসদূতের উপান্ত্যশ্লোকে যে 'সাকরতয়া' শব্দটি আছে তাহা যে সনাতন গোস্বামীর সাকরমল্লিক উপাধিকেই সূচিত করিয়াছে তাহা পূর্বে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের পর দুই ভাই রাজকীয় উপাধি ত্যাগ করেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের পর রচিত গ্রন্থে রূপ কখনো 'বিদিত সাকরতয়া' লিখিতে পারেন না। তাই গ্রন্থটিকে শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের পূর্বে রচিত বলিয়া মনে করা যাইতেছে।

হংসদূতের বিষয়বস্তু এই, অক্রূরের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ গোকুল ছাড়িয়া মথুরায়

গমন করিলে রাধা অত্যন্ত বিরহসন্তপ্তা হন। একদিন বিরহিণী রাধা বিরহবেদনা প্রশমিত করিবার জন্য যমুনাতীরে গমন করেন। যমুনাতীরে গিয়া পূর্ব পরিচিত কুঞ্জভবনাদি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিতে উদ্দীপ্ত হইয়া পড়েন এবং শোকাবেগে মূর্ছিত হন। সখীগণ রাধার এই দশা দেখিয়া নানাবিধ উপায়ে তাঁহার প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পদ্মপত্ররচিত শয্যায় রাধাকে শয়ন করাইয়া সখী ললিতা যখন ঘাটে পা দিয়াছেন, তখন একটি হংসকে যমুনাতীরের দিকে আসিতে দেখিলেন। মুহূর্তমধ্যে সখীগণের অন্যতমা ললিতা হংসটিকে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূত করিয়া পাঠাইবার সংকল্প করিয়া ফেলিলেন। হংসকে সম্বোধন করিয়া ললিতা তখন কৃষ্ণবিরহে রাধার যে যে অবস্থা হইয়াছে তাহা কৃষ্ণকে জানাইবার জন্য বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন এবং মথুরা গমনকালে হংসের কোন্ কোন্ লীলাস্থলী নয়নগোচর হইবে তাহারও একটী সুন্দর বর্ণনা দিলেন। বস্ত্রহরণ ঘাটের কদম্ববৃক্ষ, রাসস্থলী, গোবর্ধন, ভাণ্ডীরবট, ব্রহ্মার স্তবস্থান, কালীয়হ্রদ, কেকাধ্বনিমুখরিত বৃন্দারণ্য প্রভৃতি সমস্ত কিছু বিষয়ে বলিয়া মথুরানগরী প্রবেশ এবং তথাকার শোভা ও ঐশ্বর্যের বর্ণনা করিলেন। তারপর মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট অনুকূল অবসরে বিরহিণী রাধার সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে বৃন্দাবনে আসেন তাহার চেষ্টা করিতে বলিয়া দিলেন। সর্বশেষে, কোমলহৃদয় হংসবর ব্রজললনাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া মথুরায় গমনপূর্বক দৌত্যকার্য করিবেন এই আবেদন জানাইয়া ললিতা তাহার বক্তব্য সমাপ্ত করিয়াছেন।

কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে পবনদূত, ভ্রমরদূত প্রভৃতির ন্যায় হংসদূত রচিত হইলেও ইহাতে রূপগোস্বামীর কবিপ্রতিভার অনুপম নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহা বৈষ্ণব প্রেমকাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কালিদাস যেমন বিরহী যক্ষের মর্মন্তুদ বেদনাকে তাঁহার কাব্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তেমনি রূপও বিরহিণী রাধা ও গোপললনাদের বিধুর হৃদয়ের সুন্দর পরিচয় ইহাতে আঁকিয়াছেন।

শিখরিণী ছন্দে রচিত ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৪২। সমস্ত মুদ্রিত সংস্করণেই ১৪২টি শ্লোকই রহিয়াছে। কেবলমাত্র বসুমতী সংস্করণে ইহার শ্লোকসংখ্যা ১০১টি দেখা যায়। হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিগুলিতে ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৪২টি রহিয়াছে (বরাহনগর পুঁথি নং ২২৭-২৩৩, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুঁথি নং ৪৭৬-৫০৯, ১৪৫০, ১৪৯৪ ইত্যাদি)। সতরাং ১৪২টি শ্লোকেই রূপ ইহা রচনা করিয়াছিলেন মনে করিতে পারা যায়।

হংসদূতের প্রচুর টীকার পরিচয় পাওয়া যায়। গোপাল চক্রবর্তী কৃত একটি টীকাযোগে হংসদূতকাব্য কৃষ্ণদাস বাবাজী কুসুমসরোবর হইতে দেবনাগরীতে প্রকাশ

করিয়াছেন (সম্বৎ ২০১৪)। টীকাটি বেশ প্রাচীন। মাদ্রাজের Govt. Oriental Mss. Library-র Triennial Catalogue গ্রন্থে (Vol. IV, Part I, Sanskrit A. R. No. 2991) একটি টীকার উল্লেখ আছে। পুষ্পিকা এইরূপ,—

'ইতি শ্রীমধুমিশ্র বিরচিতা শ্রীরূপসনাতনকৃতস্য হংসদূতস্য টীকা সমাপ্তা'। টীকাকার সনাতনের নাম সংযোগ করিলেন কেন বোঝা যাইতেছে না। রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার Notices of Sanskrit Mss. গ্রন্থে (Vol. IV, p. 57 No. 2947) একটি টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। পুষ্পিকায় আছে,—'ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী বিরচিতা হংসদূত টীকা সমাপ্তা'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার Notices of Sanskrit Mss. গ্রন্থে (Second series, Vol. II, p. 229 No. 262) রামশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় কৃত ও Descriptive Cat. of Skt. Mss. of Asiatic Society of Bengal (Vol. VII, p. 57 No. 3750) গ্রন্থে নৃসিংহ কৃত দুইটি টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। বরাহনগরের গ্রন্থমন্দিরে হংসদূতের একটি টীকার পরিচয় পাওয়া যায় (পুঁথি নং ২৩৩)। পুষ্পিকা এইরূপ— 'ইয়ং শ্রীরূপবিরচিতা ভাববিবৃতিং প্রমোদং সাধূনাং রচয়তু রাগস্বাদমধুরং ইতি সদ্বৈদ্যকুলোদ্ভব শ্রীকণ্ঠাভরণ কবিরাজ বিরচিতা হংসদূত টিপ্পনী সম্পূর্ণা'।

উদ্ধবসন্দেশ—হংসদূতে হংসকে রাধার সখী ললিতা দূতরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যেরূপ পাঠাইয়াছিলেন, উদ্ধবসন্দেশেও অনুরূপভাবে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে উদ্ধবকে দূতরূপে প্রেরণ করেন। উদ্ধবের দ্বারা সন্দেশ বা বার্তা আনীত হইয়াছিল বলিয়াই গ্রন্থের নাম উদ্ধবসন্দেশ। গ্রন্থটি শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের পূর্বে কিংবা পরে রচিত তাহা সঠিক করিয়া বলা যায় না। গ্রন্থের উপান্ত্য শ্লোকে রূপ এই নামটি দেখিয়া কেহ কেহ ইহাকে শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের পরবর্তী রচনা বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে রূপ শ্রীচৈতন্যপ্রদত্ত নাম। সুতরাং উপান্ত্য শ্লোকে 'রূপ' শব্দের প্রয়োগ হইতে ইহা শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাতের পরবর্তী রচনা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। উদ্ধবসন্দেশের উপান্ত্য শ্লোকটি নিম্নরূপ,—

গোষ্ঠক্রীড়োল্লসিতমনসো নির্ব্যলীকানুরাগাৎ
কুর্বাণস্য প্রথিত মথুরামণ্ডলে তাণ্ডবানি।
ভূয়ো রূপাশ্রয়পদসরোজন্মনঃ স্বামিনোহয়ং
তস্যোন্দামং বহতু হৃদয়ানন্দপূরং প্রবন্ধঃ॥

অর্থাৎ অকৃত্রিম অনুরাগ হেতু যাঁহার অন্তর গোষ্ঠবিহারে উল্লসিত, মথুরামণ্ডলে যিনি তাণ্ডবনৃত্যমগ্ন, যাঁহার পাদপদ্ম শ্রীর আশ্রয়, সেই প্রাণনাথ কৃষ্ণের এই প্রবন্ধ পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে আনন্দপ্রবাহ প্রবাহিত করুক।

'রূপাশ্রয়' শব্দের অর্থ কেহ কেহ শ্রীরূপের আশ্রয় করিয়াছেন।[১] কিন্তু শব্দটি যে রূপকে ব্যঞ্জিত করিতেছে তাহা দৃঢ় করিয়া বলা যায় না। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর উদ্ধবসন্দেশের যে টীকা করিয়াছেন তাহাতে 'রূপাশ্রয়' শব্দের শ্রীরূপ অর্থ করেন নাই। তিনি 'ভূয়ো রূপাণাং প্রভূতশ্রিয়াম্ আশ্রয়ং পদসরোজন্মনঃ পাদপদ্মং যস্য' এইরূপ টীকা করিয়াছেন (কাব্যসংগ্রহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৭)। কৃষ্ণদাস বাবাজী কুসুমসরোবর হইতে টীকাযোগে উদ্ধবসন্দেশ প্রকাশ করেন। টীকাটির রচনাকাল সম্বৎ ১৮২৪ মার্গশির মাস। ইহাতেও টীকাকার 'রূপাশ্রয়' শব্দের অর্থ শ্রীরূপ করেন নাই দেখা যায়।

তাহা ছাড়া, রূপ নামটি শ্রীচৈতন্যপ্রদত্ত তাহা যে দৃঢ়তার সহিত বলা চলে না তাহা পূর্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

শ্রীচৈতন্যের নমস্ক্রিয়া নাই দেখিয়া যাঁহারা ইহাকে শ্রীচৈতন্যসাক্ষাৎকারের পূর্ববর্তী রচনা বলেন, তাঁহাদের যুক্তিও খুব দৃঢ় নহে কারণ উজ্জ্বলনীলমণি শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের বহু পরে রচিত হওয়া সত্ত্বেও ইহাতে শ্রীচৈতন্যের কোন নমস্ক্রিয়া নাই। উদ্ধবসন্দেশ মন্দাক্রান্তা ছন্দে ১৩১টী শ্লোকে রচিত। হংসদূতে হংসকে দূত করিয়া পাঠানোর মধ্যে রূপ যেমন মৌলিক কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন, উদ্ধবসন্দেশে কিন্তু উদ্ধবকে দূত করিয়া পাঠানোর মধ্যে রূপের কল্পনার তেমন কোন নিজস্বতা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের

গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নঃ প্রীতিমাবহ।
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্বিমোচয় ॥—১০।৪৬।৩

এই শ্লোকটির অবলম্বনেই এই গ্রন্থের নামকরণ ও বিষয়বস্তুর সংকলন হইয়াছে স্পষ্টতঃ ধারণা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত উদ্ধব কাহিনীকে রূপ এখানে বিস্তারিত-ভাবে রচনা করিয়াছেন। বিরহিণী গোপাঙ্গনাদের প্রগাঢ় প্রীতির কথা স্মরণ করিয়া প্রেমবিহ্বল শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে মথুরা হইতে বৃন্দাবনে দূত করিয়া পাঠাইতেছেন। অক্রূরের অনুরোধে বৃন্দাবন পরিত্যাগপূর্বক মথুরায় আসিলেও শ্রীকৃষ্ণ যে গোপিনীদের বিস্মৃত হন নাই, মথুরায় যত সুখেই তিনি থাকুন না কেন, বৃন্দাবনই যে তাঁহার প্রিয় স্থান, তাহা উদ্ধবকে জানাইতে বলিতেছেন। কোন পথে কি কি লীলাস্থান দর্শন করিতে করিতে উদ্ধবকে ব্রজে যাইতে হইবে, তাহারও বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে। ইহার পর বৃন্দাবনে গিয়া কি ভাবে প্রিয় সখাগণকে আলিঙ্গন; নন্দ যশোদাকে প্রণাম; চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ধন্যা, শ্যামলা, পদ্মা, ললিতা, ভদ্রা ও শৈব্যা প্রভৃতি গোপীগণকে সান্ত্বনা প্রদান এবং বিরহে কৃশীভূতা রাধাকে বৈজয়ন্তীমালা

১ শ্রীশ্রীব্রজধাম ও গোস্বামিগণ, পৃঃ ২৭১

স্পর্শ করাইয়া চৈতন্য সম্পাদন করিতে হইবে তদুচিত উপদেশ দান করিয়া বক্তব্যের উপসংহার করিয়াছেন।

হংসদূত অপেক্ষা উদ্ধবসন্দেশের ভাষা ও অলংকারের অপূর্বত্ব অধিকতর চিত্তগ্রাহী। প্রতিটি শ্লোকই সুমধুর রস ও সুগভীর ভাবে পূর্ণ বলা যাইতে পারে। আবেগের আন্তরিকতায় এবং কারুণ্যপ্রকাশের বিস্ময়করতায় দূতকাব্যের মধ্যে এইগ্রন্থ একটি উল্লেখ্য স্থান গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে।

ইহার বেশি টীকা নাই। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে একটি সটীক উদ্ধবসন্দেশের পুঁথি আছে। টীকাকারের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

ছন্দোঽষ্টাদশকম্—এই ছন্দোঽষ্টদশকং কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয় নাই। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত স্তবমালার অন্তর্ভুক্ত নন্দোৎসবাদিচরিতং হইতে আরম্ভ করিয়া রঙ্গস্থলক্রীড়া নামক যে তেইশটি লীলাবর্ণনামূলক কবিতা রহিয়াছে তাহাই ছন্দোঽষ্টদশকম্। স্তবমালার 'অথ নন্দোৎসবাদি চরিতম্' স্তবের দ্বিতীয় শ্লোকে আছে,—

নন্দোৎসবাদয়স্তাঃ কংসবধান্তা হরের্মহালীলাঃ।
ছন্দোভির্ললিতাঙ্গৈরষ্টদশাভিনিরূপ্যন্তে॥

অর্থাৎ নন্দোৎসবাদি হইতে আরম্ভ করিয়া কংসবধ পর্যন্ত হরির মহালীলাসমূহ অষ্টাদশ ছন্দে নিরূপিত হইতেছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে ইহাকেই 'অষ্টাদশ-লীলাচ্ছন্দ' বলিয়া থাকিবেন।

দানকেলিকৌমুদী আর বহু স্তবাবলী।
অষ্টাদশ-লীলাচ্ছন্দ, আর পদ্যাবলী॥ —চৈ. চ. ২।১।৩৪

রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ এই ছন্দোঽষ্টাদশককে যে সনাতনকৃত দশমচরিত বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন তাহা পূর্বে দেখাইয়াছি। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত স্তবমালা সংখ্যায় তেইশটি হইলেও আসলে ইহাতে (১) নন্দোৎসবাদি চরিত, (২) শকটতৃণাবর্তভঙ্গাদি (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন শকটারিষ্টদৈত্যবধ, তৃণাবর্ত বধ, নামকরণ সংস্কার, মৃদ্‌ভক্ষণ লীলা ও দধিহরণ এই পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন), (৩) যমলার্জুনভঞ্জন, (৪) বৃন্দাবনগোবৎসচারণাদিলীলা, (৫) বৎস-হরণাদিচরিত, (৬) তালবনচরিত, (৭) কালিয়দমন, (৮) ভাণ্ডীর ক্রীড়নাদি, (৯) বর্ষাশরদ্বিহারচরিত, (১০) বস্ত্রহরণ, (১১) যজ্ঞপত্নীপ্রসাদ, (১২) গোবর্ধনোদ্ধরণ, (১৩) নন্দাপহরণ, (১৪) রাসক্রীড়া, (১৫) সুদর্শনাদি মোচনং শঙ্খচূড়নিধনঞ্চ, (১৬) গোপিকাগীত, (১৭) অরিষ্টবধাদি, (১৮) রঙ্গস্থলক্রীড়া—এই আঠারটি স্তব রহিয়াছে। 'নন্দোৎসবাদি চরিতম্'-এর টীকায় বলদেব বিদ্যাভূষণ ইহা রূপকৃতই

বলিয়াছেন (ভগবল্লীলাং বর্ণয়িষ্যন্ শ্রীরূপোভগবন্নামোৎকর্ষং মঙ্গলমাচরতি জীয়াদিতি)। এবং রসস্থলক্রীড়ার শেষে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

যদ্বিদ্যাভূষণোঽয়ং হরিচরিতভৃতাং ভাষ্যমষ্টাদশানাং
দিব্যদ্বৃব্যঙ্গ্যং ব্যতানীৎ ফণিপতিগুণিনাং ছন্দসাং সপ্রমাণম্।
তেনাস্মিন্ কৃষ্ণদেবঃ স্বকৃতরুচিধরো রূপদেবশ্চ ভূয়াৎ
সদ্বর্গশ্চাপি তীব্রশ্রমগুণনপটুস্তুষ্টিমানেবসদ্যঃ ॥

অর্থাৎ যেহেতু এই বিদ্যাভূষণ হরিলীলাপূর্ণ অনন্তগুণবিশিষ্ট অষ্টাদশ ছন্দের প্রমাণসহিত ভক্তিযুক্তভাষ্য রচনা করিয়াছেন, সে কারণে প্রচুর শ্রমে নিপুণ, নিজ-লীলায় রুচিবিশিষ্ট ভগবান কৃষ্ণ, নিজরচনায় রুচিবিশিষ্ট রূপ এবং স্বপ্রণোদিত রুচিবিশিষ্ট সজ্জনগণও ইহার প্রতি সন্তুষ্ট হউক।

স্তবমালা—রূপরচিত বহু স্তব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। জীব সেইগুলিকে একত্র করিয়া মালার আকারে গ্রন্থনা করেন এবং স্তবমালা নাম দেন। তিনি গ্রন্থ প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

শ্রীমদীশ্বর রূপেন রসামৃতকৃতা কৃতা।
স্তবমালানুজীবেন জীবেন সমগৃহ্যত ॥
পূর্বং চৈতন্যদেবস্য কৃষ্ণদেবস্য তৎপরম্।
শ্রীরাধায়াস্ততঃ কৃষ্ণরাধয়োর্লিখ্যতে স্তবঃ ॥
বিরুদাবলী ততো নানাচ্ছন্দোভিঃ কেলিসংহতিঃ।
ততশ্চিত্রকবিত্বানি ততো গীতাবলী ততঃ ॥
ললিতাযমুনা বৃষ্ণিপুরী শ্রীহরিভূভৃতাম্।
বৃন্দাটবী কৃষ্ণনাম্নোঃ ক্রমেণ স্তবপদ্ধতিঃ ॥

অর্থাৎ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুরচয়িতা আমার ঈশ্বর রূপ রচিত স্তবমালা ক্ষুদ্রজীব কর্তৃক সংগৃহীত হইল। প্রথমে শ্রীচৈতন্যদেবের, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের, তৎপরে শ্রীরাধার, তৎপরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলস্তব, তৎপরে বিরুদাবলী ও নানাবিধচ্ছন্দে নন্দোৎসব হইতে কংসবধ পর্যন্ত লীলাসমূহ, তৎপরে চক্রবন্ধাদিচিত্রকাব্য, তৎপরে গীতাবলী, তৎপরে ক্রমে ক্রমে ললিতা, যমুনা, মথুরাপুরী, গোবর্ধন, বৃন্দাবন ও কৃষ্ণনামের স্তবপদ্ধতি লিখিত হইতেছে— (১) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রীচৈতন্যাষ্টক, (২) মহানন্দাখ্য স্তোত্র, (৩) লীলামৃতনামদশক, (৪) প্রেমেন্দুসাগর, (৫) কেশবাষ্টক, (৬) কুঞ্জবিহার্যাষ্টক, (৭) মুকুন্দাষ্টক, (৮) ব্রজনবযুবরাজাষ্টক, (৯) প্রণাম প্রণয়াখ্যস্তব, (১০) হরিকুসুমস্তবক, (১১) গাথাচ্ছন্দঃস্তব, (১২) ত্রিভঙ্গীপঞ্চক, (১৩) মুকুন্দমুক্তাবলী, (১৪) আনন্দচন্দ্রিকাখ্য রাধাদশনাম স্তোত্র, (১৫) প্রেমেন্দুসুধা, (১৬) রাধাষ্টক, (১৭) প্রার্থনাপদ্ধতি, (১৮) চাটুপুষ্পাঞ্জলি, (১৯) গান্ধর্বাসংপ্রার্থনাষ্টক,

(২০) রাধাকৃষ্ণনামযুগলাষ্টক, (২১) ব্রজনবীনযুবদ্বন্দ্বাষ্টক, (২২) কার্পণ্যপঞ্জিকা, (২৩) উৎকলিকাবল্লরী, (২৪) গোবিন্দবিরুদাবলী, (২৫) ছন্দোহষ্টাদশক, (২৬) স্বয়মুৎপ্রেক্ষিতলীলা, (২৭) ললিতোক্ততোটকাষ্টক, (২৮) চিত্রকবিত্বানি, (২৯) গীতাবলী, (৩০) ললিতাষ্টক, (৩১) যমুনাষ্টক, (৩২) মথুরাষ্টক, (৩৩) গোবর্ধনাষ্টক, (৩৪) বৃন্দাবনাষ্টক, (৩৫) কৃষ্ণনামাষ্টক।

এই সমস্ত স্তব, স্তোত্রগুলির মধ্যে কেবলমাত্র উৎকলিকাবল্লরীর রচনাকাল ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়।

চন্দ্রাশ্বভুবনে শাকে পৌষে গোকুলবাসিনা।
ইয়মুৎকলিকাপূর্বা বল্লরী নির্মিতা ময়া॥

অর্থাৎ ১৪৭১ শকের পৌষ মাসে গোকুলে অবস্থানকারী আমাকর্তৃক এই উৎকলিকাবল্লরী রচিত হইল। উৎকলিকাবল্লরী স্তবমালার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় প্রমাণিত হয় যে ইহা জীব কর্তৃক অন্ততঃ ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দের পরে সংকলিত হইয়াছিল।

রূপ বর্তমানে জীব ইহা সংকলন করিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না। গ্রন্থকার বর্তমানে গ্রন্থকার কর্তৃক সংকলিত হইবার সম্ভাবনাই বেশী। সেক্ষেত্রে জীব কর্তৃক সংকলিত হওয়ায় মনে হয় রূপের তিরোভাবের পর ইহা সংকলিত হইয়াছিল। স্তবমালার বিভিন্ন স্তবে রূপের আলংকারিক নৈপুণ্য ও কবিকল্পনার বৈচিত্র্য পরিদৃষ্ট হইবে। স্তোত্রগুলির অধিকাংশই পরিমিত এবং রচনার দিক দিয়া অতিশয় গাঢ়বন্ধ। বক্তব্যের রমণীয়তা যে পরিমাণে দৃষ্ট হয়, হৃদয়ের আবেগ সে পরিমাণে কিঞ্চিৎ ন্যূন লক্ষিত হয়। এই সমস্ত স্তব, স্তোত্রের মধ্যে গোবিন্দবিরুদাবলী অধিকতর আকর্ষণীয়। ইহার শব্দ, কলাকৌশল, শ্রুতিসুখকর অনুপ্রাসঝংকার পরবর্তীকালে অনেককে প্রভাবিত করিয়াছিল। কবিকর্ণপূরের 'আনন্দবৃন্দাবন', জীবের 'বিরুদাবলী', বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'নিকুঞ্জকেলি বিরুদাবলী', রঘুনন্দন গোস্বামীর 'গৌরাঙ্গবিরুদাবলী' প্রভৃতি রূপ গোস্বামীর এই গোবিন্দবিরুদাবলীর আদর্শেই যে রচিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই।

গীতাবলী—স্তবমালার অন্তর্ভুক্ত গীতাবলীকে রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সনাতনের রচিত বলিয়াছেন।[১] কয়েকখানি পুঁথিতেও ইহা সনাতন বিরচিত বলা হইয়াছে। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ৪৯৯, ৬৪২, ১১২০, ১১৩৬ ; সংস্কৃত কলেজ পুঁথি নং ২৮, ২৯ ইত্যাদি)।

[১] রূপসনাতন শিক্ষামৃত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৮

পদকর্তা গোপীকান্ত দাস লিখিয়াছেন,—

শ্রীল সনাতন কয়ল গীতাবলী
বিবিধ ভকতরঙ্গী।—কীর্তনানন্দ

কীর্তনানন্দ সংকলয়িতা গৌরসুন্দর দাসও লিখিয়াছেন,—

গোসাঞি সনাতন কয়ল গীতাবলী
শুনইতে উনমিত চিত।—কীর্তনানন্দ

রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রে উদ্ধৃত গীতাবলীর গীতগুলির ভাষ্য করিতে যাইয়া গীতগুলিকে সনাতনের রচিত বলিয়াছেন।[১] ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত গীতাবলীর সুবোধিনী নামে একটি টীকা পাওয়া যায় (সংস্কৃত কলেজ পুঁথি নং বৈ ২৯)। টীকাকার গীতাবলীকে সনাতন কৃতই বলিয়াছেন।

স্তবমালা জীব সংকলিত করিয়াছিলেন। রূপের স্তবসংগ্রহের মধ্যে সনাতন রচিত স্তবকে তিনি স্থান দিতে পারেন না। সুতরাং স্তবমালার অন্তর্ভুক্ত গীতাবলী রূপেরই লেখা বলিয়া প্রমাণিত হয়। সতীশচন্দ্র রায় গীতাবলী রূপের লেখা বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—'পদকল্পতরুর উদ্ধৃত সংস্কৃতের শব্দগুলিতে ইনি বিনয়বশতঃ নিজ নামের ভণিতা না দিয়া সুকৌশলে তাঁহার পূজনীয় অগ্রজ সনাতনের নাম সংযুক্ত করিয়াছেন'।[২]

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার লিখিয়াছেন, '৩ সংখ্যক গীতে সুহৃৎ সনাতন, ১৩ সংখ্যক গীতে সনক সনাতন বর্ণিত চরিতে, ২০ সংখ্যক গীতে গিরিশ সনাতন সনন্দন প্রভৃতি বাক্য দেখিয়া মনে হয় ইহা শ্রীরূপেরই লেখা। কেননা শ্রীরূপ ললিতমাধবের প্রথম অঙ্কের সপ্তম শ্লোকে সনাতনকে 'সনকাদীনং তৃতীয়ঃ পুরা' বলিয়াছেন। সনাতন নিজে গীতাবলী লিখিলে সনকাদির সহিত নিজের নাম ভণিতাচ্ছলে উল্লেখ করিতেন না।[৩] ডঃ মজুমদার যাহা বলিয়াছেন তাহা খুবই যুক্তিপূর্ণ। সনাতন প্রকৃতই নিজেকে এভাবে শ্লাঘনীয় ঘোষণা করিতে পারেন না।

বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার 'স্তবমালাবিভূষণ' টীকায় গীতাবলীকে রূপের লেখাই বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, 'গাথাশ্চত্বারিংশদেকাধিকা যো ব্যাচষ্ট শ্রীরূপ-দিষ্টাঃ প্রযত্নাৎ'।

রঘুনাথ ভট্টের শিষ্য গদাধর ভট্টের বংশীয় গোবর্ধন ভট্ট ৪১টি শ্লোকে রূপ-

[১] রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত, ২য় সং, পৃঃ ১৬-১৭
[২] পদকল্পতরু, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২০৪
[৩] চৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃঃ ১৪২

সনাতনের মহিমাজ্ঞাপক একটি স্তোত্র রচনা করিয়াছেন। উহাতেও গীতাবলী শ্রীরূপের রচনা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।[১]

শ্লোকটি এই,—

শ্রীগোবর্দ্ধনযজ্ঞবৈভবভরং শ্রীরাসলীলোৎসবম্
শ্রীরাধাভিসৃতিং কৃতব্রজবধূন্মাদাং প্রমাদান্বিতান্।
গীতালীং ললিতাষ্টকং নিরূপম শ্রীকৃষ্ণনামস্তুতিং
রূপঃ স্বীয়কৃতে দয়ালমুকুটঃ প্রাদুশ্চকার প্রভুঃ॥

অর্থাৎ রূপ স্বরচিত গ্রন্থে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজাবৈভবসমূহ, শ্রীরাসলীলোৎসব, শ্রীরাধার অভিসার, গীতাবলী, শ্রীললিতাষ্টক, নিরূপম শ্রীকৃষ্ণস্তুতি প্রভৃতি প্রকাশিত করিয়াছেন। গোবর্ধন ভট্ট সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন সুতরাং তাঁহার উক্তির প্রামাণিকতা যথেষ্ট রহিয়াছে। এই সব কারণে গীতাবলীকে রূপকৃত বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সনাতনকে রচয়িতা বলিবার কারণ মনে হয়, পুঁথিকার ও পদকর্তারা ভণিতায় সনাতন নাম দর্শনে ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর রাধামোহন ঠাকুরের ক্ষেত্রেও এই বিভ্রান্তি দেখা দিয়াছিল। বলদেব বিদ্যাভূষণ গীতসংখ্যা একচল্লিশটি বলিয়াছেন। কিন্তু প্রায় সকল পুঁথিতে ও মুদ্রিত সংস্করণে গীতসংখ্যা ৪২টি দেখা যায়।

জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুসরণে রূপ গীতাবলী রচনা করিয়াছেন। জয়দেব গীতগোবিন্দে যেমন শ্রবণরুচির শব্দাবলীকে পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট করিয়া অপূর্ব ধ্বনিঝংকারের সৃষ্টি করিয়াছেন, রূপও গীতাবলীতে তাহাই করিয়াছেন। করম্বিত, কূজিত, কলিত প্রভৃতি বহু শব্দ রূপ জয়দেব হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। স্পষ্টতঃই ভাবে ও ভাষায় জয়দেবের অনুবর্তী হইলেও রূপের মৌলিকতাও অবশ্য ইহাতে বহুল পরিমাণে লক্ষিত হইবে। বিশেষতঃ, রাধাকৃষ্ণলীলাবিলাসের নানাবিধ পরিকল্পনা রূপের সম্পূর্ণ নিজস্ব। গীতাবলী যে তৎকালীন পাঠক বা শ্রোতাদের নিকট বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পদাবলীসংকলন গ্রন্থগুলি। গীতাবলী অল্পবিস্তর প্রায় সমূহ পদাবলীসংকলনে স্থান লাভ করিয়াছে। সর্বমোট ৪২টি গীতের মধ্যে ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে এগারটি, পদামৃতসমুদ্রে, গীতচন্দ্রোদয়ে ও কীর্তনানন্দে কয়েকটি এবং পদকল্পতরুতে তেত্রিশটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

বিদগ্ধমাধব—চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে যে শ্রীচৈতন্যের আদেশে বৃন্দাবনে আসিবার পর রূপ কৃষ্ণলীলাকে অবলম্বন করিয়া একটি নাটক লিখিতে মনঃস্থ করেন। তিনি নীলাচলে যাত্রা আরম্ভ করিবার পূর্বেই বৃন্দাবনে নাটকের মঙ্গলাচরণ

১ গৌড়ীয় ১৩৪৮, ২৭শে অগ্রহায়ণ, পৃঃ ২৫৪

ও নান্দীশ্লোক লিখিয়া ফেলেন। নীলাচলে আসিবার কালে পথে রূপ দেবী সত্যভামার নিকট কৃষ্ণলীলাকে ব্রজ এবং পুর এই দুইভাবে পৃথক লিখিবার স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন। শ্রীচৈতন্যও অনুরূপভাবে পৃথক নাটক লিখিতে বলেন। তখন রূপ ইঁহাদের আদেশ শিরোধার্য করিয়া কৃষ্ণলীলাকে পৃথক পৃথক ভাবে নাটকদ্বয়ে বর্ণনা করেন। তখন একটির নাম বিদগ্ধমাধব এবং অপরটির নাম ললিতমাধব রাখা হইল (চৈ. চ. ৩।১।৩৪৭২)।

বিদগ্ধমাধবের নামকরণে রূপ 'বিদগ্ধ' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ধারণা। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বিদগ্ধ শব্দের অর্থ করিয়াছেন, কলা-বিলাসবিদগ্ধাত্মা বিদগ্ধ ইতি কীর্ত্যতে' (২।১)। শিল্পবিলাসাদিতে পণ্ডিতকে বিদগ্ধ বলা হইতেছে। বিদগ্ধ শব্দের প্রচলিত অর্থ বিদ্বান বা পণ্ডিত হইতে ইহার কিছুটা পৃথকত্ব লক্ষিত হয়। মাধব লীলাবিলাসে অতিশয় নিপুণ তাই তিনি 'বিদগ্ধ'। নাটকখানির মধ্যে মাধবের লীলাবিলাসের বিচিত্র বর্ণবিলসিত বর্ণনা বর্তমান, তাই নাট্যকার নাম রাখিয়াছেন বিদগ্ধমাধব। এই সপ্তাঙ্ক নাটকের অঙ্ক-সমূহ যথাক্রমে (১) বেণুনাদবিলাস (২) মন্মথলেখক (৩) রাধাসঙ্গম (৪) বেণুহরণ (৫) রাধাপ্রসাদন (৬) শরদ্বিহার ও (৭) গৌরীতীর্থবিহার নামে উক্ত হইয়াছে।

রূপ গোস্বামী বিদগ্ধমাধবের সাতটি অঙ্কে রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ সম্ভোগ পর্যন্ত বৃন্দাবনলীলার প্রধান প্রধান ঘটনা-গুলি নাটকীয় কৌশলের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। নাটকের প্রারম্ভে দেখি রাধা ললিতা ও বিশাখার সহিত সূর্যপূজা করিতে যাইতেছেন এবং চন্দ্রাবলী তাঁহার প্রিয় সখী পদ্মা ও শৈব্যার সহিত গৌরীতীর্থে চণ্ডিকাদেবীকে আরাধনা করিতে গমন করিতেছেন। সন্দিপনী মুনির মাতা পৌর্ণমাসী দেবী রাধাকৃষ্ণের মিলন সাধন করিতে ব্যগ্র। কিন্তু মিলনের পূর্বে উভয়কে প্রেমে আকুল করিতে চাহেন। রাধার সহিত অভিমন্যুর বিবাহের মতন একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া অনেকের মনে হইয়াছিল। রূপ পৌর্ণমাসীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে কংসাদিকে বঞ্চনা করিবার জন্য যোগমায়া মিথ্যা বিবাহকে সত্যের ন্যায় প্রতীতি করাইয়াছেন (১২৪)। শ্রীরাধা কৃষ্ণকে তখন পর্যন্ত চোখে দেখেন নাই—কিন্তু কৃষ্ণ নাম শুনিয়াই তিনি প্রেমে পড়িয়াছেন।

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে।

মুখে লইতে কৃষ্ণনাম নাচে তুণ্ড অবিরাম
আরতি বাঢ়ায় অতিশয়।
নাম সুমাধুরী পাঞা ধরিবারে নারে হিয়া
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয়॥

রাধা যেমন কৃষ্ণনাম শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কৃষ্ণও সেইরূপ পৌর্ণমাসীর নিকট রাধা নাম শুনিয়া আত্মহারা হইয়াছেন। শ্রীরাধা বৃন্দাবনে সখীগণসহ প্রবেশ করিলেন। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি তিনি শুনিতে পাইলেন। ঐ ধ্বনি তাঁহার চিত্তকে ব্যাকুল করিল। বিশাখা নিজের হাতে আঁকা কৃষ্ণের চিত্রপট তাঁহাকে দেখাইলেন। রাধিকার মনে আনন্দ ও বেদনার মেশামেশি পূর্বরাগের সঞ্চার হইল।

দ্বিতীয় অঙ্কে শ্রীরাধার প্রেম ব্যাকুলতা বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীরাধার ভাববৈকল্য দেখিয়া পৌর্ণমাসী তাঁহাকে এক অনঙ্গলেখ রচনা করিয়া কৃষ্ণের নিকট পাঠাইতে উপদেশ দিলেন। ললিতা ঐ পত্র গুঞ্জামালা লইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলে কৃষ্ণ ভাল মানুষ সাজিয়া বলিলেন তিনি ব্রহ্মচারী, সুতরাং তাঁহার পক্ষে কোন রমণীর প্রেমপত্র গ্রহণ করা সম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণের এই নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানে ব্যথিত হইয়া রাধা কালিদহে প্রাণত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি সখীকে বলিলেন যে তাঁহার মৃতদেহ না পোড়াইয়া যেন তমাল তরুতে বাঁধিয়া রাখা হয়। জীবনে যাঁহার আলিঙ্গন পাইলেন না, মরণের পরে যেন তাঁহার তুল্য বর্ণধারী তমালবৃক্ষকে তিনি আলিঙ্গন করিবার সৌভাগ্যলাভ করেন। মৃত্যুর পূর্বে রাধা আর একবার শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপটখানি দেখিতে চাহিলেন। কিন্তু বিশাখার কাছে তখন উহা না থাকায় রাধা শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে বসিলেন। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ সেখানে অসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি নেপথ্যে থাকিয়া রাধার সুগভীর প্রেমের কথা সবই শুনিয়াছিলেন। বিশাখার অনুরোধে রাধা চোখ খুলিয়া সামনে তাহার দয়িতকে দেখিতে পাইলেন। রাধাকৃষ্ণ যখন পরস্পরকে দেখিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন, সেই সময় সহসা সেইখানে জটিলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের আর মিলন ঘটিল না।

তৃতীয় অঙ্কে পৌর্ণমাসী একদিকে শ্রীরাধার, অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের গভীরতা কতদূর তাহা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি রাধাকে বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের ঔদাসীন্য দূর করিতে পারিলাম না। এই কথা শুনিয়াই রাধার প্রাণবিয়োগের উপক্রম হইল। এদিকে বিশাখা যাইয়া কৃষ্ণকে খবর দিলেন যে অভিমন্যু রাধাকে মথুরায় পাঠাইয়া দিতেছেন। ইহা শুনিয়া কৃষ্ণ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। বিশাখা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কুঞ্জের দিকে পাঠাইলেন। বিশাখা ফিরিতেছেন না দেখিয়া রাধার মনে গভীর উদ্বেগ বাড়িল। অবশেষে সঙ্কেতকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হইল। কিন্তু সহসা সেখানে মুখরা আসিয়া পড়ায় শ্রীকৃষ্ণকে বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইতে হইল। মুখরা চলিয়া গেলে রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটিল। নবসঙ্গমে রাধার ব্রীড়া, শঙ্কা ও সঙ্কোচকে অল্পকথায় রূপ অতি অপূর্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

চতুর্থ অঙ্কে রসপুষ্টির জন্য চন্দ্রাবলীর পূর্বরাগ, মুরলীধ্বনিশ্রবণে তাঁহার অভিসার প্রভৃতি বর্ণনা করা হইয়াছে। অন্যদিকে ইহাতে শ্রীরাধার অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা ও খণ্ডিতাভাব বর্ণনা করা হইয়াছে। অবশেষে যখন কৃষ্ণের সহিত তাঁহার দেখা হইল তখন তাঁহার কটাক্ষবাণে সম্মোহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অঞ্চলে পুষ্পপুটিকার সহিত অজ্ঞাতসারে মুরলীটিও দিয়া ফেলিলেন। রাধা মুরলীটি লুকাইলেন, কেননা ঐ মুরলীর ধ্বনিই তো তাঁহাকে ঘরছাড়া করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের দেহে অন্যনারীর সহিত সম্ভোগের চিহ্ন দেখিয়া রাধা খণ্ডিতা নায়িকার ভাব অবলম্বন করিলেন। রাধার মান হইল। কৃষ্ণ ও বিশাখা ঐ মান ভাঙ্গাইবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। কিন্তু উহাতে যখন কোন কাজ হইল না তখন কৃষ্ণ নিজের মাথার চূড়াটি রাধার পায়ে লুটাইয়া প্রণামপূর্বক তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিলেন। এমন সময় মুখরা আসিয়া রসভঙ্গ করিলেন। যাইবার সময় কৃষ্ণ বংশী খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি রাধিকার উপর বংশীচুরির অভিযোগ আনিলেন। রাধিকা মুখরাকে বলিলেন যে বৃন্দাবনে কি কাঠের অভাব পড়িয়াছে যে তিনি ঐ বাঁশের বাঁশী চুরি করিতে যাইবেন? কিন্তু কৃষ্ণ বলিলেন যে রাধা যদি মুরলী হরণ না করিবেন তবে মুরলীর কথায় একটু হাসির বেগে তাঁহার কপোল উৎফুল্ল ও লোচনাঞ্চল দোলায়িত হইতেছে কেন? এই কথা শুনিয়া মুখরা চটিয়া বলিলেন যে রাধা কৃষ্ণের গুরুজন, সুতরাং তাঁহাকে পরিহাস করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায়। শ্রীকৃষ্ণের বয়স্য মধুমঙ্গল বলিলেন কৃষ্ণ তো রাধাকে খুবই মান্য করেন, একটু আগেই তিনি রাধাকে প্রণাম করিয়াছেন। এইরূপ হাস্য পরিহাসের মধ্যে সকলে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চমাঙ্কে হাস্য ও করুণরসের অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখানো হইয়াছে। শ্রীরাধার কলহান্তরিতাভাবে কারুণ্য ও জটিলার বুদ্ধিভ্রংশ লইয়া হাস্যরসের সৃষ্টি করা হইয়াছে। রাধা যখন শুনিলেন যে কৃষ্ণ যোগীজনের মতন ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়াছেন তখন তাঁহাকে পাইবার জন্য সখীদের নিকট কাতরতা প্রকাশ করিলেন। বিশাখা বংশীর নিন্দা ও প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে উহা বায়ুমুখে ধরিলে আপনিই বাজে। রাধা এই কথার সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য যেমন উহা বায়ুমুখে ধরিলেন অমনি বংশীধ্বনি শুনিয়া জটিলা আসিয়া রাধার হাতে বংশী দেখিয়া উহা কাড়িয়া লইলেন এবং রাধাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

এমন সময় সুবল জটিলাকে বলিলেন যে, তাঁহার ঘরে বানর ঢুকিয়াছে। জটিলা মুরলী দিয়া বানরকে মারিলেন আর বানর মুরলীটি লইয়া আমগাছে উঠিল। এদিকে কৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত হইয়া সামনে, পিছনে, উপরে ও ত্রিলোকে রাধাকেই দেখিতে লাগিলেন। ললিতা রাধাকে অভিসার করাইয়া তাঁহার নিকট আনিলেন।

জটিলার বোনঝি সারঙ্গী নামে বালিকা মাসীকে যাইয়া রাধাকৃষ্ণের মিলনের কথা বলিয়া দিল। জটিলা ছুটিয়া আসিয়া রাধাকে ধরিয়া তর্জনগর্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃন্দার কৌশলে রাধা সুবলে পরিণত হইলেন। ঘোমটা খুলিয়া সুবল নিজের মুখ দেখাইলে জটিলা অপ্রস্তুতের একশেষ হইলেন। তারপর আবার রাধাকৃষ্ণ বনবিহার করিবার সময় রাধার মনে প্রেমবৈচিত্ত্য জন্মিল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আদর করিয়া সান্ত্বনা দিলেন। এমন সময় আবার জটিলা তাহার লাঠি খুঁজিবার জন্য সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রাধাকে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখিয়াও কিছু বলিলেন না, কেননা তাঁহার মনে হইল ও তো সুবল, মেয়ে সাজিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করিতেছে। কৃষ্ণ শপথ লইয়া বলিলেন যে, ঐটি রাধা, তথাপি জটিলা বলিল, 'আরে আমি সব বুঝি, তুই আর ধূর্ততা করিস না।'

ষষ্ঠ অঙ্কের প্রথমেই জটিলা বলিতেছেন যে তিনি চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মার নিকট শুনিয়াছেন তাঁহার পুত্রবধূ রাধার সহিত কৃষ্ণের নাকি বসন বদল হইয়াছে—রাধা পীতবাস পরিয়া আছেন, তাই জটিলা সকাল বেলায় রাধার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশাখা তাঁহাকে বুঝাইলেন যে দীপান্বিতা পর্ব উপলক্ষে গোপীরা হলুদজল ছিটাইয়াছিল বলিয়া রাধার বসন পীতবর্ণ হইয়াছে। জটিলা সেই কথা বিশ্বাস করিলেন।

এই অঙ্কে রাধা ও চন্দ্রাবলীর সখীদের মধ্যে কৃষ্ণ কাহাকে বেশী ভালবাসেন এই লইয়া অনেক কথা কাটাকাটি দেখা যায়। উভয়পক্ষই প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে তাঁহাদের সখীই কৃষ্ণের অধিকতর বল্লভা। রাধা তমাল তরুকে দেখিয়া কৃষ্ণ বলিয়া ভ্রম করিলেন। তখন কৃষ্ণ মুরলীধ্বনি করিয়া সাড়া দিলেন। রাধা বংশীকে ধনু অপেক্ষা অধিক নিষ্ঠুর বলিয়া ধিক্কার দিলেন। রাধাকৃষ্ণের মিলনের মধ্যে রাধার বাম্যভাব, ললিতা ও বিশাখার অকৃত্রিম সখীভাব ও মধুমঙ্গলের পরিহাসকুশলতা রূপ সুন্দরভাবে ফুটাইয়াছেন। সখীরা দেখাইলেন যে রাধা কৃষ্ণ অপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। বনবিহারের সময় শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উপভুক্ত হইয়াছিলেন তাহা ললিতার উক্তি ও কৃষ্ণের স্বীকারোক্তি হইতে বুঝা যায়।

সপ্তমাঙ্কে সৌভাগ্য পূর্ণিমার (শ্রাবণমাসে) রাত্রির উৎসবের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের মিলন বর্ণিত হইয়াছে। চন্দ্রাবলীকে তাঁহার স্বামী গোবর্ধন মল্লের নিকট পাঠাইবার এবং অভিমন্যুর দ্বারা রাধাকে মথুরায় লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইতেছে এমন সময় কৃষ্ণের সঙ্গে প্রথমে চন্দ্রাবলীর ও পরে রাধার মিলন ঘটিল। শ্রীকৃষ্ণ গৌরীতীর্থে নিকুঞ্জ বিদ্যাদেবী সাজিয়া বসিয়া রহিলেন। শ্রীরাধাকে ললিতা বিশাখা সেইস্থানে লইয়া গেলেন। এমন সময়ে সেখানে অভিমন্যু ও জটিলার প্রবেশ ঘটিল। কিন্তু তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে রাধা গৌরীদেবীকেই আরাধনা করিতেছেন। গৌরী-

বেশধারী কৃষ্ণ বলিলেন যে, পরশ্ব কংস অভিমন্যুকে ভৈরবের নিকট বলি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অভিমন্যু ও জটিলা ইহা নিবারণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে দেবীরূপী কৃষ্ণ বলিলেন যে রাধা যদি গোকুলে নিরন্তর থাকিয়া তাঁহাকে উপাসনা করেন তবে এই বিপদ কাটিতে পারে। উভয়েই এই কথায় সানন্দে রাজী হইলেন। রাধাকে আর মথুরায় পাঠানো হইল না। রাধামাধবের মিলনের বাধা দূরীভূত হইল। বিদগ্ধমাধব নাটক গীতধর্মী, ইহাতে ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত অপেক্ষা কতকগুলি মধুর চিত্র অঙ্কনে বেশী মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত নাটকখানি ভক্ত দর্শক ও পাঠকের হৃদয়কে মধুররসে আপ্লুত করে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে বিদগ্ধ-মাধবের প্রথমাঙ্কের ১, ২, ১৩, ১৫, ৩৩, ৩৬, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৮, ৬০,—এই এগারটি; দ্বিতীয় অঙ্কের ১৬, ১৯, ২৬, ৩০, ৪৮, ৫৩, ৫৯, ৬০, ৬৯, ৭০, ৭৮,—এই এগারটি; তৃতীয় অঙ্কের ২ ও ১৩, চতুর্থ অঙ্কের ৯ এবং এবং পঞ্চম অঙ্কের ৪, ১০, ৩১—সর্বমোট ২৮টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যেরূপ ধারাবাহিকতার সহিত শ্লোকগুলি উদ্ধার হইয়াছে তাহাতে প্রতীত হয় যে নাটকটির রচনা ইতিপূর্বে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। রূপ ১৫১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে নীলাচলে বর্তমান ছিলেন পূর্বে দেখাইয়াছি। সেই সময়ে শ্রীচৈতন্য ও রায় রামানন্দের আলোচনাকালে এই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হওয়ায় নাটকটি ১৫১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে নীলাচলে সমাপ্ত হইয়াছিল বোঝায়। কিন্তু বিদগ্ধমাধবের নাটকের শেষে পুষ্পিকাতে যে কাল ও স্থানের কথা রহিয়াছে তাহার সহিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ কথিত বিবরণ মিলে না। নাটকটির পুষ্পিকা নিম্নরূপ,—

নন্দসিন্ধুরবাণেন্দুসংখ্যে সংবৎসরে গতে।
বিদগ্ধমাধবং নাম নাটকং গোকুলে কৃতম্ ॥

শ্লোকটি মূল গ্রন্থের অনুলিপির কাল জ্ঞাপক হইতে পারে না কারণ গ্রন্থকার স্পষ্ট করিয়া গোকুলে কৃতম্ অর্থাৎ গোকুলে লিখিত বলিয়াছেন। এই রচনার কাল ১৫৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দ হয়। সুতরাং ১৫১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে বিদগ্ধমাধব হইতে শ্লোক উদ্ধার অসম্ভব। ১৫১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে ইহা রচিতই হয় নাই মনে করিতে হয়। আর কৃষ্ণদাস কবিরাজে বিশ্বাস করিলে এইরূপ অনুমান করিতে হয় যে রূপ ১৫১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে লিখিতে আরম্ভ করিয়া মাঝপথে রচনা বন্ধ রাখেন এবং ১৫৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ পঞ্চমাঙ্ক পর্যন্ত শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। পাঁচটি অঙ্ক লিখিবার পর প্রায় ষোল বৎসর পরে মাত্র অবশিষ্ট দুই অঙ্কের লেখা শেষ করিয়াছেন এই অনুমান যাঁহারা করেন, তাহা যে খুব সুসঙ্গত তাহা ধারণা হয় না। বস্তুতঃ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ

সুকৌশলে যেরূপ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, হরিভক্তিবিলাসাদি গ্রন্থের বস্তুসংক্ষেপ চৈতন্য-চরিতামৃতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন সেরূপ বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব গ্রন্থকে বৈষ্ণবসমাজের সহিত পরিচিত করাইবার জন্য উক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে শ্লোকসমূহ উদ্ধার করিয়াছেন মনে হয়। যাঁহারা মনে করেন, রূপ নীলাচলে অবস্থানকালে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন শ্লোক লিখিয়াছিলেন পরে নাটকের মধ্যে ঐগুলি সংগ্রথিত করেন তাঁহাদের ধারণাও যুক্তি গ্রাহ্য নহে। কারণ নাটকে ঘটনা নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করিয়া পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়।

সেখানে পাত্রপাত্রীর চরিত্রবিকাশ, গতি সংঘাত প্রভৃতি পরিস্ফুটনের প্রয়োজনে শ্লোক রচিত হওয়াই সম্ভবপর। বিচ্ছিন্ন কয়েকটি শ্লোককে সন্নিবেশ করিবার উদ্দেশ্যে নাটকের কাহিনী নির্মাণ ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত প্রভৃতি সৃষ্টি অসম্ভব ব্যাপার।

১৫৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দ রচনাকাল সুস্পষ্ট পাওয়া গেলেও কেহ কেহ বিদগ্ধমাধব ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে রচিত বলিয়াছেন।[১] ডঃ সুকুমার সেন 'নন্দসিন্ধুর' পরিবর্তে 'নন্দসিন্দু' পাঠ ধরিয়া রচনাকাল ১৫২৪ খৃষ্টাব্দ বলিয়াছেন।[২]

ললিতমাধব—দশ অঙ্কবিশিষ্ট এই নাটকে কৃষ্ণের দ্বারকা লীলা বর্ণিত হইয়াছে। যদিও প্রথম হইতে চতুর্থ অঙ্কে কৃষ্ণের মাধুর্যপূর্ণ বৃন্দাবনলীলার অবতারণা আছে, তথাপি পঞ্চম হইতে দশম অঙ্ক পর্যন্ত দ্বারকালীলা মিশ্রিতভাবে সন্নিবিষ্ট থাকায় এই নাটক দ্বারকালীলাবিষয়ক বলিয়াই পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। নাটকের নাম ললিতমাধব হইবার কারণ রূপ উপসংহারে এইরূপ বলিয়াছেন,—

নাটকে সমুচিতামপীশ্বরঃ স্বৈরমপ্রকটয়ন্নুদাত্ততাম্
অত্র মন্মথমনোহরো হরির্লীলয়া ললিতভাবমাযযৌ ॥

অর্থাৎ এই নাটকে কামদেবের মনোহরণকারী পরমেশ্বর হরি নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাবশতঃ উদাত্ত-নায়কতা প্রকট করিয়া লীলাদ্বারা ললিতভাব পাইয়াছেন। নাটকটির দশটি অঙ্ক নিম্নলিখিত নামে পরিচিত,—

(১) সায়মুৎসব, (২) শঙ্খচূড়বধ, (৩) উন্মত্তরাধিক, (৪) রাধাভিসার, (৫) চন্দ্রাবলীলাভ, (৬) ললিতোপলব্ধি, (৭) নববৃন্দাবন-সঙ্গম, (৮) নববৃন্দাবনবিহার, (৯) চিত্রদর্শন, ও (১০) পূর্ণ-মনোরথ।

ললিতমাধব নাটকে রূপ গোস্বামী অদ্ভুত কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। স্বর্গ, মর্ত, পাতাল ও সূর্যালোকের ঘটনাবলী একসূত্রে দশ অঙ্কের মধ্যে এখানে

[১] বিশ্বকোষ, ১৬শ খণ্ড, পৃঃ ৬৯১ ; গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১১
[২] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, ৩য় সং, পৃঃ ২৮৭

গ্রথিত হইয়াছে। আবার বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকার লীলা স্বকীয় পার্থক্য হারাইয়া একে অন্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ভাগবত, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতির কাহিনীকে অনুসরণ না করিয়া রূপ গোস্বামী এই নাটকে বলিতেছেন যে রাধা ও চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা বিন্ধ্যপর্বতের দুই কন্যা, অতএব ভগিনী, কিন্তু তাঁহারা নিজেরা একথা জানিতেন না। হিমালয় শিবকে জামাইরূপে পাইয়াছিলেন বলিয়া বিন্ধ্যপর্বত শিবজয়ী কৃষ্ণকে জামাতৃরূপে পাইতে চাহিয়াছিলেন (জামাতৃসম্পদ্ গর্বিতস্য গৌরীপির্তু গিরীন্দ্রস্য বিস্পর্ধয়া—১।২৯)। কংসের আদেশে পুতনা রাক্ষসী রাধা ও চন্দ্রাবলীকে চুরি করিয়া গোকুলে লইয়া যাইতে উদ্যত হয়। পথের মধ্যে তাহার হাত হইতে চন্দ্রাবলী বিদর্ভ দেশগামিনী নদীতে পতিত হন। রাধার সঙ্গে সঙ্গে ললিতা এবং চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা, ভদ্রা, শৈব্যা ও শ্যামা বৃন্দাবনে আনীত হন। বিশাখাকে জটিলা যমুনাপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া তুলিয়া আনেন। চন্দ্রাবলীর বয়স যখন পাঁচবৎসর মাত্র তখন জাম্বুবান তাঁহাকে আবার বিদর্ভনগরের ভীষ্মক গৃহ হইতে ব্রজে লইয়া আসেন। পৌর্ণমাসী বা যোগমায়া চন্দ্রাবলীর সহিত গোবর্ধনের ও অভিমন্যুর সহিত রাধার মায়িক বিবাহ ঘটাইয়াছিলেন বটে কিন্তু ঐ গোপেরা তাঁহাদিগকে স্ত্রীরূপে দেখিতে পর্যন্ত সমর্থ হন নাই।

ললিতমাধব নাটকের প্রথম দুই অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণের সহিত চন্দ্রাবলী রাধা প্রভৃতির প্রেমলীলা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু যখনই অনেক কষ্টে উহাদের মিলন ঘটিতে যায় অমনি তাঁহাদের শাশুড়ী জটিলা ও ভারুণ্ডা আসিয়া বাধা দেন। রূপ গোস্বামী নন্দের ভ্রাতা উপনন্দের পুত্র সুভদ্রের পত্নীরূপে কুন্দলতাকে সৃষ্টি করিয়া রসের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। কুন্দলতা রাধাকৃষ্ণের মিলন সাধনে যত্নশীলা। সূর্যপূজার ছলে তিনি রাধাকে বনে লইয়া যান এবং নিজের দেবর কৃষ্ণকে পুরোহিত সাজাইয়া উপস্থিত করেন। ললিতা, বিশাখা দেবর-ভ্রাতৃবধূর সম্পর্ক লইয়া অনেক হাস্যপরিহাস করেন। শ্রীরাধাকে রত্নসিংহাসনে বসাইলে কংসের বন্ধু শঙ্খচূড় দৈত্যকে ঐ সিংহাসনসহ শ্রীরাধাকে হরণ করিতে হইল। কৃষ্ণ শঙ্খচূড়ের শিরোরত্ন কাড়িয়া লইয়া তাহার প্রাণসংহার করিলেন। রূপ গোস্বামী ঐ রত্নকে সামন্তকমণিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণ উহা বলদেবকে উপহার দেন এবং বলদেব আবার মধুমঙ্গলের হাত দিয়া শ্রীরাধাকে পাঠান। এইরূপ কোন কাহিনী কোন পুরাণ বা ইতিহাসে বর্ণিত হয় নাই। ইহা রূপ গোস্বামীর দ্বারা উদ্ভাবিত। রঘুনাথ দাস গোস্বামী বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে ললিতমাধব বর্ণিত এই ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

তৃতীয় অঙ্কে কংসপ্রেরিত অক্রূরের বৃন্দাবনে আগমন এবং শ্রীকৃষ্ণের মথুরায়

গমন সময়ে শ্রীরাধার উৎকট বিরহব্যথা বর্ণিত হইয়াছে। যে রাধা সখীদের সামনেও কৃষ্ণের মুখের পানে চাহিতে লজ্জা বোধ করিতেন তিনি চীৎকার করিতে করিতে রথের সামনে লুটাইতেছেন, কখনও বা সাশ্রুনয়নে হরির মুখের পানে চাহিতেছেন, কখনও বা বলরামের সামনে দন্তে তৃণ ধরিয়া যেন কৃষ্ণকে ফিরাইবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণও রাধার এই দশা দেখিয়া চোখের জল সামলাইতে পারিলেন না কিন্তু তাঁহার ফিরিবার উপায় নাই। এদিকে রাধা কৃষ্ণবিরহে প্রাণত্যাগ করিতে যাইতেছেন দেখিয়া ললিতা বলিলেন কৃষ্ণ কোথাও যান নাই। তিনি অক্রূর প্রভৃতির মায়ামূর্তি দেখাইয়া আমাদের সহিত পরিহাস করিতেছেন, চল তাঁহাকে কুঞ্জান্তরে খুঁজিয়া দেখি। রাধা সখীদ্বয়সহ বিভিন্ন স্থানে কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাধার বিরহ দেখিয়া গোবর্ধন পর্বত আকার সঙ্কোচনপূর্বক শতহস্তপরিমিত ও মানসীগঙ্গা শুষ্কপ্রায় হইলেন। শ্রীচৈতন্যের মত প্রেমোন্মাদিনী রাধাও নিজেকে ভালো করিয়া চিনিতে না পারিয়া বলিলেন, 'তুমিই বুঝি ললিতা, তাহা হইলে আমি রাধা'। অবশেষে রাধা ও বিশাখা কালিদহের যমুনার জলে ডুবিয়া গেলেন ও ললিতা গোবর্ধন পর্বতশৃঙ্গ হইতে লাফ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

ষষ্ঠ অঙ্কে নারদ উদ্ধবের নিকট প্রকাশ করেন যে যমুনা রাধাকে তাঁহার পিতা সূর্যদেবের নিকট লইয়া রাখেন। রাধা সূর্যকে স্যমন্তকমণি পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলেন। সত্রাজিৎ রাজা সূর্যের পরমভক্ত ছিলেন। তাই সূর্য রাধাকে স্যমন্তকমণিসহ সত্রাজিৎকে কন্যারূপে পালন করার জন্য প্রদান করেন। রাধার নাম হয় সত্যভামা। চতুর্থ অঙ্কে রূপ দেখাইয়াছিলেন যে কৃষ্ণ ও বলরাম যখন মথুরায় বাস করিতে লাগিলেন তখন ভীষ্মরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র রুক্মী গোকুল হইতে চন্দ্রাবলীকে (রুক্মিণীকে) কুণ্ডিননগরে পিত্রালয়ে লইয়া গেলেন। এদিকে রাজা নগ্নজিৎ, মদ্রেশ্বর, কৈকয় ও শৈব্যা নারদের নিকট হইতে খবর পাইয়া গোকুল হইতে যথাক্রমে পদ্মা, শ্যামলী, ভদ্রা ও শৈব্যাকে লইয়া গেলেন। ভদ্রার নাম হইল নাগ্নজিতী, শ্যামলার মাদ্রী, ভদ্রার লক্ষ্মণা ও শৈব্যার নাম মিত্রবৃন্দা। ললিতা জাম্ববনের কন্যা জাম্ববতীরূপে পালিত হন (৬।২১)। গোকুলের ষোল হাজার একশত গোপীকে নরকাসুর হরণ করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে লইয়া যান। কৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন ও পরে বিবাহ করেন। এইভাবে ঐ সকল গোপীর কাত্যায়নী ব্রত করা সফল হইল। তাঁহারা কৃষ্ণকে স্বামীরূপে পাইলেন।

দ্বারকালীলার মহিষীগণ যে বৃন্দাবনলীলার গোপীগণ হইতে অভিন্ন তাহা রূপ এইভাবে দেখাইলেন। পঞ্চমাঙ্কে রুক্মিণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বর্ণনা করা হইয়াছে। ভাগবতে আছে যে অম্বিকাপূজার পর রুক্মিণী যখন নিজের রথে

আরোহণ করিতেছিলেন তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রতিপক্ষ রাজাদের সমক্ষেই হরণ করেন (১০।৫৩)। কিন্তু রূপ গোস্বামী লিখিয়াছিলেন যে কৃষ্ণ নটবেশে দুর্গে প্রবেশ করেন। তিনি রুক্মিণীকে চন্দ্রাবলী বলিয়া চিনিলেন (৫।৩২) এবং যখন রুক্মিণী কৃষ্ণ আসিলেন না বলিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিতে যাইতেছেন তখন তাঁহাকে রক্ষা করিয়া আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। ভীষ্মক তাঁহার হস্তে রুক্মিণীকে সম্প্রদান করিলেন, কিন্তু একটি শর্ত রহিল যে তাঁহার কন্যার অনুমতি না লইয়া কৃষ্ণ অন্য কোন নারীর পাণিগ্রহণ করিবেন না (৫।৩৭)। এই অঙ্কের প্রথমেই নারদ পৌর্ণমাসীর নিকট প্রকাশ করেন যে, 'দ্বারকার মহিষীরা ও ব্রজরমণীরা তত্ত্বাংশে অভিন্ন, কেবল দেহাদিতে পৃথক। মধ্যকালে ইঁহারা মায়া কর্তৃক অভিন্ন হন। সম্প্রতি ব্রজে সেই গোপীরা প্রেমমূর্ছিত হইয়া আছেন, কিন্তু বিরহবেলাতেও যাহাতে প্রিয়সঙ্গ সুখলাভ হয়, সেইজন্য যোগমায়া ব্রজ আচ্ছাদন করিয়া পুরলীলার রমণী-গণের মধ্যে গোপীদের অভেদ অভিমান আবিষ্ট করিয়া দীর্ঘস্বপ্নের ন্যায় প্রতীতি করাইতেছেন'।

ললিতমাধবের ষষ্ঠ হইতে দশম অঙ্কে ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা ও শ্রীহর্ষের রত্নাবলী নাটকের ছায়া পড়িয়াছে। রুক্মিণী প্রধানা মহিষী। সত্রাজিৎ সত্যভামাকে তাঁহারই রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়াছেন। রুক্মিণী ও তাঁহার সখী মাধবী চাহেন না যে সত্যভামা কৃষ্ণের চোখে পড়েন। সত্যভামারূপিণী শ্রীরাধা জানেন যে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আছেন। অথচ সূর্যদেব তাঁহাকে বলিয়াছেন যে সমুদ্রগর্ভস্থ দ্বারকায় বিশ্ব-কর্মা নির্মিত নববৃন্দাবনে তিনি স্বীয় দয়িতের সহিত বিহার করিবেন। বিশ্বকর্মা ইন্দ্রনীলমণি দিয়া যে গোবিন্দের মূর্তি তৈয়ারী করিয়াছিলেন নববৃন্দাবনে তাহাই দেখিয়া রাধা আলিঙ্গন করিতে ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু ইহা স্পর্শ করিয়া বুঝিলেন যে উহা মূর্তিমাত্র। সখীদ্বয়ের সহিত তিনি স্নান করিতে গেলে কৃষ্ণ স্বয়ং ঐ মূর্তির স্থানগ্রহণ করিলেন। রাধা ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণকে দেখিয়া যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হইলেন। কিন্তু সেই সময়ে চন্দ্রাবলীরূপিণী রুক্মিণীর আগমনে উভয়ের মিলন ঘটিতে পারিল না।

অষ্টম অঙ্কেও রাধারূপিণী সত্যভামা ও চন্দ্রাবলীরূপিণী রুক্মিণীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখান হইয়াছে। বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রাধার সহিত কৃষ্ণের পুনরায় সাক্ষাৎকার ঘটিল। চন্দ্রাবলী রাধাকে উপহাস করায় রাধা কাতর হইয়া বলিলেন—দেবি, স্যমন্তকমণির দ্বারা যে পর্যন্ত আমি ব্রত সমাপ্ত না করি সে পর্যন্ত আমাকে (কৃষ্ণের হাত হইতে) রক্ষা করিবেন। চন্দ্রাবলী বলিলেন যে কৃষ্ণ আর ছল করিয়া তাঁহাকে বঞ্চনা করিতে পারিবেন না, কেননা মাধবী সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে।

নবম অঙ্কে রাধাকৃষ্ণের পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। নববৃন্দাবনের একটি পর্বত-গুহায় শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ও মথুরালীলার নানাবিধ চিত্র অঙ্কিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণের কৌস্তুভমণির আলোকে শ্রীরাধা ঐ সকল চিত্রপট দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পূর্বপ্রেমের স্মৃতিকথা আলোচনা করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিলেন। রাধা ভয় পাইলেন বলিয়া কৃষ্ণ কালিয়দমনের চিত্রটী এড়াইয়া গেলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণের কুব্জামিলনের চিত্রটি লইয়া রাধা শ্রীকৃষ্ণকে বেশ মিষ্ট পরিহাস করিলেন। এই অঙ্কটি অনেকটা উত্তররামচরিতের আলেখ্যদর্শন অঙ্কের অনুরূপ।

দশম অঙ্কে সত্রাজিৎ সত্যভামার জন্য স্যমন্তক মণি প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণ স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া ঐ মণি লইয়া চন্দ্রাবলীর গৃহে গমন করিলেন। কেননা চন্দ্রাবলী রাধাকে নিজের ছায়ার মতন কাছে কাছে রাখিয়াছিলেন। রাধা তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া চিনিতে পারিলেন। চন্দ্রাবলী সরলবুদ্ধিতে বলিলেন যে রাধা যেন স্বর্ণগৃহে লইয়া যাইয়া পিতৃগৃহ হইতে আগতা সখীরূপা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করেন। তাঁহারা যখন মিলিত হইতেছেন, সেই সময় কামরূপদেশীয় এক শুকপক্ষী রাধাকৃষ্ণ পরস্পরের সহিত যে সমস্ত কথাবার্তা পূর্বে বলিয়াছিলেন সেই সমস্ত চন্দ্রাবলীর নিকট আবৃত্তি করিল। চন্দ্রাবলী সমস্ত জানিতে পারিয়া অগত্যা সত্যভামার সহিত কৃষ্ণের বিবাহে রাজী হইলেন। এদিকে গোকুল হইতে নন্দ, যশোদা, রোহিণী, শ্রীদাম, সুবল প্রভৃতি দ্বারকায় আসিলেন। তাঁহাদের সকলের সমক্ষে রাধারূপিণী সত্যভামার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইল। ললিতা বিশাখা ও পদ্মাও ঐ সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নাটকের শেষে যশোদাগর্ভসম্ভূতা বিন্ধ্যবাসিনী একানংশাদেবী বলিলেন 'সখি রাধে! তোমরা সকলে সেই গোকুলেই বিরাজ করিতেছ, আমি শুধু কালক্ষেপণের জন্য এই প্রকার (দ্বারকায় অবস্থানাদি) মায়া বিস্তার করিয়াছি। কৃষ্ণও সেই স্থানেই রহিয়াছেন বিশ্বাস কর। ইহা শুনিয়া গর্গের কন্যা গার্গী বলিলেন যে তিনি পিতার নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা সফল হইল। শ্রীরাধা হাসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, 'আইস, আমরা বহিরঙ্গজনের দ্বারা অলক্ষিত হইয়া নিজ নিজ স্বরূপে গোকুলকে অলংকৃত করি'।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিদগ্ধমাধবের মত ললিতমাধবেরও প্রথম অঙ্কের ১, ৪, ২০, ৪৯, ৫০, ১০২, ১০৬ এই সাতটি, দ্বিতীয় অঙ্কের ২২ ও ২৩ এবং চতুর্থ অঙ্কের ২৭ সংখ্যক শ্লোক—সর্বমোট দশটি শ্লোক অন্ত্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা হইতে ইহা ১৫১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে নীলাচলে রচিত হইয়াছিল যে মনে করা চলে না, তাহা পূর্বে দেখাইয়াছি। ইহার রচনাকাল নিম্নরূপ পাওয়া যায়।

নন্দেষু বেদেন্দুমিতে শকাব্দে
শুক্রস্য মাসস্য তিথৌ চতুর্থ্যাম্।
দিনে দিনেশস্য হরিং প্রণম্য
সমাপয়ং ভদ্রবনে প্রবন্ধম্ ॥

অর্থাৎ ১৪৫৯ শকাব্দে (১৫৩৭ খৃষ্টাব্দ) জ্যৈষ্ঠ মাসের চতুর্থী তিথিতে রবিবারে শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া ভদ্রবনে এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal গ্রন্থে (p. 30) ললিতমাধব ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে এবং Keith তাঁহার Sanskrit Drama গ্রন্থে (2nd. ed. p. 297) ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে রচিত বলিয়াছেন কিন্তু রূপের প্রদত্ত রচনাকাল যেখানে সুস্পষ্টভাবে ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যাইতেছে সেখানে ঐগুলিকে স্বীকার করা চলে না।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন যে দেবী সত্যভামার আদেশে রূপ নাটক দুইটি রচনা করেন (চৈ. চ. ৩।১।৩৮-৪০)। কিন্তু নাটক দুইটির প্রারম্ভে রূপ সূত্রধারের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে বিদগ্ধমাধব ভগবান শঙ্করদেবের ও ললিতমাধব ভগবান গোপীশ্বরের আদেশে রচিত। 'অদ্যাহং স্বপ্নান্তরে সমাদিষ্টোঽস্মি ভক্তাবতারেণ ভগবতা শ্রীশঙ্করদেবেন'। বিদগ্ধমাধব টীকাকার (সম্ভবতঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী) 'শঙ্করদেবেন'-র টীকা করিয়াছেন, 'ব্রহ্মকুণ্ডতীরবর্তিনা গোপীশ্বরনাম্না'। তাহা হইলে একই গোপীশ্বরের আদেশে দুইটি নাটকই রচিত হইয়াছিল বোঝা যায়। ললিতমাধবে আছে, 'সন্ততং বৃন্দাটবীনিকুঞ্জবেদিনিবাসদীক্ষা রসজ্ঞস্য স্ফুরদুদ্দণ্ডপুণ্ডরীকমণ্ডলীমণ্ডিত ব্রহ্মকুণ্ডতীরোপান্তস্থলী মহাভৌমিকস্য ভগবতো গোপীশ্বরতয়া প্রসিদ্ধস্য চন্দ্রাধমৌলেঃ স্বপ্নাবির্ভূতমাদেশমাসাদ্য দীপাবলী কৌতুকারম্ভে গোবর্ধনারাধনায় রাধাকুণ্ডরোধসি মাধবী-মাধবমন্দিরস্য পূর্বতঃ সঙ্গতানি বৈষ্ণববৃন্দানি স্বপ্রবন্ধেন ললিতমাধব নাম্না নাটকেনাহমুপস্থাতুং পর্য্যুৎসুকোঽস্মি' (১।৩)।

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত বিদগ্ধমাধবে যে টীকাটি যুক্ত আছে তাহা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত বলা হইয়াছে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত গুরুদেবাষ্টকম্-এর অজ্ঞাত টীকাকারের টীকা হইতে জানা যায় বিশ্বনাথ চক্রবর্তী দানকেলিকৌমুদী, বিদগ্ধমাধব প্রভৃতির টীকা করিয়াছিলেন। 'গ্রন্থকর্তাদৌ শ্রীভাগবতস্য শ্রীভগবদ্-গীতায়াশ্চ স্বকৃতটীকায়াং ভক্তেরেব সাধনসাধ্য সারভূতত্বং নির্ধার্য্য আনন্দবৃন্দাবন-চম্পৌ বর্ণিতং যৎ···শ্রীরূপগোস্বামিকৃত উজ্জ্বলনীলমণি বিদগ্ধমাধব দানকেলিকৌমুদ্য-পরি স্বকৃতটীকায়াং···স্তবামৃতাখ্যং গ্রন্থং করোতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীনামা কবিবরো-ঽস্মাকমনুগ্রহার্থমিতি' (সংস্কৃত কলেজ পুঁথি নং বৈ ৯৯)। সুতরাং উক্ত টীকা বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর হইলেও হইতে পারে। বহরমপুর ও বসুমতী গ্রন্থমন্দির হইতে

টীকাযোগে ললিতমাধবের একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহাতে টীকাকারের নাম নাই। টীকাপ্রারম্ভে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকৃপাধরৈঃ শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণৈর্মদেকশরণৈঃ' পাঠ দেখিয়া ইহা জীবের রচিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু জীবের নামে ললিত-মাধবের কোন টীকার সংবাদ প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় নাই বলিয়া ইহা জীবের কিনা সঠিক বলা সম্ভব নহে।

দানকেলিকৌমুদী—বিদগ্ধমাধব বা ললিতমাধবের মত সপ্তাঙ্ক বা দশমাঙ্কের নাটক নহে। মাত্র একটি অঙ্কে সমাপ্ত এই নাটক 'ভাণিকা' নামে খ্যাত। কিংবদন্তী আছে যে, রাধাকুণ্ডতটনিবাসী রঘুনাথ দাস রূপের ললিতমাধব পড়িয়া রাধার বিরহবেদনা অনুধ্যানে একেবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন, এমন কি তাঁহার প্রাণরক্ষাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। তখন রূপ রঘুনাথের অন্তর্দাহ প্রশমনের জন্য হাস্যপরিহাসযুক্ত এই দানকেলিকৌমুদী রচনা করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করেন এবং ললিতমাধব ফিরাইয়া আনেন। রঘুনাথও রসান্তরে মনোনিবেশ করিয়া সুস্থ হন। ইহা কতদূর সত্য তাহা জানা না গেলেও গ্রন্থশেষে রূপ যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে ইহা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কোনও প্রিয় সুহৃদের অভিপ্রায় অনুসারে তিনি এই ভাণিকাখানি রচনা করেন। ভাণিকার আখ্যানকল্পনা রূপেরই বলা যাইতে পারে। গোবর্ধন গিরিপ্রান্তবাহিনী মানসগঙ্গার তটে ঘটনাটি ঘটানো হইয়াছে। বসুদেব নিজপুত্র বলদেব এবং মিত্রপুত্র কৃষ্ণের শান্তি কামনা করিয়া গর্গের জামাতা ভাগুরিকে দিয়া গোবিন্দকুণ্ডের তীরে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। গুরুজনদের আদেশে রাধা সখীদের সঙ্গে ঐ যজ্ঞস্থলে হৈয়ঙ্গবীন (সদ্য প্রস্তুত ঘৃত) বিক্রয়ের জন্য গমন করেন। পৌর্ণমাসী ইহা পূর্বেই জানিতে পারিয়া কৃষ্ণকে জানাইয়া দেন। কৃষ্ণও সুযোগ বুঝিয়া যথাসময়ে গোবর্ধনে উপস্থিত হন এবং ঘাটোয়াল সাজিয়া রাধা ও তাহার সখীদের পথ অবরোধ করিয়া তাহাদের কাছে দান বা শুল্ক দাবী করেন। রাধা ও তাহার সখীরা ইহা দিতে অস্বীকার করে। তখন এই ঘটনা লইয়া কৃষ্ণ ও তাহার সখা এবং গোপীদের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ শুরু হয়। অনেক বিতর্ক চলিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পৌর্ণমাসীর মধ্যস্থতায় এই বাদ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তি হয়। একটিমাত্র অঙ্কে সমাপ্ত এই নাটকে নাট্যিক উৎকর্ষ লক্ষ্য না করা গেলেও হাস্যপরিহাসরসতায়, বর্ণনার বিচিত্রসরসতায়, কল্পনার বৈচিত্র্যে ও রচনার মাধুর্যে ইহা খুবই উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

কাহারও কাহারও মতে দানকেলিকৌমুদী রূপের পূর্বোক্ত দুইটি নাটকের পূর্বে রচিত কিন্তু দানকেলিকৌমুদীর অন্ত্যে প্রদত্ত রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোক হইতে ইহা ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে রচিত জানা যায়।

গতে মনুশতে শাকে চন্দ্রস্বরসমন্বিতে।
নন্দীশ্বরে নিবসতা ভাণিকেয়ং বিনির্মিতা॥

কিন্তু ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে রচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে রচিত দানকেলি-কৌমুদীর উদ্ধৃতি থাকায় এই রচনাকাল সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়াছে।

ডঃ সুশীলকুমার দে তৎসম্পাদিত পদ্যাবলীর ভূমিকায় দানকেলিকৌমুদী ১৪১৭ শকে (১৪৯৫ খৃষ্টাব্দ) রচিত বলিয়াছেন।[১] তিনি ঐ কাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' স্বীকার করেন নাই। এই মত তিনি তাঁহার Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal গ্রন্থেও (1942, p. 110) পোষণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (1966, p. 148) এবং তাঁহার History of Sanskrit Poetics গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণেও (p. 252) এই মত রক্ষিত হইয়াছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার Descriptive Catalogue of Skt. Mss. of the Asiatic Society of Bengal (Vol. VII p. 219) গ্রন্থে 'স্বর' অর্থে তিন ধরিয়া ১৪৩১ শক (১৫০৯ খৃষ্টাব্দ) দান-কেলিকৌমুদীর রচনাকাল নির্ণয় করিয়াছেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার 'স্বর' লিপিপ্রমাদ অনুমান করিয়া 'চন্দ্রশর' ধরিয়াছেন এবং রচনাকাল 'শর'=পাঁচ ধরিয়া ১৪৫১ শকে (১৫২৯ খৃষ্টাব্দ) দানকেলিকৌমুদী যে রচিত তাহা বলিয়াছেন।[২] ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে দানকেলিকৌমুদী রচিত হইয়াছিল ইহা গ্রহণ করা চলে না। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রূপ বৃন্দাবন গমন করেন নাই। সুতরাং তাঁহার পক্ষে নন্দীশ্বরে ব্রজমণ্ডলে বাস কখনও সম্ভব নহে। ডঃ দের মতে শেষের শ্লোকটি পরবর্তী সংযোজনা। কিন্তু তাহা স্বীকার করিয়া লইলেও ভাণিকাটি গ্রন্থকারের বৃন্দাবনের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের বহু প্রমাণ বহন করে। ভাণিকাতে কয়েকটি ঘটনা রহিয়াছে তাহা কুণ্ডতটে ঘটানো হইয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায় শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন ভ্রমণকালে এই সমস্ত কুণ্ড আবিষ্কৃত হয়। শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনে ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে গমন করেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন গমনের পরে রূপ যেখানে বৃন্দাবন গিয়াছিলেন সেখানে রূপের পক্ষে পূর্ব হইতে ঐ সমস্ত কুণ্ডের নাম ও অবস্থান জানা সম্ভব হয় না।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গৃহীত শক সম্পর্কেও ঐ কথা প্রযোজ্য। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে রূপের বৃন্দাবনে বাস সম্ভব নহে বরং ঐ সময়ে তিনি হোসেন শাহের রাজ-দরবারে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, ইহা পূর্বে দেখাইয়াছি।

১ *Padyavali*, Introduction, p. lii
২ সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা, ১৩৪২, প্রথম সংখ্যা, পৃঃ ৫২

ডঃ দে বলিয়াছেন দানকেলিকৌমুদী শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের পরবর্তী রচনা হইলে ইহাতে শ্রীচৈতন্যের প্রতি নমস্ক্রিয়া নাই কেন ? তদুত্তরে বলা যায় যে উজ্জ্বলনীলমণি শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ সাহচর্যলাভের পর রচিত তথাপি ইহাতে শ্রীচৈতন্যের প্রতি নমস্ক্রিয়া নাই। আর ভাণিকার মঙ্গলাচরণে ইঙ্গিতে শ্রীচৈতন্যের প্রতিও নমস্কার জানানো হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়।

ডঃ মজুমদার ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে রচনাকাল ধরিয়াছেন। কিন্তু অন্ত্যে প্রদত্ত শ্লোক হইতে ইহাকে সমর্থন করা যায় না। অন্ত্যে বলা হইয়াছে যে, রাধাকুণ্ড তটনিবাসী কোনও সুহৃদজনের জন্য দানকেলিকৌমুদী রচিত।

প্রথিতঃ সুমনা সুখদা যস্য নিদেশেন ভাণিকা প্রগিয়ং।
তস্য মম প্রিয়সুহৃদঃ কুণ্ডতটীং ক্ষণমলংকুরুতাম্ ॥

এই শ্লোকটি কেবল মুদ্রিত গ্রন্থে নহে, বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত পুঁথিতে (পুঁথি নং, নাটক ৭), হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর Notices of Skt. Mss (No. 164) এবং মাদ্রাজের গভর্ণমেণ্ট ক্যাটালগে (XXI p. 140 No. 1252) দানকেলিকৌমুদীর যে বিবরণ আছে তাহাতেও এই শ্লোকটি যুক্ত আছে দেখা যায়। সুতরাং ইহাকে প্রক্ষিপ্ত মনে করা চলে না। এই রাধাকুণ্ডতটনিবাসী সুহৃদ্‌জন রঘুনাথ দাস হইলে তাঁহার প্রীত্যর্থে ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে দানকেলিকৌমুদী রচনা সম্ভব নহে। কারণ শ্রীচৈতন্যের প্রকটকালে রঘুনাথ দাস নীলাচলেই বাস করিতেন এইরূপ কথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে জানা যায়। রাধাকুণ্ডতট নিবাসী রঘুনাথ দাস না হইলে গোপাল ভট্টকে উক্ত সুহৃদজন মনে করিতে হয়। গোপাল ভট্ট রাধাকুণ্ডতটে বাস করিতেন এমন কোন ঐতিহ্য প্রাচীনবৈষ্ণবগ্রন্থসমূহে নাই। দানকেলিকৌমুদীর টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন 'সুমনস পুষ্পাণি সুমনসো ভক্তশ্চ তস্য প্রিয়সুহৃদ শ্রীরাধাকুণ্ডবাসিনঃ শ্রীরঘুনাথদাসেত্যর্থঃ'। সুতরাং রঘুনাথ দাসকে উক্ত সুহৃদজন মনে করিলে তাঁহার প্রীত্যর্থে দানকেলিকৌমুদী রচনা শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পর অর্থাৎ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের পরে হয়। সুতরাং ১৫২৯ খৃষ্টাব্দকে দানকেলিকৌমুদীর রচনাকাল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।

ডঃ সুকুমার সেন মুদ্রিত পাঠ 'চন্দ্রস্বর' ভ্রান্ত বলিয়া 'গতে মনুশতে শাকে স্বরচন্দ্র সমন্বিতে' পাঠ হইবে বলিয়াছেন।[১] এখানে অঙ্কের গতি বামা না মানিয়া ১৪৭১ শক অর্থাৎ (১৫৪৯ খৃষ্টাব্দই) রচনাকাল রাখা হইয়াছে দেখা যাইতেছে। 'চন্দ্রস্বর'-এর পরিবর্তে যদি 'চন্দ্ররস' পাঠ ধরা যায় তাহা হইলে গ্রন্থ রচনাকাল ১৪৬১ শক অর্থাৎ ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দ হয় এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ইহার উদ্ধৃতি

[১] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, ৩য় সং, পৃঃ ২৮৭ পাদটীকা

সম্ভবপর হয়, দেখা যায়। কিন্তু 'স্বর'র পরিবর্তে রস ধরার কোন যুক্তি পাওয়া যায় না এবং এই দুই পুঁথিতেও সমর্থিত হয় না। তাই এই অনুমান করিতে হয় যে ১৫৪১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে দানকেলিকৌমুদী রচনা আরম্ভ করিয়া কিছু অংশ লিখিবার পর রূপ ইহার রচনাকার্য বন্ধ রাখিয়াছিলেন এবং পরে ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে ইহা সমাপ্ত করেন।

বহরমপুর রাধারমণ প্রেস হইতে দানকেলিকৌমুদীর সহিত যে টীকাটি মুদ্রিত হইয়াছে তাহা জীবরচিত বলিয়া সম্পাদক রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বলিয়াছেন। কিন্তু জীবরচিত দানকেলিকৌমুদীর কোনও টীকার পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগারে (পুঁথি নং ৪৮) ও এসিয়াটিক সোসাইটিতে (Descriptive Cat. of Skt. Mss.—H. P. Sastri, Vol. VII. p. 279) যে দানকেলিকৌমুদীর টীকার পুঁথি পাওয়া যায় তাহা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত বলিয়া পুষ্পিকাতে লেখা রহিয়াছে। এই পুঁথির টীকার সহিত বহরমপুর হইতে মুদ্রিত টীকার সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। এই কারণে টীকাটিকে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীরই বলিয়া মনে হয়। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী যে দানকেলিকৌমুদীর একটি টীকা করেন তাহা পূর্বে দেখাইয়াছি।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—ভক্তিকে রসের অমৃতরূপ সিন্ধু হিসাবে স্থাপন করিয়া রূপ গোস্বামী উহার পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর বিভাগে যথাক্রমে চারিটি, পাঁচটি, পাঁচটি ও নয়টি লহরী উঠাইয়াছেন। এই মহাগ্রন্থ যেন ভক্তির রাজ্যের পথ-প্রদর্শক। পূর্ববিভাগে সামান্য বা সাধারণ ভক্তি, সাধন ভক্তি, ভাব ও প্রেমভক্তির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য দেখান হইয়াছে। দক্ষিণ বিভাগে ভক্তিরসের বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী ও স্থায়ীভাব আলোচিত হইয়াছে। পশ্চিম বিভাগে মুখ্য ভক্তিরসের নির্ণয় করিতে যাইয়া রূপ শান্ত, দাস্য, সখ্য বা প্রেয়োভক্তি, বাৎসল্য ও মধুর রসের বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষ বা উত্তরবিভাগে হাস্য, অদ্ভুত বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, মৈত্রবৈর ও রসাভাস আলোচনা করা হইয়াছে। রূপের বিশ্লেষণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন যে অন্য কোন ইচ্ছা বা অভিলষিতা বর্জিত, অর্থাৎ কোন উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনসাধনের জন্য নহে, জ্ঞানকর্ম ও যোগ প্রভৃতির দ্বারা যাহা আচ্ছন্ন নহে, এমন অনুকূলতাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনই হইতেছে উত্তম ভক্তি। শুদ্ধাভক্তি আবার সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি এই তিনস্তরে বিভক্ত। সাধনভক্তি যখন জন্মে, তখন সকল ক্লেশ নষ্ট হয় ও শুভের উৎপত্তি হয়। ভাবভক্তি জন্মিলে মোক্ষও তুচ্ছ মনে হয় এবং প্রেমভক্তির উদয়ে শ্রীকৃষ্ণকেও নিজের কাছে টানিয়া আনে।

সাধনভক্তিকে আবার বৈধ ও রাগানুগা এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। সাধনভক্তির গুরুপদাশ্রয়াদি ৬৪টি অঙ্গ ; তাহার মধ্যে সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধায় বিগ্রহসেবা প্রধান। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন সাধনভক্তিলাভের মুখ্য উপায়। ভাবভক্তির আবির্ভাব হয় সাধনায় অভিনিবেশ হইতে, কৃষ্ণের কৃপায় ও ভক্তের প্রসাদে। ক্ষান্তি, অব্যর্থ কালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদারুচি, কৃষ্ণগুণবর্ণনে আসক্তি ও কৃষ্ণতীর্থে প্রীতি হইতেছে ভাবোদয়ের লক্ষণ।

যে ভাবভক্তি চিত্তের স্নিগ্ধত্ব আনে, পরম আনন্দের উৎকর্ষপ্রাপ্তি করায় এবং শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় মমতা প্রদান করে তাহাকে প্রেম বলে। রূপ গোস্বামী কি ভাবে ক্রমে ক্রমে প্রেমের উদয় হয় দেখাইয়াছেন (১।৪।১৫-১৬)। প্রথমে সাধুসঙ্গে শাস্ত্র-শ্রবণ দ্বারা শ্রদ্ধা জন্মে, পরে ভজনরীতিশিক্ষার জন্য সাধুসঙ্গ হয়, পরে ভজনক্রিয়া, তারপর অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধপাপের বিনাশ হয়। তারপর সব সময় অন্যচেতা হইয়া ভজন করিতে উদ্যম হয়, ইহাই নিষ্ঠা। তারপর রুচি ও আসক্তি, ভাব ও প্রেম ক্রমান্বয়ে উদিত হয়। ভগবৎপ্রসঙ্গে যে পরিমাণে রুচি হইবে অন্য বিষয়ে সেই পরিমাণে অরুচি হইবে। আসক্তি জন্মিলে সাধক ভগবানের মাধুর্য আস্বাদন করিতে পারেন। মধুলোভে উন্মত্ত ভ্রমরের মতন ভক্ত সব সময়ে হরিকথা শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করেন।

সাধারণতঃ আস্বাদ্য বস্তুকে রস বলা হয়। কিন্তু যে বস্তুতে আস্বাদনের চমৎ-কারিতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পায় তাহাতেই রসের পর্যবসান। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী বা সঞ্চারীভাব মিলিয়া রস উৎপন্ন হয়। স্থায়ীভাবের আধার বা আশ্রয় আলম্বন বিভাব। চিত্তের স্থায়ীভাব উদ্দীপনবিভাবে উদ্দীপিত হয়। অনুভাবে ঐ ভাব বাহিরে ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পায়। সঞ্চারীভাবে বিভাবিত অনুভাবিত দ্বারা ক্রমোৎকর্ষ প্রাপ্ত রতিকে সঞ্চারিত বা তরঙ্গায়িত করাইয়া ভক্তিরসে পরিণত করে।

যাহাতে সুখ, দুঃখ, দ্বেষ, মাৎসর্য নাই এবং সকল জীবের প্রতি সম ভাব বিদ্যমান তাহাই শান্তরস। শান্তভক্তিরস আস্বাদন করেন শম-প্রধান আত্মারাম ও তাপসগণ, ইঁহারা ভগবানকে সর্বাশ্রয়-স্বরূপ জানেন। কিন্তু তাঁহাকে প্রভু, সখা, পুত্র, পতি প্রভৃতি সম্বন্ধে নিজের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া অনুভব করিতে পারেন না। ইঁহাদের কখনও কখনও ভগবানের গুণাবলী স্ফূর্তি হয় বটে কিন্তু উহা তরল ও ক্ষণকাল স্থায়ী। পক্ষান্তরে তাঁহাদের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবৎস্ফূর্তিময় সুখটি ঘন বা মহান্ (৩।১।৫-৬)। ইঁহাদের অনুভাব নাসাগ্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ, অবধূতের

ন্যায় চেষ্টা, হরিবিদ্বেষীর প্রতি দ্বেষহীনতা, ভগবৎপ্রিয়গণের প্রতি ভক্তিমাত্রশূন্যতা, জীবন্মুক্তির প্রতি বহু আদর, নিরপেক্ষতা, নিরহঙ্কারিতা ইত্যাদি।

দাস্য বা প্রীতিভক্তিরসের বিষয় হরি ও আশ্রয়ালম্বন দাসগণ। ইঁহারা মনে করেন যে ইঁহাদের প্রভু নিখিলগুণে গরীয়ান এবং অতুলনীয়। তাই তাঁহারা নিজের নিজের অধিকারযোগ্য সেবায় প্রবৃত্ত থাকেন। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র প্রভৃতি হইতেছেন অধিকৃতদাস, আর তিন প্রকারের দাসদের নাম আশ্রিত (উদ্ধবাদি পরিষদ এবং ব্রজের ও দ্বারকার অনুগ ভৃত্যগণ)। অধিকৃত ও আশ্রিত দাসে প্রেম জন্মে। সম্ভ্রমযুক্ত প্রীতি বদ্ধমূল ও হ্রাসের আশঙ্কাহীন হইলে প্রেম নাম ধারণ করে (৩।২।৮১)। পার্ষদগণে স্নেহ জন্মে। চিত্তদ্রবকারী নিবিড় প্রেমকেই স্নেহ বলে। এই অবস্থায় ক্ষণিক বিয়োগও সহ্য হয় না। উদ্ধবাদি অনুগদের রাগ জন্মে। যে বস্তু দুঃখজনক কিন্তু কৃষ্ণের অত্যল্প সম্বন্ধ থাকার জন্যই সুখজনক হয় এবং যাহাতে প্রাণ দিয়াও শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তাহা রাগ। দাস্যভক্তির উদ্দীপন অনুগ্রহ, চরণধূলি ও মহাপ্রসাদপ্রাপ্তিতে।

পরস্পর প্রায় সমান সখাদ্বয়ের যে সম্ভ্রমবিমুক্ত প্রগাঢ়বিশ্বাসময় রতি তাহাকে সখ্য বলে (৩।৩।১০৫)। এই সখ্যরতি বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে প্রণয়, প্রেম ও রাগরূপে পরিণত হয়। সখাদিগকে রূপ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—যথা অর্জুন, ভীম, দ্রৌপদী, শ্রীদামবিপ্র প্রভৃতি পুরাশ্রিত সখা, আর শ্রীদাম, সুবলাদি গোকুলাশ্রিত সখা। শেষোক্তগণ আবার সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্মসখা ভেদে চার প্রকার। সুহৃদেরা বয়সে কিছু বড় এবং বাৎসল্যগন্ধযুক্ত সখ্যভাব অনুভব করেন। যাঁহারা বয়সে কিছু ছোট এবং দাস্যগন্ধী সখ্যকামী তাহারাই সখা। ইঁহারা বীজন, অঙ্গসম্বাহনাদি করিয়া আনন্দ পান। যাঁহারা সমান বয়স্ক এবং কেবল সখ্যরসাশ্রয়ী তাঁহারা প্রিয়সখী। প্রিয়নর্মসখীরা প্রেমলীলায় সাহায্য করেন।

বৎসলভক্তিরসে ভক্তগণ নিজেকে গুরু এবং কৃষ্ণকে লালনযোগ্য বলিয়া মনে করেন। মস্তক আঘ্রাণ, হাত দিয়া অঙ্গমার্জন, আশীর্বাদ, আজ্ঞা করা, উপদেশ দেওয়া ও প্রতিপালন করা প্রভৃতি বৎসলরসের অনুভাব (৩।৪।৪৩)। অনুকম্পা পাইবার যোগ্য জনের প্রতি অনুকম্পাকারীর যে সম্ভ্রমাদিশূন্য রতি তাহাকেই বাৎসল্যনামক স্থায়ীভাব বলে।

ভক্তরূপ আধারে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে যে রতি থাকে তাহাই আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হয়। প্রিয়তার অপর নাম মধুরা রতি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ইহা অত্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

মধুর ভক্তিরস বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ ভেদে দুই প্রকার। পূর্বরাগ, মান, প্রবাস প্রভৃতি ভেদে বিপ্রলম্ভ অনেক রকমের হয়।

পুষ্পিকা হইতে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১৪৬৩ শকে (১৫৪১ খৃষ্টাব্দ) রচিত হইয়াছিল জানা যায়।

রামাঙ্গশক্রগণিতে শাকে গোকুলাধিষ্ঠিতেনায়ম্।
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ বিটঙ্কিত ক্ষুদ্ররূপেন॥

ভাণ্ডারকরের রিপোর্টে 'রামাঙ্গশক্রগণিতে' পাঠ পাওয়া যায় (Report 1883-1884)। এই পাঠ ধরিলে রচনাকাল ১৪৯৩ শক (১৫৮১ খৃষ্টাব্দে) হয়। জীব তাঁহার টীকায় এই কালনির্ণয়জ্ঞাপক শ্লোক সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়া ১৫৪১ খৃষ্টাব্দই ইহার রচনাকাল বলায় এই সম্পর্কে কোন মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'রামাঙ্গেতি-শালিবাহনস্য সম্বৎসরগণনয়া বিক্রমাদিত্যস্যাপি সা জ্ঞেয়া। অঙ্কস্য বামা গতিরিতি প্রসিদ্ধ্যা ত্রিষষ্ঠ্যাধিক চতুর্দশশতী গণিত ইত্যর্থঃ। বিক্রমাদিতস্য ত্বষ্টনবত্যধিক পঞ্চদশশতী গণিতেতি জ্ঞেয়ম্'।

জীবকৃত দুর্গমসঙ্গমনী, কৃষ্ণদাসবিরাজশিষ্য মুকুন্দদাস গোস্বামীকৃত অর্থরত্নাল্প-দীপিকা, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত 'ভক্তিসারপ্রদর্শিনী' এবং সংস্কৃত কলেজ পুঁথিশালার কোনও অজ্ঞাত লেখকের 'ভক্তিসামান্যলহরী' নামে (বৈ. ৭০ নং) ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর উপর এই চারিটি টীকার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম তিনটি টীকাযোগে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হরিদাস দাস ৪৬২ গৌরাব্দে নবদ্বীপ হইতে প্রকাশ করেন।

উজ্জ্বলনীলমণি—গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে উজ্জ্বল, মধুর বা শৃঙ্গার ভক্তিরসের প্রাধান্য। তাই রূপ গোস্বামী সাধারণভাবে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অর্থ আলোচনা করিয়া উজ্জ্বলনীলমণিতে কেবলমাত্র মধুর রসের কথাই বিচার করিয়াছেন। উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পরিশিষ্ট হইলেও ইহার বিশ্লেষণ রীতি ও সিদ্ধান্তগৌরব এই মহাগ্রন্থকে সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনের ভিত্তিভূমিতে পরিণত করিয়াছে। সাধারণ অলংকার-শাস্ত্রের পরিভাষা ইহাতে গৃহীত হইলেও অনুভাবপ্রকরণে উদ্ভাস্বরের ও স্থায়ী ভাবপ্রকরণে মধুরারতির বিশ্লেষণ রূপ গোস্বামীর মৌলিক প্রতিভার দান। প্রেমের এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার ও আলোচনা অন্য কোথাও দেখা যায় না। ইহা কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির চমৎকারিত্ব দেখাইবার জন্য নহে—পরন্তু প্রেমভক্তিমার্গের পথ প্রদর্শনের জন্য।

উজ্জ্বলরসের নায়ক সাধারণ ব্যক্তি তো হইতেই পারেন না, এমন কি পরশুরাম, নৃসিংহ প্রভৃতি অবতারও হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র নায়ক বা বিষয়াবলম্বন এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীরা আশ্রয় আলম্বন। নায়ককে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরশান্ত ও ধীরোদ্ধত এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত

করা হইয়াছে। কিন্তু উজ্জ্বলনীলমণিতে নায়কের ৯৬ প্রকার বিভেদ বর্ণিত হইয়াছে। ঐ চারিপ্রকার নায়ক ব্রজে পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর ও দ্বারকায় পূর্ণ। এই বার প্রকার নায়ক আবার পতি ও উপপতিভেদে চব্বিশপ্রকার। তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকে আবার অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট হইতে পারেন বলিয়া সর্বসাকুল্যে ৯৬ প্রকারের নায়ক। নায়কের সহায় হইতেছেন চেট বা ভৃত্য, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ বা সহচর ও প্রিয়নর্মসখা। নায়কনায়িকারা নিজেরাই নিজের দূতী হইয়া আকার প্রকার, ভাবভঙ্গী বা বচনকৌশলে মনের ভাব জানাইতে পারেন। অথবা তাঁহারা কোন সখা বা সখীকে ঐ কার্যে নিযুক্ত করিতে পারেন। ইঁহারা অমিতার্থ বা ইঙ্গিতমাত্র জানিয়া মিলন সাধনে পটু, নিসৃতার্থা বা কাজের ভার পাইলে মিলনসাধন করান ও পত্রিহারী বা পত্রের বাহকমাত্র ভেদে তিন প্রকার।

হরিবল্লভাপ্রকরণে নায়িকাদিগকে স্বকীয়া ও পরকীয়াভেদে দুই প্রকার ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। দ্বারকার ১৬১০৮টি মহিষী স্বকীয়া। যাঁহারা নায়কের সহিত বিবাহিত না হইয়াও আসক্তিবশে আত্মসমর্পণ করেন তাঁহারা পরকীয়া। ইঁহারা কুমারীও হইতে পারেন, অপরের বিবাহিতাও হইতে পারেন। রূপ বলেন যে পরোঢ়া ব্রজদেবীরা শোভা, সদ্‌গুণ ও বৈভবে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী হইতেও অধিক মহাপ্রেমমাধুর্যভাবে বিভূষিতা। পরকীয়াদেবীরা আবার সাধনসিদ্ধা, নিত্যসিদ্ধা ও দেবীভেদে তিন প্রকারের। সাধনসিদ্ধারা আবার যূথবিশেষের অন্তর্ভুক্ত ও অযৌথিকাভেদে দুই রকমের। পদ্মপুরাণে কথিত আছে যে দণ্ডকারণ্যে যে সব মুনি রামচন্দ্রের সৌন্দর্য দেখিয়া স্ত্রীভাবে তাঁহাকে ভজন করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারাই সাধনসিদ্ধা যৌথিকী গোপীরূপে ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন। উপনিষদ সমূহও গোপীরূপে আবির্ভূত হন। কোন কোন ভাগ্যবতী দেবপত্নী গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। হরিবল্লভাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা হইতেছেন নিত্যসিদ্ধারা—তাঁহাদের মধ্যে আবার রাধা ও চন্দ্রাবলী মুখ্যা।

শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপা, হ্লাদিনীশক্তির সারভূতা। শ্রীরাধার নামের ঐতিহ্য বর্ণনা করিতে যাইয়া রূপ গোপালোত্তরতাপনী, ঋক্‌পরিশিষ্ট ও পদ্মপুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। গোপালোত্তরতাপনীতে অবশ্য রাধার নাম নাই, গন্ধর্বার নাম আছে, কিন্তু রূপ উভয়কে একার্থবাচক ধরিয়াছেন। শ্রীরাধার প্রধান গুণসমূহের মধ্যে রূপ নিম্নলিখিত পঁচিশটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন,—

(১) মধুরা, (২) নববয়স্কা, (৩) চঞ্চল কটাক্ষবিশিষ্টা, (৪) উজ্জ্বল মৃদু-মধুরহাস্যকারিণী, (৫) সৌভাগ্যসূচক রেখাযুক্তা, (৬) গন্ধে মাধবের উন্মাদনা-বিধায়িনী, (৭) সঙ্গীতনিপুণা, (৮) রম্যবাক্, (৯) নর্মপণ্ডিতা, (১০) বিনীতা,

(১১) করুণাপূর্ণা, (১২) বিদগ্ধা, (১৩) চাতুরীযুক্তা, (১৪) লজ্জাশীলা, (১৫) সুমর্যাদা, (১৬) ধৈর্যশালিনী, (১৭) গাম্ভীর্যশালিনী, (১৮) সুবিলাসা, (১৯) মহাভাবের অতিশয় প্রাকট্যে পরমব্যগ্রা, (২০) গোকুলপ্রেমবসতি, (২১) ব্রহ্মাণ্ডসমূহে তাঁহার যশ ব্যাপৃত হয়, (২২) তিনি গুরুজনের নিকট মহাস্নেহ পান, (২৩) সখীদের প্রণয়ের বশীভূতা, (২৪) কৃষ্ণের শ্রেয়সীদের মধ্যে প্রধানা, ও (২৫) মাধবের নিত্য অধীনা।

নায়িকাভেদ প্রকরণে প্রাচীন রীতি অনুসারে রূপ মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা নায়িকার ভেদ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা—নায়িকাদিগকে এই আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

পদাবলী সাহিত্য বিশেষ করিয়া গোবিন্দদাস, ঘনশ্যাম, রাধামোহন, নরহরি চক্রবর্তী প্রভৃতির রচনা তাঁহার বিশ্লেষণ হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

রূপ যূথেশ্বরীগণের মতন সখীদেরও দ্বাদশটি পর্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন। সখীদের মধ্যে কেহ বা বামা, কেহ বা দক্ষিণা, কেহ বা সমস্নেহা, কেহ বা অসমস্নেহা। সখীরাই রাধাকৃষ্ণের মিলন সাধনের প্রধান উপায়। কৃচিৎ রাধা সখীর সহিতও কৃষ্ণের মিলন ঘটাইয়া থাকেন। উদ্দীপনবিভাগে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রেয়সীদের গুণ, নাম, চরিত্র, ভূষণ প্রভৃতি বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া বংশীরব, শৃঙ্গধ্বনি, গীত, সৌরভ, ময়ূরপুচ্ছ, গুঞ্জামালা প্রভৃতি তৎসম্বন্ধী বস্তু; গোবর্ধন, যমুনা, কুঞ্জ, কদম্ব প্রভৃতি তদাশ্রিত বস্তু এবং জ্যোৎস্না, মেঘ, শরৎ, বসন্ত প্রভৃতি তটস্থ বস্তুও উদ্দীপন করে।

অনুভাব প্রকরণে ২০ প্রকারের অলংকার, ৭ প্রকারের উদ্ভাস্বর ও ১২ প্রকারের বাচিক অনুভাব বর্ণিত হইয়াছে। উদ্ভাস্বরের মধ্যে আছে নীবিবন্ধ খুলিয়া যাওয়া, উত্তরীয় খুলিয়া যাওয়া, চুল খুলিয়া যাওয়া, হাইতোলা, গা মোড়া দেওয়া, নাসার প্রফুল্লতা, নিঃশ্বাস ত্যাগ, বিলুঠিত হওয়া, গীত করা, লোকের অপেক্ষা না রাখিয়া বিলাপাদি করা, ঘূর্ণা, হিক্কা প্রভৃতি। উদ্ভাস্বরের কথা রূপের পূর্বে রসশাস্ত্রে আলোচিত হয় নাই।

রূপের মৌলিকতা ফুটিয়াছে সব চেয়ে বেশী তাঁহার স্থায়ীভাব প্রকরণে। শৃঙ্গাররসে মধুরা রতিকে স্থায়ীভাব বলে। রতি তিন প্রকারের সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। যাহাতে সম্ভোগের ইচ্ছাই মূল কারণ তাহা সাধারণী, যেমন কুব্জার। পতিপত্নীর সম্বন্ধ বিষয়ে অভিমান হইতে সমঞ্জসা রতির উদ্ভব; ইহাতে কর্তব্যবুদ্ধিও থাকে, আবার সুরত লালসাও জাগে,—যেমন দ্বারকার মহিষীদের। সমর্থা রতিতে শ্রীকৃষ্ণের সুখবাসনাই মাত্র উদিত হয়। ইহাতে, কুল, ধর্ম, ধৈর্য, লজ্জা প্রভৃতি

সকল বাধা বিঘ্ন ভুলিয়া যাইতে হয়। ইহা কেবলমাত্র ব্রজগোপীদের মধ্যে দেখা যায়।

রতি হইতে যথাক্রমে প্রেম, প্রণয়, মান, স্নেহ, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাবের বিকাশ হয়। রতি বা ভালবাসা নষ্ট হইবার কারণ থাকিলেও যাহা কোন প্রকারেই ধ্বংস হয় না সেই নিশ্চলরূপ বন্ধনকে প্রেম বলে। ইহা গাঢ়তাক্রমে, প্রৌঢ়, মধ্য, ও মন্দ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রেম যখন চিত্তরূপ প্রদীপে প্রকাশ করিয়া হৃদয়কে দ্রবীভূত করে তখন উহা স্নেহনামে কথিত হয়। ইহা ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ ভেদে দুই প্রকার। ঘৃতস্নেহে নায়িকা নায়কের প্রতি কিছুটা সম্ভ্রমবুদ্ধি পোষণ করেন, মধুস্নেহে নায়িকা মনে করেন নায়ক আমারই। ইহা অন্য ভাবের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই মাধুর্য প্রকট করে—ঘৃতস্নেহ কিন্তু অন্যভাবের অপেক্ষা রাখে। মধুস্নেহ সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিবার ক্ষমতা রাখে। মান এখানে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যে স্নেহ যুগলকে নূতন মাধুর্য অনুভব করাইয়া আবার বাহিরে বাম্যভাব ধারণ করে, তাহাকে মান বলে। ইহা উদাত্ত ও ললিত ভেদে দ্বিবিধ। গাঢ়বিশ্বাস ধারণ করিলে ঐ মান প্রণয় নামে অভিহিত হয়। বিশ্রম্ভই এই প্রণয়ের স্বভাব। বিশ্রম্ভ মৈত্র্য ও সখ্যভেদে দুই প্রকার। যেখানে গৌরব বা সম্ভ্রম বোধ থাকে তাহা মৈত্র্য, আর সখ্য হইতেছে সম্ভ্রমবিহীন। প্রণয়ের উৎকর্ষবশে যেখানে চিত্তে অতিদুঃখকেও পরম সুখরূপে বোধ করায় তাহার নাম রাগ। ইহা নীলিমা ও রক্তিমা ভেদে দুই প্রকার। নীলিমা আবার নীলী ও শ্যামাভেদে দ্বিবিধ। নীলির ভাবের বাহিরে প্রকাশ বাম, শ্যামাভাবে অল্প একটু প্রকাশ হয়। রক্তিম রাগকে কুসুম্ভ ও মঞ্জিষ্ঠ এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। যে রাগ কিছুতেই নষ্ট হয় না এবং যাহা অন্য কোনভাবের অপেক্ষা রাখে না তাহাই মঞ্জিষ্ঠ রাগ। অনুরাগের বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহাতে অনুভূত দয়িতকেও অননুভূতবৎ প্রতীয়মান করায় এবং প্রতিক্ষণে নবীনতা দান করে। ইহাতে পরস্পর বশীভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য বা প্রিয়জনের কাছে থাকিলেও বিরহবোধ, অ-প্রাণীতে জন্মলাভের উৎকট লালসা এবং বিপ্রলম্ভেও যেন প্রিয়জন কাছে আছেন এইভাব জাগে।

অনুরাগের পরের অবস্থা মহাভাব, ইহা রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে দ্বিবিধ। স্তম্ভ, বৈবর্ণ্য প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক ভাববিকার যেখানে কিছুতেই গোপন করা যায় না তাই রূঢ় ভাব। ইহাতে চোখের পলক পড়িলেও যেন দর্শনের বিঘ্নকে অসহ্য মনে হয়। প্রেমের গভীরতায় সকল লোকের হৃদয় বিলোড়ন করে, কল্পকাল ধরিয়া মিলনও ক্ষণস্থায়ী মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণের কষ্ট হইতেছে ভাবিয়া খিন্নতা, মোহ না হইলেও সব কিছু ভুলাইয়া দেয়, ক্ষণকালের বিরহকে কল্পকালস্থায়ী বলিয়া বোধ

হয়। রূঢ় মহাভাব অপেক্ষাও অধিরূঢ় মহাভাব গভীরতর। ইহা মোদন ও মাদনভেদে দুই প্রকার। মোদনে কান্তার আশ্লেষেই মূর্ছা জন্মে, নিজে অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়াও দয়িতের সুখকামনা জাগে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে যেন দুঃখে মগ্ন করে, পশুপক্ষীকেও কাঁদাইয়া ছাড়ে, মরণ হইলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পঞ্চমহাভূতরূপে মিলন হইবে এই বাঞ্ছা করে।

মোহনভাবে দিব্যোন্মাদ জন্মে। ইহার উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্প প্রভৃতি অনেক ভেদ আছে। চিত্রজল্পে একইকালে গর্ব, অসূয়া, দৈন্য, চাপল্য, ঔৎসুক্যাদিভাব উপস্থিত হয় এবং তীব্র উৎকণ্ঠাযুক্ত আলাপ করায়। ইহার আবার প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প এই দশটি ভেদ। ভাগবতের ভ্রমরগীতার দশটি শ্লোক (১০।৪৭) হইতে এই সব ভাবের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

অধিরূঢ় মোদন হইতেও উৎকৃষ্ট যে মহাভাব তাহাকে মাদন বলে। ইহা কেবলমাত্র শ্রীরাধাতেই সর্বদা বিরাজ করে। ইহা ললিতাদি প্রিয়নর্মসখীরও হয় না। ইহাতে বনমালার মতন অযোগ্য বস্তুতেও প্রচুর ঈর্ষ্যা জাগায় এবং সর্বদা ভোগ করিলেও যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ আছে এমন বস্তুকেও স্তুতি করে।

সাধারণী রতির সীমা প্রেম পর্যন্ত, সমঞ্জসার অনুরাগ পর্যন্ত এবং কেবল মাত্র সমর্থা রতিতেই মহাভাব জন্মিতে পারে। উজ্জ্বলনীলমণির শেষভাগে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। বিপ্রলম্ভে পূর্বরাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য ও প্রবাস এই চারিভেদ। সম্ভোগ সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমৎ ভেদে চারিপ্রকার।

উজ্জ্বলনীলমণির কোনও নির্দিষ্ট রচনাকাল গ্রন্থশেষে প্রদত্ত হয় নাই। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু ইহাতে উদ্ধৃত হওয়ায় ১৫৪১ খৃষ্টাব্দের পরে ইহা রচিত হইয়াছিল জানা যায়। অন্যদিকে ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে রচিত সনাতনের বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণীতে ইহার উল্লেখ আছে (২৯।৭, ৩০।২, ৪৭।১১ পুরীদাস সং)। সুতরাং ১৫৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে ইহা রচিত হইয়া থাকিবে।

মথুরামাহাত্ম্য—জীব লঘুতোষণীর উপসংহারে যাহাকে মথুরামহিমা, কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে মথুরামাহাত্ম্য ও নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকরে যাহাকে মথুরামহিমা বলিয়া লিখিয়াছেন তাহাই রূপ সংকলিত মথরামাহাত্ম্য।

গ্রন্থের প্রারম্ভ এইরূপ,—

হরিরপি ভজমানেভ্যঃ প্রায়ো মুক্তিং দদাতি ন তু ভক্তিম্
বিহিততদুন্নতসত্রাং মথুরে ধন্যাং নমামি ত্বাং ॥

ধন্যানাং হৃদয়ানন্দং পদং সংগৃহ্যতে মুদা।
মাহাত্ম্যং মথুরাপুর্য্যাঃ সর্বতীর্থশিরোমণেঃ।

কেহ কেহ বরাহপুরাণের অন্তর্গত মথুরামাহাত্ম্যকে রূপরচিত মথুরামাহাত্ম্যের সহিত অভিন্ন মনে করিয়াছেন।[১] ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত মত। রূপ কৃত মথুরামাহাত্ম্য ও বরাহপুরাণান্তর্গত মথুরামাহাত্ম্যের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই। দুইটিই পৃথক গ্রন্থ। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে এই দুই গ্রন্থের পৃথক্ পুঁথি আছে।

বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরে রূপকৃত মথুরামাহাত্ম্যের অনেকগুলি পুঁথি আছে। ৪৫৮ গৌরাব্দে হরিদাস দাস কর্তৃক এবং ৪৬০ গৌরাব্দে পুরীদাস কর্তৃক ইহা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি সম্ভবতঃ লুপ্ততীর্থ উদ্ধার কালে সংকলিত হইয়া থাকিবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, মথুরামাহাত্ম্যে শ্রীরাধার শ্বশুরালয় যাবট ও পিত্রালয় বর্ষাণের নাম নাই। অথচ নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনাতে যাবটের নাম আছে। ইহা হইতে মনে হয় এই সময়ের মধ্যে সম্ভবতঃ এই গ্রাম দুইটির উদ্ভব হইয়াছে।

পদ্যাবলী—রূপ এই গ্রন্থে তাঁহার সমসাময়িক ও প্রচীন বহু খ্যাত ও অখ্যাতনামা কবিদের রচিত প্রকীর্ণ শ্লোকসমূহের সংকলন করিয়াছেন। অবশ্য রূপ এই জাতীয় সংকলন গ্রন্থের প্রথম পথপ্রদর্শক নহেন। রূপেরও পূর্বে বাংলাদেশে বৌদ্ধ সংগ্রাহক বিদ্যাকরের কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, (সুভাষিতরত্নকোশ), শ্রীধর দাসের সদুক্তি-কর্ণামৃতের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে রূপের গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ইহাই যে, ইহাতে যে সব শ্লোক সংকলিত হইয়াছে তাহার সব কয়টিই প্রায় রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক। এমন কি রূপ তাঁহার পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কবিদের রচনা রাধাকৃষ্ণলীলার পট-ভূমিকায় গ্রথিত করিতে গিয়া মূল শ্লোকের কিছু কিছু শব্দকেও পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন। পদ্যাবলীর প্রথম শ্লোকে রূপ গ্রন্থ রচনার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

পদ্যাবলী বিরচিতা রসিকৈর্মুকুন্দ
সম্বন্ধ-বন্ধুরপদা প্রমদোর্মিসিন্ধু।
রম্যা সমস্ততমসাং দমনী ক্রমেণ
সংগৃহ্যতে কৃতিকদম্বকৌতুকায়।

বস্তুত নিজের স্বীকৃত বৈষ্ণবতত্ত্ব এবং রসকে উপলব্ধি করাইবার জন্যই রূপ বৈষ্ণবদের জন্যই ইহা সংকলিত করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে এই সংকলন সুপরিচিত।

পদ্যাবলীতে রূপ নিজেকে লইয়া জ্ঞাত ও অজ্ঞাত প্রায় ১২৫ জন কবির মোট

১ J. N. Farquhar—*An outline of the Religious Literature of India*, p. 310

৩৮৬টি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। নিম্নে কবিদের নাম ও তাঁহাদের রচিত শ্লোকের সংখ্যা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল,—

১। অঙ্গদ (১), ২। অপরাজিত (১), ৩। অবিলম্ব সরস্বতী (১), ৪। অভিনন্দ (১), ৫। অমরু (৫), ৬। অমিষা (১), ৭। আগম (২), ৮। আনন্দ (১), ৯। আনন্দাচার্য (১), ১০। ঈশ্বরপুরী (৩), ১১। উমাপতি ধর (৪), ১২। উৎকল (৩), ১৩। কঙ্ক (২), ১৪। কর্ণপূর (১), ১৫। কবিচন্দ্র (৪), ১৬। কবিরত্ন (৪), ১৭। কবিরাজ মিশ্র (২), ১৮। কবিশেখর (১), ১৯। কবি সার্বভৌম (১), ২০। কুমার (১), ২১। কৃষ্ণদেব (১), ২২। কেশব ছত্রী (১), ২৩। কেশব ভট্টাচার্য (১), ২৪। ক্ষেমেন্দ্র (১), ২৫। গজপতি পুরুষোত্তমদেব (৬), ২৬। গোপাল ভট্ট (১), ২৭। গোবর্ধনাচার্য (৪), ২৮। গোবিন্দ (১), ২৯। গোবিন্দ ভট্ট (২), ৩০। গোবিন্দ মিশ্র (৩), ৩১। গৌড়ীয় (১), ৩২। চক্রপাণি (১), ৩৩। চিরঞ্জীব (১), ৩৪। জগদানন্দ রায় (১), ৩৫। জগন্নাথ সেন (২), ৩৬। জয়ন্ত (১), ৩৭। জীবদাস বাহিনীপতি (১), ৩৮। তৈরভুক্ত (৫), ৩৯। ত্রিবিক্রম (১), ৪০। দশরথ (১), ৪১। দাক্ষিণাত্য (৬), ৪২। দামোদর (১), ৪৩। দিবাকর (১), ৪৪। দীপ (১), ৪৫। দীপক (১), ৪৬। দৈত্যারিপণ্ডিত (১), ৪৭। ধনঞ্জয় (১), ৪৮। ধন্য (১), ৪৯। নাথোক (১), ৫০। নারদ (২), ৫১। নীল (১), ৫২। পঞ্চতন্ত্রকৃৎ (১), ৫৩। পুরুষোত্তমাচার্য (১), ৫৪। পুষ্করাক্ষ (১), ৫৫। সনাতন (১), ৫৬। বাণ (১), ৫৭। শ্রীচৈতন্য (৮), ৫৮। ভট্টনারায়ণ (১), ৫৯। ভবভূতি (২), ৬০। ভবানন্দ (২), ৬১। ভীমভট্ট (১), ৬২। মনোহর (২), ৬৩। ময়ূর (১), ৬৪। মাধব (১), ৬৫। মাধব চক্রবর্তী (১), ৬৬। মাধব সরস্বতী (১), ৬৭। মাধবেন্দ্রপুরী (৫), ৬৮। মুকুন্দ ভট্টাচার্য (৩), ৬৯। মোটক (১), ৭০। যাদবেন্দ্রপুরী (২), ৭১। যোগেশ্বর (২), ৭২। রঘুনাথ দাস (৩), ৭৩। রঘুপতি উপাধ্যায় (৬), ৭৪। রঙ্গ (৬), ৭৫। রামচন্দ্র দাস (৩), ৭৬। রামানন্দ রায় (১), ৭৭। রামানুজ (১), ৭৮। রুদ্র (৮), ৭৯। রূপগোস্বামী (৩৪), ৮০। রূপদেব (১), ৮১। লক্ষ্মণসেনদেব (৩) ৮২। লক্ষ্মীধর (৪), ৮৩। বনমালী (১), ৮৪। বাণীবিলাস (১), ৮৫। বসুদেব (১), ৮৬। বাসব (১), ৮৭। বাহিনীপতি (১), ৮৮। বিশ্বনাথ (১), ৮৯। বিষ্ণুপুরী (২), ৯০। বীর সরস্বতী (১), ৯১। ব্যাস (৫), ৯২। শঙ্কর (৪), ৯৩। শচীপতি (১), ৯৪। শম্ভু (১), ৯৫। শরণ (১), ৯৬। শান্তিকর (১), ৯৭। শারদাকর (১), ৯৮। শিবমৌলী (১), ৯৯। শুভ্র (১), ১০০। শুভাঙ্ক (১), ১০১। শ্রীকরাচার্য (১), ১০২। শ্রীগর্ভ কবীন্দ্র (১), ১০৩। শ্রীধর স্বামী (২), ১০৪। শ্রীমৎ (১), ১০৫। শ্রীবৈষ্ণব (২), ১০৬। ষষ্ঠীদাস (৩), ১০৭। ষাণ্মাসিক (২), ১০৮। সঞ্জয় কবিশেখর (৪), ১০৯। সর্বজ্ঞ (২), ১১০। সর্বভট্ট (১), ১১১। সর্ববিদ্যাবিনোদ

(৮), ১১২। সর্বানন্দ (৩), ১১৩। সারঙ্গ (১), ১১৪। সার্বভৌম ভট্টাচার্য (৭), ১১৫। সুদেব (১), ১১৬। সুবন্ধু (১), ১১৭। সূর্যদাস (১), ১১৮। সুরোত্তমাচার্য (১), ১১৯। সোহ্লোক (১), ১২০। হনুমৎ (১), ১২১। হর (৪), ১২২। হরি (২), ১২৩। হরিদাস (১), ১২৪। হরিভট্ট (২), ১২৫। হরিহর (৪)।

পদ্যাবলীতে শ্রীচৈতন্যনমস্ক্রিয়ার অনুল্লেখে ডঃ সুশীলকুমার দে ইহাকে শ্রীচৈতন্যের সহিত রূপের সাক্ষাতের পূর্ববর্তী রচনা বলিয়াছেন।[১] কিন্তু রূপ পদ্যাবলীর অন্ত্যে বলিয়াছেন,—

জয়দেব-বিল্বমঙ্গলমুখৈঃ কৃতা যেঽত্র সন্তি সন্দর্ভাঃ।
তেষাং পদ্যানি বিনা সমাহৃতানীতরাণ্যত্র॥

জয়দেব, বিল্বমঙ্গলের রচিত সন্দর্ভব্যতিরিক্ত এই গ্রন্থ সংকলিত হইয়া থাকিলে রূপ উক্ত গ্রন্থ দুইটির সহিত পরিচিত ছিলেন জানা যায়। চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীচৈতন্যই সর্বপ্রথম বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত আবিষ্কার করিয়া দক্ষিণদেশ হইতে আনেন (চৈ. চ. ২।৯।২৭৭-২৭৮)। তাহা হইলে শ্রীচৈতন্য-কর্তৃক আনীত গ্রন্থের সহিত রূপের পরিচয় শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাতের পর ঘটিয়াছিল দেখা যায়। সুতরাং পদ্যাবলী রূপ শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের পর সংকলন করিয়াছিলেন বোঝা যায়। তাহা ছাড়া, পদ্যাবলীতে শ্রীচৈতন্যরচিত শিক্ষাষ্টক উদ্ধৃতি, রঘুনাথ দাস ও গোপাল ভট্টের রচিত শ্লোকের উদ্ধৃতি থাকায় শ্রীচৈতন্যের সহিত রূপের সাক্ষাতের বেশ কিছুকাল পরে ইহা সংকলিত প্রমাণিত হয়।

পদ্যাবলী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহা ১৫৪১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোন এক সময়ে সংকলিত হইয়া থাকিবে।

নিত্যানন্দবংশীয় মাড়গ্রামনিবাসী বীরচন্দ্র গোস্বামীকৃত পদ্যাবলীর একটি টীকা পাওয়া গিয়াছে। টীকাটির নাম শব্দার্থবোধিকা। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বহরমপুর হইতে এই টীকাসহ পদ্যাবলীর প্রথম প্রকাশ করেন।

নাটকচন্দ্রিকা—বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নামক দুইটি নাটকের লক্ষণ, উদাহরণ ও লক্ষ্যবিষয়ের সমন্বয় সাধনোদ্দেশ্যে নাটকচন্দ্রিকা রচিত। ললিতমাধব নাটকলক্ষণে বিশিষ্ট বলিয়া নাটকচন্দ্রিকার প্রায় প্রত্যেক লক্ষণের উদাহরণ ললিত-মাধব হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে রূপ ভরতের নাট্যশাস্ত্র, শিঙ্গভূপালের রসসুধাকর দেখিয়া নাটকের লক্ষণ রচনা করেন বলিয়াছেন।

বীক্ষ্য ভরতমুনিশাস্ত্রং রসপূর্বসুধাকরঞ্চ রমণীয়ম্।
লক্ষণমতিসংক্ষেপাদ্ বিলিখ্যতে নাটকস্যেদম্॥

১ *Padyavali*, Introduction, p. li

নাতীব-সঙ্গতত্বাদ্ ভরতমুনের্মতবিরোধাচ্চ ।
সাহিত্যদর্পণীয়া ন গৃহীতা প্রক্রিয়া প্রায়ঃ ॥

ভরতমুনির মতের সহিত অনৈক্য এবং অসঙ্গতি হেতু সাহিত্যদর্পণের মত গ্রহণ করেন নাই বলিয়াছেন। এই গ্রন্থে নাটক লক্ষণ ; দিব্য, দিব্যাদিব্য ও অদিব্য—এই তিন প্রকার নায়ক ; আশীর্বাদ, নমস্ক্রিয়া ও বস্তুনির্দেশভেদে—তিন প্রকার নান্দী ; কথোদ্‌ঘাত, প্রবর্তক, প্রয়োগাতিশয়, উদ্‌ঘাত্যক ও অবলগিত—এই পাঁচ প্রকার আমুখ ; বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী এবং প্রধান কার্য ও অঙ্গকার্য এই পাঁচ প্রকার প্রকৃতি ; আরম্ভ, যত্ন, প্রত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম—এই পাঁচ প্রকার অবস্থা ; মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও উপসংহৃতি—এই পাঁচ প্রকার সন্ধ্যঙ্গ ; চারি প্রকার পতাকাস্থান ; বিস্কম্ভক, চুলিকা, অঙ্কাস্য, অঙ্কাবতার, প্রবেশকাদি অর্থোপক্ষেপকসমূহ ; স্বগত, প্রকাশ, জনান্তিক প্রভৃতি নাট্যোক্তিসমূহ ; অঙ্কের স্বরূপ, নাটকের রস ; সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষাবিধান ; ভারতী, আরভটী, সাত্বতী ও কৈশিকী এই চারিটি বৃত্তি ও ইহাদের ভেদসমূহ ; নর্ম ও উহার বিভেদ প্রভৃতি বিষয় লক্ষণ ও উদাহরণসহ বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ইঙ্গিতে নাটকচন্দ্রিকাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে (বৃত্তয়োর্নাট্যমাতৃত্বাদুক্তা নাটকলক্ষণে—৪।১।৪২)। জীব ইহার টীকাতে বলিয়াছেন, 'নাটকলক্ষণে নাটকচন্দ্রিকাখ্যে স্বকৃতে ইতি জ্ঞেয়ম্'। সুতরাং নাটকচন্দ্রিকা ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর পূর্বে অর্থাৎ ১৫৪১ খৃস্টাব্দের পূর্বে রচিত হইয়াছিল। নাটকচন্দ্রিকায় বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব এবং পদ্যাবলী হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহা ললিতমাধবের পরে অর্থাৎ ১৫৩৭ খৃস্টাব্দের পরে রচিত স্পস্ট জানা যাইতেছে। সুতরাং নাটকচন্দ্রিকার রচনাকাল ১৫৩৭ খৃস্টাব্দ হইতে ১৫৪১ খৃস্টাব্দের মধ্যে হইবে।

লঘুভাগবতামৃত—রূপ গ্রন্থপ্রারম্ভে বলিয়াছেন যে তিনি সনাতনকৃত গ্রন্থকে সংক্ষেপে বলিয়াছেন।

শ্রীমৎপ্রভুপদাম্ভোজৈঃ শ্রীমদ্ভাগবতামৃতম্ ।
যদ্ ব্যতানি তদেবেদং সংক্ষেপেণ নিষেব্যতে ॥

যদিও ইহা সংক্ষেপীকৃত বলিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি সম্পূর্ণ নূতন গ্রন্থ। সনাতনের অন্তর্নিহিত তথ্যকে বিস্তৃত করিয়াছিলেন বলিয়া দৈন্যবশতঃ তিনি এইরূপ বলিয়াছেন।

ইহা শ্রীকৃষ্ণামৃত ও ভক্তামৃত এই দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ রূপ ও অবতার লীলার বিশ্লেষণ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে তদীয়গণের আরাধনার উৎকর্ষ দেখাইয়া ভক্তগণের মধ্যে তারতম্য দেখান হইয়াছে। কৃষ্ণামৃত অংশে রূপ বলিতে চাহিয়াছেন যে, কৃষ্ণের স্বরূপ তিন প্রকার—স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও

আবেশ। নানা গ্রন্থে ও ঐতিহ্যে বিবৃত সকল অবতারই কৃষ্ণের অবতার ; এই অবতারসমূহ ত্রিবিধ,—

পুরুষাবতার—তিনরূপে প্রকাশিত ; মহৎস্রষ্টা, অণ্ডসংস্থিত ও সর্বভূতস্থিত।

গুণাবতার—সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু, রজোগুণের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা এবং তমোগুণের অধিষ্ঠাতা শিব।

লীলাবতার—এই অবতার এখানে বর্ণিত হয় নাই। ভাগবতে (১।৩) ২৪টি অবতার বলা হইয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে রূপ কৃষ্ণের মধ্যে একত্ব-পৃথকত্ব ও অংশিত্ব-অংশত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ গুণের অবস্থান আলোচনা করিয়াছেন। রূপের মতে, কৃষ্ণ বাসুদেব নহেন। বাসুদেব পুরুষাবতারের একটি প্রকাশমাত্র কিন্তু 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'। ভক্তামৃত অংশে ভক্ত-পূজার প্রয়োজনীয়তা, ভক্তের শ্রেণী বিভাগ, প্রহ্লাদ, পাণ্ডবগণ, যাদবগণ, উদ্ধব, ব্রজ-গোপীগণ ও তাঁহাদের মহিমাধিক্য এবং রাধার সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। সনাতন কাব্য লিখিয়াছেন আর রূপ নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। সুতরাং রূপকে বিবিধ গ্রন্থের উল্লেখ ও উদ্ধৃতির সাহায্যে বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছে। মহাভারত, পুরাণ, ভাগবত, তন্ত্র, গীতা, বেদান্তসূত্র ও নানা ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ক বহু গ্রন্থ রূপ আলোচনা করিয়াছেন। লঘুভাগবতামৃত হরিভক্তিবিলাসে উদ্ধৃত হইয়াছে (১১।৩৩৯, ৩৪৯, ৩৮৪ পুরীদাস সং)। হরিভক্তিবিলাস ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উদ্ধৃত হওয়ায় ইহাকে নিঃসন্দেহে ১৫৪১ খৃষ্টাব্দের পূর্বের রচনা বলা যায়।

বলদেব বিদ্যাভূষণ ইহার উপর 'সারঙ্গরঙ্গদা' নামে ও বৃন্দাবনচন্দ্র তর্কালংকার 'রসিকরঙ্গদা নামে একটি টীকা লেখেন। এই দুইটি টীকাযোগে লঘুভাগবতামৃত গৌরচন্দ্র ভাগবতদর্শনাচার্য ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন।

সামান্য বিরুদাবলী লক্ষণ—কৃষ্ণদাস কবিরাজ রূপের গ্রন্থতালিকা প্রদানকালে গোবিন্দ বিরুদাবলী ও তাহার লক্ষণের কথা বলিয়াছেন (চৈ. চ. ২।১।৪০)। নরহরি চক্রবর্তীও ভক্তিরত্নাকরে বলিয়াছেন, 'সংক্ষেপে করিল আর বিরুদলক্ষণ' (প্রথম তরঙ্গ)। বলদেব বিদ্যাভূষণ স্তবমালার অন্তর্গত গোবিন্দবিরুদাবলীর ভাষ্য করিতে গিয়া এই 'লক্ষণের' কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

অধীত্য বিরুদাবল্যা লক্ষণং গ্রন্থকৃৎকৃতম্।
এতাং চেৎ পঠতি প্রাজ্ঞস্তদা বোধোঽস্য পুষ্কলঃ ॥
সামান্যবিরুদাবল্যা গোবিন্দবিরুদাবলৌ।
যোঽভ্যধায়ি বিশেষস্তৈঃ স তাবদিহ লিখ্যতে ॥

জীবের তালিকায় ইহার উল্লেখ না থাকিলেও এই সমস্ত প্রমাণবলে ইহা যে রূপকৃত তাহা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

রূপ কৃষ্ণের নমস্ক্রিয়াপূর্বক গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন।

প্রণম্য পরমানন্দং বৃন্দারণ্য-পুরন্দরম্।
লিখ্যতে বিরুদাবল্যাঃ সংক্ষেপোল্লক্ষণং ময়া ॥

রূপ এই গ্রন্থে প্রধানতঃ কলিকা, শ্লোক ও বিরুদের লক্ষণ ও প্রকারভেদ উদাহরণসহ বলিয়াছেন। তালনিয়ন্তা পদসমূহকে 'কলা' ও কয়েকটি কলার সমষ্টিকে একটি 'কলিকা' বলা হয়। কলার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৬৪টি ও সর্বনিম্ন ১২টি। কলিকায় সংযুক্ত বর্ণের নিয়ম—মধুর, শ্লিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, শিথিল ও হ্লাদী। এই পাঁচটির প্রত্যেকটি আবার হ্রস্ব ও দীর্ঘ বর্ণের সহিত যুক্ত হইয়া দশ প্রকার হয়। কলিকার আদিতে ও অন্ত্যে নায়কের গুণোৎকর্ষসূচক শ্লোক থাকে। গুণোৎকর্ষাদি বর্ণনকে 'বিরুদ' বলে। রূপ এই গ্রন্থে গোবিন্দবিরুদাবলী হইতে প্রায় সকল উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

রূপের নামে আরোপিত গ্রন্থ ও স্তবাদি

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal গ্রন্থে (p. 30) এবং কৃষ্ণমাচারিয়ার তাঁহার History of Classical Sanskrit Literature গ্রন্থে (p. 288) আনন্দমহোদধি নামে একটি গ্রন্থ রূপকৃত বলিয়াছেন। এই গ্রন্থের কোন পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় নাই। মনে হয়, ভক্তিরত্নাকরের নিম্ন উক্তির তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া ইঁহারা ভ্রান্তি করিয়াছেন।

ললিতমাধব বিপ্রলম্ভের অবধি।
দানলীলাকৌমুদী আনন্দমহোদধি ॥—ভ. র. ১।৮১৪

দানলীলাকৌমুদী আনন্দের সমুদ্রবিশেষ ইহাই নরহরি চক্রবর্তী অভিপ্রেত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা তাহা না বুঝিয়া আনন্দমহোদধি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসাবে ধরিয়াছেন।

নগেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বকোষে (১৬শ খণ্ড, পৃঃ ৬৯১) রূপের নামে এমন কতকগুলি গ্রন্থ আরোপ করিয়াছেন যাহা জীব ও রঘুনাথ দাস প্রকৃতপক্ষে রচনা করিয়াছেন।

সম্ভবতঃ অফ্রেতের তালিকা প্রভাবেই ইহা করা হইয়াছে। অফ্রেত Catalogus Catalogorum গ্রন্থে (Vol. I, p. 533) রূপের গ্রন্থতালিকায় গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু, পরমার্থসন্দর্ভ, প্রীতিসন্দর্ভ, ব্রজবিলাসস্তব, হরিনামামৃত ব্যাকরণ ইত্যাদি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এইগুলি নগেন্দ্রনাথ বসু রূপের নামে উদ্ধার করিয়াছেন। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তও অফ্রেতের প্রদত্ত বিবরণীর কোনরূপ বিচার না করিয়া রূপের নামেই ঐ তালিকা তাঁহার Indian Philosophy (Vol. IV,

p. 394 fn.) ও A History of Sanskrit Literature (Vol. I, p. 664 fn.) গ্রন্থদ্বয়ে উদ্ধৃত করিয়াছেন। রঘুনাথ দাস ও জীবের গ্রন্থ সর্বসাধারণের পরিচিত বলিয়া ইহা প্রমাণের কোনও অপেক্ষা রাখে না।

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ১৯২৭ সালে বঙ্গবাণী কার্যালয় হইতে শ্রীরূপচিন্তামণি নামে একটি গ্রন্থ শ্রীরূপ প্রণীত বলিয়া প্রকাশ করেন। ইহাতে ৩২টি পদ্যে রাধা-কৃষ্ণের করচরণচিহ্নাদি ও রূপের বর্ণনা আছে। এই স্তবটি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত স্তবামৃতলহরীতে পাওয়া যায়। যদি ইহা রূপেরই হইত তাহা হইলে ইহা জীব স্তবমালায় ধরিতেন এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর গ্রন্থে ইহা সন্নিবিষ্ট হইত না।

বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পুঁথি বিভাগ অনুসন্ধান করিয়া রূপের নামে যে সমস্ত স্তব ও গ্রন্থ আরোপিত পাওয়া গিয়াছে তাহার একটি তালিকা দেওয়া যাইতেছে।

অদ্বৈতস্তবরাজ (পাণিহাটি গ্রন্থমন্দির পুঁথি নং ৯)—

আরম্ভ ঃ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ
অদ্বৈতং পরমানন্দ প্রেমানন্দকারণং।
পরাৎপরং ব্রহ্ম আচার্য দ্বিজরূপীণং॥
চৈতন্যজীবানন্দং নিত্যানন্দং অভেদয়ম্।
একাঙ্গত্রিবিধারূপং গোবিন্দকরুণাময়ং॥

অন্ত্য ঃ সর্বভক্তশিরোধার্যং সর্বশক্তিসমন্বিতং।
শরণানন্দঃ সর্বজীবঃ প্রাণবন্ধু নমস্ততে॥
এতৎস্তোত্রং পঠেন্নিত্যং প্রাপ্তীবৃন্দাবনং স্থিতে।
প্রেমভক্তি দয়ানাথ কৃপাসিন্ধু নমস্ততে॥

পুষ্পিকা ঃ শ্রীমদ্রূপগোস্বামীনাং বিরচিতং শ্রীঅদ্বৈতস্তবরাজং সম্পূর্ণম্।

যুগলস্তবরাজ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত বিভাগ পুঁথি নং ৪৫৬)—

আরম্ভ ঃ বন্দে বৃন্দাবনাধীশৌ রসিকৌ শ্যামসুন্দরৌ।
সুনব্যবয়সাযুক্তৌ গৌরশ্যামলবিগ্রহৌ॥

অন্ত্য ঃ তভারতীবিতানাঞ্চ সদানয়নগোচরৌ।
অবণিতমুখাম্ভোজৌ পাদপদ্মসুধাময়ৌ॥
এবান্যাদ্বাপঠেদয়স্ত যুগলস্তবরাজঞ্চ।
তৎক্ষণাৎ লভতে সত্যসন্নিকর্ষং কেশবয়োঃ॥

পুষ্পিকা ঃ ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামীবিরচিত যুগলস্তবরাজঃ সম্পূর্ণঃ।

অনঙ্গমঞ্জরী স্তোত্র (বরাহনগর গ্রন্থমন্দির পুঁথি নং স্তোত্র ২ক)—

আরম্ভ ঃ শরচ্চন্দ্রসুবর্ণাভ্যাং মুখচন্দ্রসুশোভনং।
রক্তাম্বরধরাং দেবী প্রসিদানঙ্গমঞ্জরী॥

অন্ত্য ঃ বামস্বরূপো চ রমণী বাধামন্ত্রপ্রদায়িনী।
রতিপ্রেম সদাতব্য প্রসিদানঙ্গমঞ্জরী ॥

পুষ্পিকা ঃ ইতি শ্রীরূপগোস্বামিনা বিরচিতং শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীচৈতন্যদিব্য সহস্রনাম (বৃন্দাবন ভক্তিবিদ্যালয় পুঁথি নং ৪৬৪)—

আরম্ভ ঃ একদা রঘুনাথদাস সন্নিধৌ দণ্ডবতলীলা স্তোমৌ গদগদগিরাং

শ্রীরঘুনাথ দাস উবাচ ঃ ভো রূপ শুদ্ধ সত্যপ্রেমভক্তিবিশারদঃ।
মহাপ্রভু কথং জন্মসন্দেহোজায়তে মম ॥

অন্ত্য ঃ নমস্তে শ্রীশচীপুত্র নমস্তে করুণাকরঃ।
নমস্তে শ্রীদয়াসিন্ধু জগন্নাথঃ প্রিয়াত্মজঃ।

পুষ্পিকা ঃ ইতি শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিতং বিমলবিজ্ঞানপ্রকাশং শ্রীচৈতন্যদিবাসহস্র-নামসম্পূর্ণং।

মাদ্রাজের Govt. Oriental Mss. Library-র Triennial Catalogue-এ নিম্নলিখিত স্তবগুলি রূপের নামে আরোপিত পাওয়া যায়।

বৈষ্ণবপূজাভিধানম্ (R. No. 3053 a-48)—

আরম্ভ ঃ প্রথমতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণস্মরণম্, আসনোপরি উপবিশ্য সিদ্ধদেহং ভাবয়িত্বা শ্রীগুরুভ্যো নমঃ। শ্রীপরমগুরুভ্যো নমঃ, শঙ্খপ্রক্ষালনম্ শঙ্খে জলং পুরয়িত্বা শঙ্খে তীর্থবাহনম্।

অন্ত্য ঃ তদানন্তরং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণোপরি শঙ্খমারাত্রিকং কুর্য্যাৎ শঙ্খস্থতোহয়ং স্বশিরসি প্রক্ষিপ্য বাহ্যং কিঞ্চিৎ প্রক্ষেপয়েৎ।

পুষ্পিকা ঃ ইতি শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিতং বৈষ্ণবপূজাবিধানং সমাপ্তম্।

পঞ্চশ্লোকী (R. No. 3053 a-13)—

আরম্ভ ঃ কৃষ্ণেতি যস্য চরিতং মনসাদ্রিয়েৎ
দীক্ষাস্তি চেৎহপ্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য
লীলাদিশূন্যহাদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধৌ

অন্ত্য ঃ হা কৃষ্ণ নীরদরুচে তটিদারকান্তাপাঙ্গপ্রসাদ পরিফুল্লমুখারবিন্দ।
রাগে লসন্তমমুয়াশ্রকবিন্দুজালং ত্বাং বীজয়ামি ললিতাদ্যনুকম্পয়ৈব ॥

পুষ্পিকা ঃ ইতি শ্রীরূপ গোস্বামিনা বিরচিতা পঞ্চশ্লোকী সমাপ্তা ॥

গদাধরাষ্টক (R. No. 3053 a-68)—

আরম্ভ ঃ সর্বপাণ্ডিত্যসারাখ্যং প্রেমরঙ্গবিভূষণম্।
মাধবাত্মজ বন্দাগ্র্যং বন্দে রাধা গদাধরম্ ॥

অন্ত্য ঃ গদাধরাষ্টকং পদ্যং হৃদ্যং নামমনোহরং।
যঃ পঠেন্নিয়তং ভক্ত্যা স প্রেম্নি প্রমিলেদ্ধ্রুবম্ ॥

পুষ্পিকা ঃ ইতি শ্রীরূপগোস্বামী বিনিমিতং শ্রীযুত গদাধর পণ্ডিত গোস্বাম্যষ্টকং সমাপ্তম্।

ইতিপূর্বে সনাতনের নামেও একটি গদাধরাষ্টক আরোপিত রহিয়াছে, তাহা দেখাইয়াছি। উক্ত অষ্টকটি ইহা হইতে পৃথক।

রাধাষ্টকং (R. No. 3053 a-2)—

আরম্ভ ঃ নন্দ নন্দনমনোবিহারিণী পঞ্চ সায়ক কলাশরীরিণী
সর্বগোপরমণীশিরোমণিঃ সংতনোতু বৃষভানুনন্দিনী

অন্ত্য ঃ রাধাষ্টকং যঃ পঠতি ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়া রাধারমণৈকচিত্তঃ।
লব্ধা হরৌপ্রেম সুরৈর্দুরাপমন্তে গোলোকমনুপ্রযাতি॥

পুষ্পিকা ঃ ইতি শ্রীরূপগোস্বামী-বিরচিতং শ্রীরাধাষ্টকং সম্পূর্ণম্। এই রাধাষ্টক স্তবমালাধৃত রাধাষ্টক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

উজ্জ্বলচন্দ্রিকা (R. No. 3053 a-56)—

আরম্ভ ঃ বৃন্দাবনে রম্যে যমুনানিকটে তটে।
বসন্তকুসুমামোদপ্রসূনদলমণ্ডিতম্।
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনং নাম রাধাকৃষ্ণ স্থিতং ততঃ।
পরিপাকরসং তত্র রসভক্তিস্থিতং ততঃ॥

অন্ত্য ঃ শ্রীকৃষ্ণরসামৃতিনানুভবো জায়তে হৃদি।
অনুভাবং পরং ভাগ্যং জায়তে নরদেহিনাম্॥
রসেন কথিতং সর্বমুজ্জ্বলং সুমনোহরম্।
অতঃ পরতরং নাস্তি গোলোকে রাসমণ্ডলে॥

পুষ্পিকা ঃ ইতি শ্রীরূপগোস্বামী বিরচিতং উজ্জ্বলচন্দ্রিকা সমাপ্তম্।

একান্তনিকুঞ্জবিলাস ঃ (R. No. 3177b)—

আরম্ভ ঃ ধৃতকনক সুগৌরস্নিগ্ধমেঘৌঘনীল-
চ্ছবিভিরখিলবৃন্দারণ্যমুদ্ভাসয়ন্তৌ
মৃদুলনবদুকূলে নীলপীতে বসানৌ
স্মরনিভৃতনিকুঞ্জে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ

অন্ত্য ঃ স্তবমিদমতিরম্যং রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্র
প্রমদভরবিলাসৈরদ্ভুতং ভাবযুক্তঃ
পঠতি য ইহ রাত্রৌনিত্যমব্যগ্রচিত্তো।
বিমলমতিঃ স রাধালীষু সখ্যং ভজেত।

পুষ্পিকা ঃ ইতি শ্রীরাধিকা কৃষ্ণয়োরেকান্তনিকুঞ্জবিলাসঃ শ্রীরূপকৃতঃ সম্পূর্ণঃ।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Notices of Sanskrit Manuscript-এ রূপের নামে কতিপয় স্তব আরোপিত রহিয়াছে।

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রনিরূপণ (L IX, p. 77, No. 2466)—

আরম্ভ ঃ সুমেরু কৃষ্ণচন্দ্রশ্চ সাক্ষী সুরত ধর্ময়োঃ।
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রং জপেদ্ ভাগবতোত্তমঃ ॥

অন্ত্য ঃ আগত্য দুঃখং হতবান্ সর্বেষাং ব্রজবাসিনাম্
শ্রীরাধাহারিচরিতো হরিঃ শ্রীনন্দনন্দনঃ ॥

পুষ্পিকা ঃ ইতি রূপগোস্বামিনা বিরচিতং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রার্থনিরূপণঃ সমাপ্তম্।

গঙ্গাষ্টক (L IV, p. 203, No. 1628)—

আরম্ভ ঃ কৃষ্ণপাদপদ্মযুগভক্তিপূরবর্ধিনী
নামৈকৈকদেশ যোগপাপরাশিনাশিনী।
তাপবৃন্দতাপিতান্তরর্থহেতু-শোধিনী
মাং পুণাতু সর্বদৈব রোহিণেয়নন্দিনী।।

অন্ত্য ঃ তুষ্টিদেন চাষ্টকেন যে স্তবন্তিচেশ্বরীং
সস্মিতং বিহায় সোঽপি কালচক্র···শ্বরীম্।
যস্ত সদ্বিরক্ত চ···নিজেপ্সিতং
নিত্যসিদ্ধ দেহভাবনিত্যবস্ত-সেবিতম্ ॥

পুষ্পিকা ঃ ইতি শ্রীরূপগোস্বামিনা বিরচিত শ্রীনিত্যানন্দসুতা গঙ্গাষ্টকং সমাপ্তম্ ॥

সাধনপদ্ধতি (L IX, p. 55, No. 2842)—

আরম্ভ ঃ ধ্যায়েৎ শ্রীগুরুমেবমনুগং শ্রীমচ্ছচীনন্দনং
প্রেষ্ঠং দাসমথ প্রকাশমপি তদ্ধামৈকদেশস্থিতম্।
সংসেব্যৈতদনুজ্ঞয়া পরপরাদীং স্তাদৃশান্ ভাবয়ন্
শ্রীচৈতন্যকৃপাগুরাক্তিপগুপী নাম্না ব্রজং প্রব্রজেৎ ॥

অন্ত্য ঃ ভ্রমরালিদুকূলধারিণী মুদিতামেহস্তবিলাসমঞ্জরী

পুষ্পিকা ঃ ইতি শ্রীরূপগোস্বাম্যুক্ত সাধনপদ্ধতিঃ।

উপদেশামৃত (L VIII, p. 13, No. 2560)—

আরম্ভ ঃ বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্বামপীমাং পৃথিবীং সশিষ্যাৎ

অন্ত্য ঃ কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সিভ্যোপিরাধা
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিত স্তাদৃগেব ব্যধায়ি।

যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজং
তৎপ্রেমেদং সকৃদপিসরঃ স্নাতুরাবিস্করোতি ॥

পুষ্পিকা ঃ ইতি শ্রীমৎ রূপ গোস্বামিনা বিরচিতমুপদেশামৃতং সমাপ্তম্ ।

এই উপদেশামৃতে ৪৩টি শ্লোক আছে বলা হইয়াছে কিন্তু সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত উপদেশামৃতের পুঁথিতে (পুঁথি নং ৩০১ চ) মাত্র এগারটি শ্লোক আছে। এই পুঁথির আরম্ভ ও অন্ত্য শ্লোকের সহিত 'মিত্র' প্রদত্ত উপদেশামৃতের আরম্ভ ও অন্ত্য মিলে।

A. V. Kathvate-এর Report on the search of Sanskrit Mss. (1904)-এ রূপের নামে 'সাধনামৃত' নামে একটী পুঁথির উল্লেখ আছে (p. 22, No. 314)। পুঁথির কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। Rudolf Roth-এর Tubingen Catalogue-এ রূপের নামে শিক্ষাদশক নামে একটি পুঁথির উল্লেখ আছে (p. 10)। ইহারও কোনরূপ পরিচয় মেলে না।

রাধাবিনোদ দাস বাবাজী কর্তৃক সম্পাদিত 'নিত্যানন্দদায়িনী' মাসিক পত্রিকার ১২৭৯ সালের চতুর্থভাগে ও ১২৮০ সালের প্রথম ভাগে 'শ্রীমৎ রূপ গোস্বামিনা উক্তং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভো সহস্রনামস্তোত্রম্' নামে একটি স্তোত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত স্তোত্রের আরম্ভ নিম্নরূপ,—

'নমঃ অস্য শ্রীচৈতন্যদিব্যসহস্রনামস্তোত্রমন্ত্রস্য শ্রীরূপমঞ্জরী ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। বিষ্ণুপ্রিয়া শক্তির্মহাপ্রভু র্দেবতা মনোমোহন কামবীজম্। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথকীলক শ্রীচৈতন্যায় নমঃ ইতি মন্ত্রম্। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রসাদেভ্যশ্চৈতন্যনামসহস্রকম্ পাঠমহং করিষ্যে ইতি সংকল্পঃ'।

উক্ত পত্রিকার ১২৮০ সালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে শ্রীনবদ্বীপাষ্টকম্ নামে একটি স্তব রূপকৃত বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছিল। এইগুলি রাধাবিনোদ দাস কোথায় পাইয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই।

আরম্ভ ঃ শ্রীগৌড়দেশ সুরদীর্ঘিকায়াস্তীরেতি রম্যেপুরপুণ্যময্যাঃ।
লসন্তমানন্দভরেণ নিত্যং তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি॥

অন্ত্য ঃ এতন্নবদ্বীপবিচিন্তনাঢ্যং পদ্যাষ্টকং প্রীতমনাঃ পঠেদ্ যঃ।
শ্রীমচ্ছচীনন্দন পাদপদ্মে সুদুর্লভং প্রেমমবাপ্নুয়াৎ সঃ॥

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের পুঁথিশালায় রূপের নামে উপাসনাবিধি ও প্রেমসম্পুট নামে দুইটি পুঁথি পাওয়া যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রূপের নামে 'অষ্টকাল-স্মরণী' নামে একটি স্তবের পুঁথির উল্লেখ আছে (Dacca 1125)। মনে হয়, ইহা স্মরণমঙ্গলের অনুরূপ হইবে।

রাধাকৃষ্ণ দাসের দশশ্লোকী ভাষ্যে রূপকৃত 'বৃহদ্ধ্যানের' উল্লেখ করা হইয়াছে, 'তস্য বন্ধুতা প্রেমসেবয়োঃ স্বরূপঞ্চ যথা শ্রীরূপগোস্বামীকৃত বৃহদ্ধ্যানে ঃ

কোণেনাক্ষ্ণঃ পৃথুরুচিমিথো হারিণা লিহ্যমানা-
বেকৈকেন প্রচুরপুলকেনোপগূঢ়ৌ ভুজেন।
গৌরীশ্যামৌ বসনযুগলং শ্যামগৌরং বসানৌ
রাধাকৃষ্ণৌ স্মরবিলসিতোদ্দামতৃষ্ণৌ স্মরামি ॥ ক
ভৃঙ্গান্ সুহৃদবদনগন্ধভরেণ লোলান্
লীলাম্বুজেন মৃদুলেন নিবারয়ন্ত্যা।
উদ্বীক্ষ্যমানমুখচন্দ্রমসৌ রসৌঘ-
বিস্তারিণা ললিতয়া নয়নাঞ্চলেন ॥ খ
চামরাভ নবমঞ্জমঞ্জরী-ভ্রাজমাণকরয়াবিশাখয়া।
চিত্রয়া চ কিল দক্ষবাময়ো বীজ্যমানবপুষৌবিলাসতঃ ॥ গ
নাগবল্লিদলবদ্ধবীটিকা সম্পুট স্ফুরিতপাণিপদ্মযা।
চম্পকাদিলতয়া সকম্পয়া দৃষ্ট-পৃষ্ট-তটরূপ সম্পদৌ ॥ ঘ
রম্যেন্দুলেখা কলগীতমিশ্রিতৈর্বংশীবিলাসানুগুণৈর্গুণজ্ঞয়া।
বীণানিনাদ ভ্রমরৈঃ পুরস্থয়া প্রারব্ধরঙ্গৌ কিলতুঙ্গবিদ্যয়া॥ ঙ
তরঙ্গদঙ্গ্যা কিলরঙ্গদেব্যা, সব্যে সুদেব্যা চ শনৈরসব্যে।
শ্লক্ষ্ণাভিমর্শেন বিমৃজ্যমান-স্বেদাশ্রুধারৌ শিচয়াঞ্চলেন চ ॥

ইহার ক সংখ্যক শ্লোকটি রূপের স্তবমালার ব্রজনবীনযুবদ্বন্দ্বাষ্টকম্-এর শেষে ধৃত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধনদীপিকা চতুর্থ কক্ষায় কেশবকীতিকাদি ধ্যানং শিরোনামায় 'কোণেনাক্ষ্ণঃ পৃথুরুচি' ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধৃত আছে এবং খ, গ, ঙ ও চ শ্লোকগুলি উদ্ধৃত রহিয়াছে দেখা যায়। ইহা কাহার রচিত কোন উল্লেখ নাই।

রাধাকৃষ্ণ দাস সাধনদীপিকাতে (৭ম কক্ষা) 'শ্রীরূপকৃত পদ' শিরোনামায় নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনবাসিনো রসবতী রাধাঘনশ্যাময়োঃ
রাসোল্লাসরসাত্মিকা মধুমতী সিদ্ধানুগা যা পুরা।
সোঽয়ং শ্রীসরকার ঠাকুর ইহা প্রেমাথিতঃ প্রেমদঃ
প্রেমানন্দ মহোদধি বিজয়তে শ্রীখণ্ড ভূখণ্ডকে ॥

ইহা ভক্তিরত্নাকরেও রহিয়াছে দেখা যায় (ভ. র. ২।২২২)। রূপের কোনও গ্রন্থে এই শ্লোকটি পাওয়া যায় না।

রূপে আরোপিত এই স্তবসমূহের মধ্যে গদাধর অষ্টক গৌরাঙ্গসেবক (১৩২৬, পৌষ, পৃঃ ৩৭১), গৌড়ীয় (১৩৪৯, ২০শে আষাঢ়, পৃঃ ৫২৫), ও নিত্যানন্দ দায়িনী (১২৮০ প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৮/০) পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। উপদেশামৃত

(এগারটি শ্লোক) সজ্জনতোষিণীতে ১৩০৪ সালে প্রকাশিত হয়। পুরীদাস তাঁহার সম্পাদিত স্তবমালার পরিশিষ্টে ইহা সংযোজন করিয়াছেন। কুসুমসরোবরের কৃষ্ণদাসবাবাজী প্রকাশিত 'গ্রন্থরত্নষট্কং'-এর মধ্যে বৈষ্ণবপূজাবিধান সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। রাধাবল্লভ চৌধুরী কর্তৃক রাধিকানাথ গোস্বামী বিরচিত 'রহস্যার্থ-প্রকাশিকা' টীকাযোগে একান্তনিকুঞ্জবিলাসস্তব 'নিকুঞ্জরহস্যগীতিকা' নামে ১৩২৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। এই স্তবটি 'নিকুঞ্জরহস্যস্তব' নামে কৃষ্ণদাসবাবাজীও কুসুমসরোবর হইতে ২০০৯ সম্বতে প্রকাশ করেন।

কৃষ্ণদাস বাবাজী প্রকাশিত 'স্মরণমঙ্গলস্তোত্রশেষে' মহাপ্রভোরষ্টকালীয়লীলা নামে একটি অষ্টক রাগের নামে মুদ্রিত হইয়াছে (পৃঃ ৩৫)।

আরম্ভ ঃ প্রগে শ্রীবাসস্য দ্বিজকুলরবৈর্নিস্কুটবরে
শ্রুতিধ্বনিপ্রখ্যৈঃ সপদিগতনিদ্রং পুলকিতম্।
হরঃ পার্শ্বে রাধাস্থিতিমনুভবন্তং নয়নজৈ-
র্জলে সংসিক্তাঙ্গং বরকনকগৌরং ভজঃ মনঃ॥

অন্ত্য ঃ শ্রীশ্রীবাসগৃহে মুদা পরিবৃতো ভক্তৈঃ স্বনামাবলীং
গায়ন্তি গলদশ্রু কম্পপুলকো গৌরো নটিত্বা প্রভুঃ।
পুষ্পপারামগতে সুরঙ্গশয়নে জ্যোৎস্নাযুতায়াং নিশি
বিশ্রান্তঃ স শচীসুতঃ কৃতফলাহারো নিসেব্যো মম॥

এই অষ্টকটি শ্রীমন্মহাপ্রভোরষ্টকালীনলীলা স্মরণমঙ্গলং নামে মাধুকরী, ১৩৩১ ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

পুষ্পিকায় আছে ঃ ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠক্কুরবির চিতং শ্রীমন্মহাপ্রভোর-ষ্টকালীনলীলা স্মরণমঙ্গলং সম্পূর্ণম্।

নিতাই সুন্দর পত্রিকায় (১৩৩৩ শ্রাবণ, পৃঃ ১১৩) 'শ্রীসনাতনগোস্বাম্যষ্টকং' নামে একটি অষ্টক রূপকৃত বলা হইয়াছে।

আরম্ভ ঃ সদামহাপ্রভোর্জগদ্ গুরোর্নিদেশপালকং
বিচিত্রগৌড়মণ্ডলেশভূপতেঃ সুমন্ত্রিণম্।
উদারধীরমদ্ভুতং মহামতিং গুণার্ণবং
ভজাম্যহং মহাশয়ং কৃপাম্বুধিং সনাতনম্॥

অন্ত্য ঃ পঠেত্তু যঃ সুভক্তিতঃ প্রসন্ন মানসঃ সদা
সনাতনাষ্টকং সুখং মনোরথপ্রদায়কঃ।
লভেত ধর্মবাঞ্ছিতং মহামতিস্তথৈবচ
স রাধিকাবরাঙ্ঘ্রি পঙ্কজে মতিং সুদুর্লভতাম্॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা পুঁথিশালায় ৬৬১৬ নং পুঁথিতে এই অষ্টকটি আছে।

কিন্তু ইহা কাহার রচনা তাহার কোনই উল্লেখ নাই। এই স্তবগুলি যদি প্রকৃতই রূপের হইত তাহা হইলে জীব সংগৃহীত স্তবমালায় স্থান না পাইবার কারণ থাকিত না। এইগুলি পরবর্তীকালের অর্বাচীন লেখকেরা রূপের নামে চালাইয়া দিয়াছেন মাত্র।

রূপের গ্রন্থানুবাদ

হংসদূত—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নরসিংহদাস ও নৃসিংহনন্দন দাস নামে দুই জনের অনুবাদ পাওয়া যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে নরসিংহ দাসের অনুবাদের প্রচুর পুঁথি রহিয়াছে (ক. বি. ৯৮২-৯৯৪, ব. সা. প. ৩০০-৩০৫)। নৃসিংহনন্দন ও নরসিংহ একই ব্যক্তি। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার বঙ্গসাহিত্য পরিচয় প্রথম খণ্ডে এই অনুবাদটি মুদ্রিত করেন (পৃঃ ৮৫০-৮৬০)। অনুবাদকের গ্রন্থকর্তা সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান ছিল না। তিনি লিখিয়াছেন—

হংসদূত কথা ভাই কেবল বিরহের শোকে।
দাসগোস্বামী ইথে করিলেন শ্লোকে॥

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনও বিচার না করিয়া লিখিয়াছেন 'রঘুনাথ দাস ভাগবত অবলম্বনে সংস্কৃত হংসদূত প্রণয়ন করেন। নরসিংহ দাস তাহারই অনুবাদ করিয়াছেন' (পৃঃ ৮০০)।

আরম্ভ ঃ
এই মত দড়াইয়া সব গোপীগণে।
ধীরে ধীরে যান সবে সেই বৃন্দাবনে॥
যমুনার তীরে গেলা সব সখীগণে।
সেই স্থানে শিশু বৎস দেখিল নয়নে॥

অন্ত্য ঃ
এই ত পথের দিশা ললিতা কহিল।
হংসদূত ইতিহাস নৃসিংহ রচিল॥

অনুবাদটি আক্ষরিকও নহে। তাৎপর্যানুবাদও নহে। হংসদূতের ছায়াবলম্বনে রচিত মাত্র।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে নরোত্তমদাসকৃত হংসদূতের একটি অনুবাদের পুঁথি পাওয়া যায় (৩৬২৮ নং)। এই নরোত্তম দাস লোকনাথ শিষ্য নরোত্তম নহেন বলিয়াই বিশ্বাস। কারণ ইনিও হংসদূতকে দাস গোস্বামীর রচনা বলিয়াছেন। তাঁহার রূপের গ্রন্থকে রঘুনাথদাসে আরোপ করিবার কথা নহে।

আরম্ভ ঃ
গোপীর বিরহকথা না জানি কথন।
শ্লোকছন্দে দাস গোস্বামী করেন রচন॥

অন্ত্য ঃ
দাস গোস্বামীর চরণ সাদরে বন্দিয়া।
ভাষাছন্দে রচি কিছু গুণা বঝিয়া॥

শ্লোকছন্দে রচিব মনে হইল আশ।
হংসদূত কথা কহেন নরোত্তম দাস॥

উদ্ধবসন্দেশ—এশিয়াটিক সোসাইটিতে কিশোর দাস কৃত রূপের উদ্ধবসন্দেশের একটি অনুবাদের পরিচয় পাওয়া যায় (পুঁথি নং ৪৯৪৮)।

আরম্ভ ঃ আনন্দেতে বল হরি ভক্ত ভগবান।
ঠাকুর বৈষ্ণবের পায় করিয়া প্রণাম॥
পূর্ণরূপী উদ্ধবের হাতেতে ধরিয়া।
কহেন সুবাক্য কৃষ্ণ বিনয় করিয়া॥
তোমা বিনা কে আমার আছে আপ্তজন।
কাহারে কহিলে হবে দুঃখ নিবারণ॥

অন্ত্য ঃ হৃদয়ে ভরসা করি কৃষ্ণ কৃপালেশ।
রচিল কিশোর দাস উদ্ধবসন্দেশ॥
কৃষ্ণ কোন কথা উদ্ধবের না পুছিল।
এই হৈতে সন্দেশ পুঁথি সম্পূর্ণ হইল॥

চাটুপুষ্পাঞ্জলি—ইহার একটি অনুবাদের পরিচয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথি বিভাগে পাওয়া যায় (ক. বি. ১২০৮, ১২১৫, ৩৭৫২ ইত্যাদি)। এই অনুবাদ রাধাবল্লভ দাসের নামে ১৩২৩ সালে বটতলা হইতে প্রকাশিত হয়। ইনি শ্রীনিবাস-শিষ্য রাধাবল্লভ দাস বলিয়াই অনুমান হয়।

আরম্ভ ঃ নবগোরোচনা দ্যুতি শ্রীঅঙ্গে শোভয়ে অতি
নীলপট্ট শাড়ি শোভে যায়।
ভুজঙ্গিনী জিনি বেণী ফণি বিরাজিত বেণী
রত্নগুচ্ছ অতি শোভা তায়॥

অন্ত্য ঃ চাটুপুষ্পাঞ্জলি এই স্তবাবলী
যে জন করয়ে গান।
বৃন্দাবনেশ্বরী তারে কৃপা করি
দাসী পদ দেন দান॥

ললিতমাধব—স্বরূপচরণ গোস্বামী কৃত একটি অনুবাদ পাওয়া যায়। প্রেমকদম্ব নামে Journal of the Department of Letters (1931, p. 180)-এ মণীন্দ্র-মোহন বসু কর্তৃক প্রথম দুই অঙ্কের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। পরে বটতলা হইতে নিত্যলাল শীল কর্তৃক পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

আরম্ভ ঃ প্রথমে বন্দিব ইষ্টদেবের চরণ।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ॥

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রেমরসময় ।
বৃন্দাবনে সখীগণ সঙ্গে বিলসয় ॥
কৃষ্ণের মিলন চন্দ্রাবলীর সহিত ।
এইসব কথা প্রথমাঙ্কে বিরচিত ॥
তার অর্থ পরিভাষারূপে লিখিবারে ।
বৈষ্ণব সকল আদেশিলা এবে মোরে ॥
অতএব লিখি কিছু সংক্ষেপ করিয়ে ।
নাটকের নান্দীশ্লোক শুন মন দিয়ে ॥

অন্ত্য ঃ ভট্টাচার্যগণ কুলীন ব্রাহ্মণ
সদাসুখে বিরজয় ।
তাহার নিবাস পূর্ণ অভিলাষ
স্বরূপ এ গ্রন্থ কয় ॥

বিদগ্ধমাধব—যদুনন্দন দাসের বিদগ্ধমাধবের অনুবাদ রহিয়াছে। ইহা রাধাকৃষ্ণ-লীলারসকদম্ব বা রসকদম্ব নামে পরিচিত। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বহরমপুর হইতে ইহা প্রকাশ করেন।[১]

আরম্ভ ঃ কৃষ্ণলীলাশিখরিণী চান্দ্রিয়ার সুধা জিনি
মাধুরী উন্মাদ নাশে যথা ।
রাধাদিপ্রণয় যাতে ঘনসার সুবাসিতে
সে মাধুরী অন্ত্য কবে কেবা ॥

অন্ত্য ঃ রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব আখ্যান ।
গায় দীন হীন যদুনন্দনাভিধান ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদুনন্দন দাসের অনুবাদকে একটি পুঁথিতে লিপিকার মাথুর দাসের নামে আরোপিত করা হইয়াছে (পুঁথি নং ৬৬০৭)।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসময় দাসের একটি খণ্ডিত অনুবাদ পাওয়া যায় (৫০৫৬ নং)। এই অনুবাদকের পূর্ণ গ্রন্থ বৃন্দাবনে পাওয়া যায়। নাম কৃষ্ণভক্তিরসবল্লী। বিশ্বভারতীতেও ইহার কয়েকটি পুঁথি আছে। ইহা শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী নামে 'সাহিত্য প্রকাশিকা' পর্যায়ে বিশ্বভারতী হইতে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের সম্পাদনায় ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হইয়াছে।

[১] ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭১১) মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই পুঁথি পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তাহা সঠিক নহে।

আরম্ভ ঃ জয় জয় মহাপ্রভু গৌরভগবান ।
তোমার পাদারবিন্দে ভক্তি দেহ দান ॥
জয় নিত্যানন্দ প্রভু কৃপার সাগর ।
ভক্তিদান দিয়া মোরে করহ কিঙ্কর ॥

অন্ত্য ঃ কৃষ্ণভক্তি করি করিলাম গ্রন্থকথা ।
শুনিতে পরমসুখ পাইবে সর্বথা ॥
শ্রীরূপ গোসাঞির পাদপদ্ম শিরে ধরি ।
রসময় দাস কহে প্রেমের লহরী ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর 'ভক্তিরসকল্লোলিনী' নামে একটি অনুবাদের সামান্য অংশ হরিদাস দাস কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে। অনুবাদকের কোন নাম পাওয়া যায় নাই। প্রতি লহরীর অনুবাদের শেষে আছে,—

নিত্যানন্দ পদদ্বন্দ্ব হৃদয়ে বিলাস ।
ভক্তিরসকল্লোলিনী করিল প্রকাশ ॥

ইহার শেষাংশ রামদাস বাবাজীর জনৈক শিষ্য সংযোজনা করিয়া দিয়াছেন ।

আরম্ভ ঃ দশনে ধরিয়া তৃণ লোটাঞা ধরণী ।
শ্রীগুরু চরণ বন্দো ভবাব্ধি তরণী ॥
অজ্ঞানতিমির আন্ধ্য যেহো দূর কৈল ।
জ্ঞানাঞ্জন শলাকাতে চক্ষু প্রকাশিল ॥
শরণ লইল মুঞি তাঁহার চরণে ।
যাঁহা বহি গীত নাহি জীবনে মরণে ॥

গীতাবলী—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরাণদাস নামে জনৈক ব্যক্তির কৃত একটি অনুবাদের পরিচয় পাওয়া যায় (৩৪৭২ নং)। ক. বি. ৬২০৪ পুঁথিতেও অনেকগুলি গীতাবলীর অনুবাদ রহিয়াছে কিন্তু তাহাতে কোন ভণিতা নাই ।

আরম্ভ ঃ অতঃপর বন্দ গোসাঞি সনাতন ।
গীতবাদ্য গীতাবলী যাহার বর্ণন ॥
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অতিপ্রিয়তর ।
শ্রীরূপ অগ্রজ বহু দয়ার সাগর ॥

কৃষ্ণাষ্টমী শুভতিথি রোহিণী নক্ষত্র অতি
শুভদিন শুভযোগ পাই ।
শ্রীযশোদা ব্রজেশ্বরি পুত্র উদার হরি
প্রসবিলা রাত্রিযোগে তাই ॥

সুত হৈলা শুনি যশোদার।
ব্রজের যতেক গোপ পাসরিয়া দুঃখ শোক
মহামহা আনন্দ সভার॥
কেহ প্রণয়িতা জন সঙ্গে লই নানাধন
বিবিধ আকার উপহারে।
কেহ গোপ সুখভারে নৃত্য করে বারে বারে
তাথৈয়া তাথৈয়া তাল ধরে॥
কেহো মধুরিম স্বরে মধুরিম গান করে
মঙ্গল গুর্জরি রাগগণ।
নবনী সহিত দধি কলসে নাহিক অবধি
মহানন্দে করে বিতরণ॥
কেহ কেহ অতি শূন্য মনোরথ করে পূর্ণ
সূতিকামন্দিরে সুত হেরি।
সনাতন যার নাম মূর্তিমন্ত চাহি শ্যাম
পরাণ ভাবে সে পদমাধুরী॥

অন্ত্য ঃ সে ইহার কৃপা যত কহিবারে অসঙ্গত
পুত্রবৎ করেন করুণা।
তার বলে লেখি ইহা মনেতে উঠয়ে যাহা
এ দাস পরাণ হীন জনা॥

উজ্জ্বলনীলমণি—শচীনন্দন বিদ্যানিধি উজ্জ্বলনীলমণির 'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা' নামে একটি অনুবাদ করেন। ইহা প্রথম শিবরতন মিত্র আবিষ্কার করেন। পরে কুলদাপ্রসাদ মল্লিক কর্তৃক ১৩৩৩ সালে প্রকাশিত হয়।

আরম্ভ ঃ নামাকৃষ্টরসজ্ঞঃ শীলেনোদ্দীপয়ন্ সদানন্দং।
নিজরূপোৎসবদায়ী সনাতনাত্মা প্রভুর্জয়তি॥
এই শ্লোক হয় গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ।
তিন প্রকার ব্যাখ্যা তাথে করেন মহাজন॥
নামে রসজ্ঞের গণ কৈল আকর্ষণ।
রসজ্ঞ শব্দে কহে ইহ ব্রজদেবীগণ॥

অন্ত্য ঃ শ্রীরূপ গূঢ় অর্থ করি লোকে জানাইল।
তার কিছু অর্থ মুঞি প্রকটন কৈল॥
এই রসে যেই জন রসিক হইবে।
পরম আদর করি ইহারে জানিবে॥

নির্বুদ্ধির হাতে না করিহ সমর্পণ।
একে আর লেখি করে অর্থ বিনাশন॥
মুনি খ মুনি শশাঙ্কে সংজ্ঞিতে শাকে বর্ষে
তুহিন কিরণবারে পৌষ মাসে দশম্যাং।
দ্বিজবর কুলজাতশ্চানক গ্রামবাসী
রচিত সরল ব্যাখ্যা শ্রীশচীনন্দনাখ্যঃ॥

বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরে নারায়ণ দাস নামে জনৈক লেখকের উজ্জ্বলনীলমণির একটি অনুবাদ পাওয়া যায় (অনুবাদ ১৮ নং)। আরম্ভ ও অন্ত্য নিম্নরূপ,—

আরম্ভ ঃ শ্রীরূপের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া।
সে উজল রস করি সংক্ষেপ করিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণ হয়েন উজল রসের বিষয়।
গোকুল মথুরাপুরী তিনস্থান হয়॥
পূর্ণতর পূর্ণতম পূর্ণ সুক্রমেতে।
এই তিনসত্য কৃষ্ণের রস আস্বাদিতে॥
ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরোদ্ধত আর।
ধীর সভগুণ কৃষ্ণের নব পরকার॥

অন্ত্য ঃ সংক্ষেপে কহিল উজল রস বিবেচন।
শ্রীরূপচরণে পদ্ম করিয়া স্মরণ॥
শ্রীবৈষ্ণবপাদপদ্মে করি নমস্কার।
ইথে অপরাধ যেন না হয় আমার।
আলস্য রোধিতে লিখি সংক্ষেপ করিয়া।
উজল রসসিন্ধু অন্ত না পাঞা॥
যেহে করে শ্রীআচার্য নন্দনে আনন্দ।
সেই প্রভু কৈল মোরে জগত আনন্দ॥
তাহার চরণপদ্ম করি অভিলাষ।
সংক্ষেপে কহিল কিছু নারায়ণ দাস॥

দানকেলিকৌমুদী—যদুনন্দন দাসের দানকেলিকৌমুদীর একটি অনুবাদ কলিকাতা বঙ্গবাসী প্রেস হইতে ১৩২৫ সালে কেশবচন্দ্র দে কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

আরম্ভ ঃ শ্রীগুরুচরণ নখে চন্দ্রজ্যোৎস্না লাখে লাখে
হৃদি অন্ধকার যাতে নাশে।
বন্দো সেই নখাবলী দণ্ডবৎ প্রণাম করি
যাতে সর্ব বিঘ্ন বিনাশে॥

অন্ত্য ঃ শ্রীরূপ গোস্বামী পদে কোটি পরণাম।
তাঁর কৃপায় কৈনু গান কৃষ্ণ গুণগ্রাম ॥
উজ্জ্বল ভকতিরস প্রকাশের আশ।
এ যদুনন্দন কহে এ দানবিলাস ॥

শিবরতন মিত্র 'বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক' গ্রন্থে ঠাকুরদাস বৈষ্ণব নামক জনৈক ব্যক্তির পরিচয় এইভাবে দিয়াছেন, 'শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত উজ্জ্বলনীলমণি নামক সুবিখ্যাত মূলের পদ্যানুবাদক' (পৃঃ ২৫৮)। ইহার কোন পুঁথি কিংবা বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না।

হরিদাস দাস 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবজীবন' গ্রন্থে বলিয়াছেন, নয়নানন্দ ঠাকুর ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর আধারে শ্রীভক্তিরসকদম্ব রচনা করেন (পৃঃ ৯৭)। কোনরূপ পুঁথি কিংবা বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় নাই।

চতুর্থ অধ্যায়

জীব গোস্বামী

রূপ যেরূপ বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের কাব্য, অলংকার, রসশাস্ত্রের ও উপাসনাপ্রণালীর ধারা ও গতি প্রবর্তন করেন, সেরূপ জীব গৌড়ীয় দর্শনের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন।

লঘুতোষণীর উপসংহারে জীব নিজ পিতৃপরিচয় দিয়াছেন। রূপসনাতনের কনিষ্ঠ রামোপাসক বল্লভ ছিলেন তাঁহার পিতা। ডঃ সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সনাতন-রূপ-জীবের পরিচয় নামে একটি পুঁথির কয়েকটি পাতা উদ্ধার করিয়াছেন।[১] ইহা হইতে জানা যায় যে জীবের আরও একজন ভ্রাতা ছিলেন। অক্ষর অস্পষ্ট থাকায় তাঁহার নাম কি ছিল সঠিক জানা যায় না। ডঃ সেন গোপাল নামটি আন্দাজ করিয়া লইয়াছেন। এই বিবরণ কতটা সত্য তাহা সঠিক বলা সম্ভব নহে।

চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায় জীবের পিতার 'অনুপম মল্লিক' উপাধি ছিল।

> অনুপম মল্লিক, তাঁর নাম শ্রীবল্লভ।
> রূপ গোসাঞির ছোট ভাই পরম বৈষ্ণব ॥ —চৈ. চ. ২।১৯।৩৬

ভক্তিরত্নাকরে প্রদত্ত কিংবদন্তী হইতে জানা যায় শ্রীচৈতন্যই এই 'অনুপম' নামটি রাখেন।

> শ্রীরূপের অনুজ বল্লভ বিজ্ঞবর।
> অনুপম নাম থুইল শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর ॥ —ভ. র. ১।৬৬৫

চৈতন্যচরিতামৃতে এ সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই। সুতরাং ইহা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। পাঠান মুঘল আমলে রাধাকুণ্ডের জমি বিক্রয় সংক্রান্ত সরকারী দলিল হইতে দেখা যায় যে, জীব প্রত্যেকটি দলিলে নিজেকে বল্লভ গোঁসাইয়ের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। পিতার অনুপম নাম একবারও ব্যবহার করেন নাই। শ্রীচৈতন্য তাঁহার পিতাকে অনুপম নাম দিয়া থাকিলে ইহা ব্যবহৃত হইল না কেন ভাবিবার বিষয় (দলিলের ইংরাজী অনবাদ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

[১] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, ৩য় সং, পৃঃ ৩০২-৩০৩

সতীশচন্দ্র মিত্র ও স্যার যদুনাথ সরকার অনুপম গৌড়ের টাঁকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়াছেন।[১] কি প্রমাণবলে তাঁহারা ইহা বলিয়াছেন জানা যায় না। তবে অনুপম যে গৌড়ের রাজদরবারে কার্য করিতেন তাহা চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়।

শ্রীচৈতন্য যখন রামকেলিতে আসেন তখন রূপ ও সনাতনের সহিত অনুপমও তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না।

১৫১৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর-নভেম্বরে রূপের সহিত বৃন্দাবন যাত্রাকালে অনুপম প্রয়াগে শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করেন। তাহার পর বৃন্দাবনে যান এবং সেখানে কয়েক মাস থাকিয়া নীলাচলে আসিবার জন্য রূপের সঙ্গে বাহির হন। গৌড় হইয়াই নীলাচলে যাইবেন এইরূপ দুই ভ্রাতার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু পথে গৌড়ে গঙ্গাতীরে অনুপমের মৃত্যু হয়। ইহা সম্ভবতঃ ১৫১৬ খৃষ্টাব্দের জুন-জুলাই হইবে, কারণ ইহার কিছুদিন পরেই রথযাত্রার আরম্ভের কথা জানিতে পারা যায় (চৈ. চ. ৩।১।৩২-৩৪)।

শ্রীচৈতন্যের সংস্পর্শে আসিলেও অনুপম জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রামোপাসনা ত্যাগ করেন নাই।

আবির্ভাব

জীবের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থসমূহে যেরূপ বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

সজ্জনতোষণী পত্রিকা ১২৯২ সাল, ২য় খণ্ড		পৃঃ ২৫	১৪৫৫ শক	(১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ)
সতীশচন্দ্র মিত্র	সপ্তগোস্বামী	পৃঃ ২০৮	১৪৩৩ শক	(১৫১১ „)
জগদ্বন্ধু ভদ্র	গৌরপদতরঙ্গিণী	পৃঃ ৪৫	১৪৫৫ শক	(১৫৩৩ „)
হরিলাল চট্টোপাধ্যায়	বৈষ্ণব ইতিহাস	পৃঃ ৬৩	১৪৫৫ শক	(১৫৩৩ „)
পুলিন দাস	বৃন্দাবন কথা	পৃঃ ৮৪	১৪৪৫ শক	(১৫২৩ „)
সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ	অচিন্ত্যভেদাভেদ (পরিশিষ্ট)	পৃঃ ৫৫	১৪৪৫ শক	(১৫২৩ „)

অনুপম ১৫১৬ খৃষ্টাব্দের জুন-জুলাইয়ের মধ্যে দেহত্যাগ করেন দেখাইয়াছি। সুতরাং ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে কিংবা ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে জীবের জন্ম হইয়াছিল যাঁহারা বলেন তাঁহাদের মত গ্রহণ করা চলে না। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে অনুপমের বৃন্দাবন যাত্রার প্রাক্কালে জীব গর্ভে আসিয়াছিলেন ধরিলে তাঁহার জন্ম ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে কিংবা বড়জোর ১৫১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে হয়। ইহার পরে সম্ভব নহে।

১ সপ্তগোস্বামী, পৃঃ ৬৯, *History of Bengal*, p. 153

ভক্তিরত্নাকরের কিংবদন্তী হইতে জানা যায় শ্রীচৈতন্য যখন রামকেলিতে গমন করেন, তখন শিশুবুদ্ধি জীব তাঁহাকে সঙ্গোপনে দেখেন।

শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল।
অতি প্রাচীনের মুখে এসব শুনিল ॥ —ভ. র. ১।৬৩৮

১৫১৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য রামকেলিতে গমন করেন পূর্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ভক্তিরত্নাকরের কিংবদন্তীতে বিশ্বাস করিয়া ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে জীবের বয়স সর্বোচ্চ ছয়-সাত বৎসর ধরিলে (শিশুবুদ্ধি বালকের ইহার বেশী ধরা যায় না) আবির্ভাব কাল ১৫০৮-১৫০৯ খৃষ্টাব্দ হয়। জীবের সর্বোচ্চ আবির্ভাব কাল ১৫১৮ খৃষ্টাব্দের উর্ধ্বে হইতে পারে না দেখাইয়াছি। সুতরাং জীব ১৫০৮-১৫০৯ খৃষ্টাব্দ বা তাহার কাছাকাছি হইতে ১৫১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন। এই হিসাবে সতীশচন্দ্র মিত্রের অনুমান অসঙ্গত হয় না।

বাল্যকাল ও শিক্ষা

নরহরি চক্রবর্তী কিংবদন্তী সংগ্রহ করিয়া যে ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ লিখেন তাহা হইতে জানা যায় যে, পিতৃপিতৃব্যাদি যখন গৌড়ের রাজদরবারে বর্তমান ছিলেন তখন জীব রামকেলিতে বাস করিতেন। ইহা খুবই সম্ভব। পরে পিতৃপিতৃব্যাদি রামকেলি পরিত্যাগ করিলে জীবও বাকলাচন্দ্রদ্বীপ এবং ফতেহাবাদে চলিয়া আসেন মনে হয়। ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায় যে পিতৃবিয়োগ ঘটিলে বালক জীব মায়ের স্নেহে ও যত্নে পালিত হন। পাঠ্যাবস্থা হইতেই জীবের কৃষ্ণভক্তি দেখা দিয়াছিল। ছাত্র হিসাবে তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী ছিলেন। অল্পায়াসেই তিনি ব্যাকরণ, অলংকার প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

অল্পকালে শ্রীজীবের বুদ্ধি চমৎকার।
ব্যাকরণ আদিশাস্ত্রে অতি অধিকার ॥ —ভ. র.

গৃহত্যাগ

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জীব পিতৃপিতৃব্যাদির ন্যায় সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নবদ্বীপে নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ লইয়া কাশীধাম হইয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হন (ভ. র. ১।৬৮৩-৭৮১)। এই সময়ে সম্ভবতঃ তিনি ত্রিশের কোঠা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

ভক্তিরত্নাকরে আছে যে রূপ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু রচনাকালে সংশোধনাদি কার্যের জন্য জীবের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। উক্ত গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৪১ খৃষ্টাব্দ

পাওয়া যায়। জীবের আবির্ভাব ১৫০৮-১৫০৯ খৃষ্টাব্দে কিংবা তাহার কাছাকাছি হইয়াছে মনে করিলে বৃন্দাবনে আগমনকালে তাঁহার বয়ঃক্রম একত্রিশ-বত্রিশ বৎসরই হয়। ভক্তিরত্নাকরে প্রদত্ত বিবরণে বল্লভ ভট্টের সহিত তর্ককালে জীবের যে উগ্রতার পরিচয় মেলে তাহাও তাঁহার তারুণ্যেরই ইঙ্গিতবাহী।

জীব ও মধুসূদন বাচস্পতি

মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত 'অদ্বৈতসিদ্ধি' গ্রন্থের সম্পাদনা করিতে গিয়া সম্পাদক রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মন্তব্য করিয়াছেন, '১২।১৩ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীজীব মধুসূদনের ৩০ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের নিকট অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিয়াছিলেন।'[১] এই মত গ্রহণে আপত্তি রহিয়াছে। রাধাকুণ্ড হইতে সংগৃহীত দলিলের সাহায্যে জানা যায় জীব ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে রাধাকুণ্ডের জমি কেনেন। ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে জীব যেখানে জমি কিনিতেছেন সেখানে তিনি ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে ব্রজমণ্ডলে বাস করিতেছিলেন অনুমান করা যায়। সুতরাং বৃন্দাবনে গমন করিবার পর ব্রজমণ্ডল ছাড়িয়া অদ্বৈতবাদ শিক্ষার জন্য কাশীতে জীব গমন করেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না।

পি. সি. দিয়ানজী তাঁহার সম্পাদিত মধুসূদন সরস্বতীর 'সিদ্ধান্তবিন্দু' গ্রন্থের ভূমিকায় বিশেষ প্রমাণসহকারে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে মধুসূদন সরস্বতী ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে কিংবা তাহার কাছাকাছি সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন সরস্বতীর জন্মকাল ধরিলে ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বয়স মাত্র পনর বৎসর হয়। পনর বৎসরের বালক জীবের শিক্ষাগুরু ছিলেন ইহা কিছুতেই বলা চলে না।

ভক্তিরত্নাকরে বলা হইয়াছে জীব বৃন্দাবন যাত্রাকালে পথিমধ্যে কাশীতে মধুসূদন বাচস্পতির নিকট বেদান্তাদি শিক্ষা করেন (ভ. র. ১।৭৭৫-৭৭৭)। ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত মধুসূদন বাচস্পতি কে ছিলেন জানা যায় না। একজন মধুসূদন বাচস্পতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি অশৌচসংক্ষেপ, ব্রতকালনিষ্কর্ষ প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থের রচয়িতা। ইনি স্মার্ত। ইঁহার কাছে জীব বেদান্তাদি শিক্ষা করেন মনে হয় না।

জীব ও মীরাবাঈ

ভক্তমালের টীকাকার প্রিয়াদাস জীবের সহিত মীরাবাঈয়ের সাক্ষাতের কথা বলিয়াছেন।

১ অদ্বৈতসিদ্ধি, ভূমিকা, পৃঃ ১০১

বৃন্দাবন আঈ জীব গুঁসাই জু সোঁ মিলীঝিলী।
তিয়া মুখ দেখিয়ে কো পণ লে আয় ছুটায়ো হ্যায় ॥

ইহার 'বার্তিক তিলক' নামক একটি টীকাতেও বলা হইয়াছে 'প্রশংসা শুন একদিন আপ শ্রীজীব গুঁসাইজীকে মিলনেকো গঈ, গুঁসাইজী নে কহলা ভেজাকি ম্যাঁয় স্ত্রীকা মুখ নঁহী দেখতা। শ্রীমীরাজীনে উত্তর দিলা ভেজা ম্যাঁয় তো আজতক পুরুষ এক শ্রীগিরিধরলাল। জী হো কী জানতী থী ঔর সব জীবমাত্র কো স্ত্রী সমঝতো থী। পরন্তু জীব গুঁসাইজী দুসরে পুরুষ বৃন্দাবন মে বনে হয়ে বৈঠে হ্যাঁয় কি স্ত্রীকা মুখ নহী দেখতে।...ইহস প্রকার উত্তর শুন গুঁসাইজী স্বয়ং চলকে আপনা পণ ছোড়, আপকে দর্শন কিয়ে'।[১]

জীবের সহিত মীরাবাঈয়ের সাক্ষাৎ অন্য কোনও বৈষ্ণবগ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই। ভক্তমালের মূলেও এ সম্পর্কে কোন বিবৃতি নাই। এই রকম একটি ঘটনা ঘটিয়া থাকিলে বৃন্দাবনের বহু কিংবদন্তী আহরণকারী নরহরি চক্রবর্তীর দৃষ্টি এড়াইত না।

জীব ও আকবর বাদশাহ

সতীশচন্দ্র মিত্র আকবরের সহিত জীবের সাক্ষাৎ হয় বলিয়াছেন।[২] সম্ভবতঃ তিনি ভক্তকল্পদ্রুম নামক একটি হিন্দীগ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া এই মন্তব্য করেন। উক্ত গ্রন্থে আছে, 'বাদশাহ আকবর বৃন্দাবনমেঁ আয়া উয়ে গোসাইজীকে দর্শন কো গয়া চলতী সময় বিনয় কিয়া কি ওয়াস্তে বনওয়া দেনে মকান ইত্যাদি কে কুছ আজ্ঞা হোয় গোঁসাইজি নে কহা কি হৃদয় কী আঁখো সে শ্রীবৃন্দাবন উয়ে ইহাকে সজাবট কো দেখনা চাহিয়ে তিস পিছে হঠ হঠ আপনে শ্রদ্ধা কি অনুকূল উচিত হ্যায়'।[৩] দিনইলাহী ধর্মমত প্রবর্তনের পর আকবর বিভিন্ন ধর্মসম্পর্কে উদারপন্থী হইয়াছিলেন। আগ্রা ও দিল্লীর মধ্যবর্তী বৃন্দাবনে কোনও এক সময়ে আসা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। কিন্তু অন্য কোনও বৈষ্ণবগ্রন্থে এই ধরনের বিবরণ না পাওয়ায় ইহা কতদূর সত্য বলা যায় না।

জীব ও জাহ্নবা

জীবের সহিত নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবার সাক্ষাৎকারের কথা 'ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তম বিলাস' গ্রন্থদ্বয়ে নরহরি চক্রবর্তী বলিয়াছেন। জাহ্নবা বৃন্দাবনে গেলে

১ ভক্তমাল সটীক, নবলকিশোর সং, পৃঃ ৩২১-৩২২
২ সপ্ত গোস্বামী, পৃঃ ১৭৯
৩ ভক্তকল্পদ্রুম, পৃঃ ২৫৬

জীব তাঁহাকে লইয়া ব্রজমণ্ডল পরিদর্শন করান এবং জাহ্নবার ইচ্ছায় সনাতন, রূপ প্রভৃতির রচিত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া শোনান, ইহাও ভক্তিরত্নাকরে বিবৃত রহিয়াছে।

শুনিতে গোসাঞির গ্রন্থ উৎকণ্ঠিত মন।
শ্রীজীব গোস্বামী করাইলেন শ্রবণ ॥
বৃহদ্ভাগবতামৃতাদিক শ্রবণেতে।
হইলা বিহ্বল প্রেমে নারে স্থির হৈতে ॥ —ভ. র. ১১৷২০১-২০২

ঐছে জাহ্নবা কত দিবস রহিলা।
শ্রীজীব গোস্বামী কিছু গ্রন্থ শুনাইলা ॥ —নরোত্তম বিলাস

খেতরী উৎসবের শেষে জাহ্নবা বৃন্দাবনে আগমন করেন এইরূপ জানা যায়। ১৫৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে কিংবা তাহার কাছাকাছি কালে খেতরী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বিশেষ প্রমাণযোগে অনুমান করিয়াছেন।[১] জাহ্নবা ইহার পর বৃন্দাবনে আসিয়া থাকিলে জীবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে কারণ জীব ১৫৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে।

জীব ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ

'বিবর্তবিলাস' প্রভৃতি একশ্রেণীর সহজিয়া গ্রন্থে জীব ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের মধ্যে মতবিরোধিতা ছিল বলা হইয়াছে। ঐ সমস্ত গ্রন্থমতে জীব কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষাতে চৈতন্যচরিতামৃত বর্ণনা পছন্দ করেন নাই। তিনি উক্ত গ্রন্থ রচিত হইলে উহা যমুনাতে ফেলিয়া দেন। পরে ঐ গ্রন্থ জলে না ডুবিয়া ভাসিতে থাকিলে উহার মাহাত্ম্য স্বীকার করেন এবং গ্রন্থ উদ্ধার করেন।

জীব গোসাঞি গ্রন্থ দেখি স্তম্ভিত হৈলা।
ক্রোধপ্রায়ে কবিরাজে কহিতে লাগিলা ॥
বাক্যত করিয়া কেনে করিলে বর্ণনে।
পরকীয়া ভাব কেন কৈলে প্রকাশনে ॥

* * *

তুমি যে লিখিলে জীবে সম্ভব না হয়।
এত কহি গ্রন্থ লৈয়া যমুনা ডরায় ॥
যমুনার স্রোত বহে বিষম তরঙ্গ।
তৃণ খণ্ড পড়ে যদি হয়ে যায় ভঙ্গ ॥

[১] ষোড়শ শতকের পদাবলীসাহিত্য, পৃঃ ১৩৩

ঐছনে তরঙ্গ পুঁথি উজান চলিল।
দেখিয়া শুনিয়া সবে চমৎকার হইল ॥
তবে সর্ব বৈষ্ণব শ্রীজীবে নিবেদিলা।
জল হইতে জীব গোসাঞি গ্রন্থ আনিলা ॥
আনাইলা গ্রন্থ বহু প্রশংসা করিয়া।
কুঠরির মধ্যে পুঁথি রাখিল ভরিয়া ॥ —বিবর্তবিলাস

এই ধরনের বিবৃতি প্রামাণিকতাহীন এবং ঘটনাও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেনের মত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন,—'জীব গোস্বামীর সঙ্গে কৃষ্ণদাসের কোন বিরোধ ছিল না, থাকিবার কথাও নয়। তবে দুইজনের মধ্যে বৈষ্ণবতত্ত্ব বিষয়ে অল্পস্বল্প মতানৈক্য ছিল। তাহা বুঝিতে পারি গোপালচম্পূ হইতে। গোবিন্দলীলামৃতে কৃষ্ণদাস যে নিত্যলীলা বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহাতে ব্রজলীলার মধ্যে অবতারকার্যের ও শিশুবিক্রীড়িতের স্থান নাই, গোপাল-চম্পূতে জীব গোস্বামী এ সব লীলাও নিত্যলীলার মধ্যে স্থান দিয়াছেন। কৃষ্ণদাসও এ বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

শ্রীগোপালচম্পূ নামে গ্রন্থ মহাশূর।
নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরসপুর ॥
গোপালচম্পূ নামে আর গ্রন্থ কৈল।
ব্রজপ্রেম লীলারস সার দেখাইল ॥

যে সব ব্রজবাসী মহান্তের অনুরোধে কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিতামৃত লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে জীব গোস্বামীর নাম নাই। সম্ভবত জীব গোস্বামী বাঙ্গালায় কৃষ্ণলীলাময় চৈতন্যচরিত রচনা পছন্দ করেন নাই'।[১]

জীব ও রাধাদামোদর

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে গোপীনাথ, মদনমোহন ও গোবিন্দদেব এই তিন বিগ্রহের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু রাধাদামোদরের বিষয়ে কিছু বলেন নাই। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে 'রাধাদামোদর রাধারমণ বিগ্রহাদির কথা চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত নাই সুতরাং এই সমস্ত বিগ্রহের প্রকট চৈতন্যচরিতামৃত রচনার পর হইয়াছিল'।[২] ইহা মানিয়া লওয়া যায় না। নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায় যে রূপ রাধাদামোদরের বিগ্রহটিকে

১ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, ৩য় সং, পৃঃ ৩৪৫-৩৪৬
২ বৃন্দাবন কথা, পৃঃ ১২৩

স্বহস্তে নির্মাণ করিয়া জীবের উপর ইহার সেবাভার অর্পণ করেন (ভ. র. ৪।২৮৬)। নরহরি চক্রবর্তী সাধনদীপিকা গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়াই ইহা বলিয়াছেন। সাধনদীপিকাতে আছে,—

রাধাদামোদরো দেবঃ শ্রীরূপঃ করনির্মিতঃ।
জীব গোস্বামিনে দত্তঃ শ্রীরূপেণ কৃপাব্ধিনা॥

সাধনদীপিকাকার রাধাকৃষ্ণ দাস গোবিন্দসেবাধ্যক্ষ হরিদাস পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং ইহার প্রামাণিকতায় বিশ্বাস করা যায়।

তিরোভাব

১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গৌরপদতরঙ্গিণীতে জগদ্বন্ধু ভদ্র জীবের ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে তিরোধান হয় বলিয়া মন্তব্য করেন। তিনি ইহা কি প্রমাণবলে স্থির করিয়াছিলেন জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি ১২৯২ সালে প্রকাশিত সজ্জনতোষণী পত্রিকায় প্রদত্ত 'ছয় গোস্বামীর অব্দ নির্ণয়' হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। সম্পাদক বলিয়াছেন, 'আমরা কোন বৈষ্ণবের দপ্তর অন্বেষণ করিতে করিতে নিম্নলিখিত শকাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার মধ্যে কতকগুলি নিঃসন্দেহ বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি অব্দ সম্বন্ধে সন্দেহ হয়'।[1] ইহাতে প্রদত্ত জীবের জন্মশক যে কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নহে তাহা দেখাইয়াছি। জগদ্বন্ধু ভদ্রকে অনুসরণ করিয়া পরবর্তী পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই ১৬১৮ খৃষ্টাব্দকে জীবের তিরোধান বৎসর বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। নিম্নে গ্রন্থগুলির নাম দেওয়া হইল।

ডঃ সুশীলকুমার দে History of Sanskrit Poetics		p. 256	১৬১৮ খৃষ্টাব্দ
শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার জীবনীকোষ	(৩য় খণ্ড)	পৃঃ ৭০১	” ”
পঞ্চানন মণ্ডল সাহিত্যপ্রকাশিকা	(২য় খণ্ড)	পৃঃ ৪৮	” ”
নগেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বকোষ	(৭ম খণ্ড)	পৃঃ ১০৯	” ”
হরিলাল চট্টোপাধ্যায় বৈষ্ণব ইতিহাস		পৃঃ ৬৩	” ”

সপ্তগোস্বামী গ্রন্থ প্রণেতা সতীশচন্দ্র মিত্র জীবের তিরোধান ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে হয় বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।[2] জীব ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে গোপালচম্পূ রচনার পর আরও ছয়খানি গ্রন্থ লেখেন। পরবর্তী পরিচ্ছেদে গ্রন্থের বিবরণে ইহা দেখান যাইতেছে। এই ছয় খানি গ্রন্থ লিখিতে অন্ততঃ কমপক্ষে তিন চারি বৎসর লাগিয়া থাকিবার কথা। ইহা হইতে জীব যে ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন তাহা

১ সজ্জনতোষণী, ১২৯২ সাল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫
২ সপ্তগোস্বামী, পৃঃ ২৫৮, পাদটীকা

প্রমাণিত হয়। কিন্তু উক্ত সময়েই যে তিরোহিত হইয়াছিলেন তাহা জোর করিয়া বলা চলে না।

জীবের রচিত গ্রন্থাবলী

ছয় গোস্বামীর মধ্যে জীবই সর্বাপেক্ষা বেশী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। লঘুতোষণীর উপসংহারে জীব পিতৃপিতৃব্যাদির পরিচয় দিলেও নিজের সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলেন নাই। তিনি কি কি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন সে সম্পর্কে তথ্য আহরণ করিতে হইলে তৎশিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারীর উপর নির্ভর করিতে হয়। কৃষ্ণদাস অধিকারী স্বীয় গুরুর কীর্তির একটি বিশদ পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। নরহরি চক্রবর্তী ইহা ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সতীশচন্দ্র মিত্র এই তালিকা জীবের নিজকৃত বলিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা ভ্রমাত্মক।[১]

কৃষ্ণদাস অধিকারীর প্রদত্ত গ্রন্থতালিকা এইরূপ,—

শ্রীমদ্বল্লভপুত্র শ্রীজীবস্য কৃতিয্‌দ্যতে।
শব্দানুশাসনং নাম্না হরিনামামৃতং তথা॥
তৎসূত্রমালিকা তত্র প্রযুক্তো ধাতুসংগ্রহঃ।
কৃষ্ণার্চাদীপিকা সূক্ষ্মা গোপালবিরুদাবলী॥
রসামৃতশ্চ শেষশ্চ শ্রীমাধবমহোৎসবঃ।
সঙ্কল্পকল্পবৃক্ষো যশ্চম্পূর্ভাবার্থসূচকঃ॥
টীকা গোপালতাপন্যাঃ সংহিতায়াশ্চ ব্রহ্মণঃ।
রসামৃতোজ্জ্বলস্য যোগসারস্তবস্য চ॥
তথা চাগ্নিপুরাণস্থগায়ত্রীবিবৃতিরপি।
শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নানাং পাদ্মোক্তনামথপি চ॥
লক্ষ্মীবিশেষরূপা যা শ্রীমদ্বৃন্দাবনেশ্বরী।
তস্যাঃ করপদস্থানাং চিহ্নানাঞ্চ সমাহৃতিঃ॥
পূর্বোত্তরতয়া চম্পূদ্বয়ী যা চ ত্রয়ী ত্রয়ী।
সন্দর্ভাঃ সপ্ত বিখ্যাতাঃ শ্রীমদ্ভাগবতস্য বৈ॥
তত্ত্বাখ্যো ভগবৎসংজ্ঞঃ পরমাত্মাখ্য এব চ।
কৃষ্ণভক্তিপ্রীতিসংজ্ঞাঃ ক্রমাখ্যঃ সপ্তমঃ স্মৃতঃ।
সম্বন্ধশ্চ বিধেয়শ্চ প্রয়োজনমিতি ত্রয়ম্।
হস্তামলকবদ্ যেষু সদ্ভিরাদ্যৈঃ প্রকাশিতম্ ইত্যাদয়ঃ॥

[১] সপ্তগোস্বামী, পৃঃ ২৩৮

কৃষ্ণদাস অধিকারীর প্রদত্ত এই তালিকার উপর নির্ভর করিয়াই নরহরি চক্রবর্তী লিখিয়াছেন,—

শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিদিত।
হরিনামামৃতব্যাকরণ দিব্য রীত ॥
সূত্রমালিকা ধাতুসংগ্রহ সুপ্রকার।
কৃষ্ণার্চনদীপিকা গ্রন্থ অতি চমৎকার ॥
গোপালবিরুদাবলী রসামৃতশেষ।
শ্রীমাধবমহোৎসব সর্বাংশে বিশেষ ॥
শ্রীসংকল্পকল্পবৃক্ষ গ্রন্থের প্রচার।
ভাবার্থসূচক চম্পূ অতি চমৎকার ॥
গোপালতাপনী টীকা ব্রহ্মসংহিতার।
রসামৃতটীকা শ্রীউজ্জ্বলটীকা আর ॥
যোগসারস্তবের টীকাতে সুসঙ্গতি।
অগ্নিপুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রীভাষ্য তথি ॥
শ্রীরাধিকার করপদস্থিত চিহ্ন ভিন্ন ॥
গোপালচম্পূ পূর্ব-উত্তর বিভাগেতে।
বর্ণিলেন কি অদ্ভুত বিদিত জগতে ॥
সপ্তসন্দর্ভ বিখ্যাত ভাগবতরীতি।
তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম, কৃষ্ণভক্তিপ্রীতি ॥
এই ছয় ক্রমসন্দর্ভসহ সপ্ত হয়।
প্রয়োজনাভিধেয় সম্বন্ধ ইথে ত্রয় ॥ —ভ. র. ১।৮৩৩-৮৪২

কৃষ্ণদাস অধিকারীর তালিকার শেষে ইত্যাদয়ঃ জীবের আরও গ্রন্থ রহিয়াছে এইরূপ সূচিত করে। জীবের দুইটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এই তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই দেখা যাইতেছে। একটি লঘুতোষণী অপরটি সর্বসম্বাদিনী।

জীব সর্বপ্রথম কোন গ্রন্থটি রচনা করেন তাহা বলা দুষ্কর। তাঁহার প্রথম সন তারিখযুক্ত গ্রন্থের নাম মাধবমহোৎসব। ইহা ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত। মাধব-মহোৎসবের পূর্বে অন্য গ্রন্থ রচিত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু কোন তারিখাদি না থাকায় সুস্পষ্ট করিয়া কিছু বলা সম্ভব নহে।

ভক্তিরত্নাকরে প্রদত্ত ক্রমানুসারে গ্রন্থগুলির পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

হরিনামামৃতব্যাকরণ—বৈষ্ণবগণের পক্ষে ব্যাকরণ পাঠ করা প্রয়োজন অথচ ব্যাকরণের সংজ্ঞা ও সূত্রগুলি হরিনাম বিবর্জিত। সেইজন্য জীব গোস্বামী এমনভাবে ব্যাকরণ তৈয়ারী করিলেন যাহাতে একই কালে বৈষ্ণবগণের হরিনাম করা হয় অথচ

ব্যাকরণ শিক্ষাও হয়। জীব তাঁহার এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য মঙ্গলাচরণ শ্লোকে জানাইয়াছেন।

কৃষ্ণমুপাসিতমস্য স্রজমিব নামাবলিং তনবৈ।
ত্বরিতং বিতরেদেষা তৎসাহিত্যাদিজামোদম্॥
আহতজল্পিতজটিতং দৃষ্ট্বা শব্দানুশাসনস্তোমম্।
হরিনামাবলিবলিতং ব্যাকরণং বৈষ্ণবার্থমাচিন্মঃ॥
ব্যাকরণে মরুনীবৃতি জীবনলুব্ধাঃ সদাঘসংবিগ্নাঃ।
হরিনামামৃতমেতৎ পিবন্তু শতধাবগাহন্তাম্॥
সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণের উপাসনা হেতু যেরূপ ভক্তগণ মালা বিস্তার করেন, আমিও তদ্রূপ ভগবন্নামসমূহ সূত্রসাহায্যে গাঁথিয়া বিস্তৃত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। এই নামাবলী সত্যই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গজনিত আনন্দ বিতরণ করিবে। অন্যান্য ব্যাকরণগুলি তর্ক যোগ্য, বাগাড়ম্বরপূর্ণ এবং মিশ্রজ্ঞানপ্রকাশক জানিয়া বৈষ্ণবদিগের জন্য শ্রীহরিনাম সমূহে গ্রথিত এই ব্যাকরণ সংগ্রহ করিতেছি। এইরূপ দুর্বোধ্য ব্যাকরণরূপ মরু-ভূমিতে যাঁহারা জীবনরূপ জল পাইবার নিমিত্ত নানাবিধ কষ্টে পড়িতেছেন, তাঁহারা এই হরিনামামৃত ব্যাকরণরূপ অমৃত পান করুন এবং শত শতবার অবগাহন করুন। সঙ্কেত, পরিহাস, পাদপূরণে কিংবা অনায়াসে হরিনাম লইলেও সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। গ্রন্থরচনার অনুপ্রেরণা যিনি যোগাইয়াছিলেন জীব তাঁহার কথাও বলিয়াছেন।

ভগবন্নামবলিতা ভগবদ্ভক্তিতৎপরৈঃ।
বৃন্দাবনস্থজীবস্য কৃতিরেষা তু গৃহ্যতাম্॥
ছান্দসাপ্রচরদ্রূঢ়শব্দান্ বিনা ময়া।
অত্রালেখি তদিচ্ছা চেদ্দৃশ্যোহন্যঃ শাস্ত্রসংগ্রহঃ॥
হরিনামামৃতসংজ্ঞং যদর্থমেতৎ প্রকাশয়ামাসে।
উভয়ত্র চ মম মিত্রং স ভবতু গোপালদাসাখ্যঃ॥

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিযাজনকারীগণ বৃন্দাবনস্থ জীবের রচিত ভগবন্নামসংবলিত এই গ্রন্থ লউন। আমি ছান্দস ও অপ্রচরদ্রূঢ় (যে সমূহ শব্দের প্রায় ব্যবহার দেখা যায় না) শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ দ্বারা এই গ্রন্থ রচনা করিলাম। যদি কাহারও সেইরূপ রূঢ়শব্দজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তিনি অন্য গ্রন্থ হইতে চয়ন করিবেন। যাঁহার জন্য এই হরিনামামৃত ব্যাকরণ লিখিত হইল, ব্যবহারে ও পরমার্থে সেই গোপালদাস আমার মিত্র হউন।

এই গোপালদাস নিশ্চয়ই সাধনদীপিকা উল্লিখিত গোপালদাস হইবেন। সাধন-

দীপিকায় বলা হইয়াছে, 'গোপালদাস নামা কোঽপি বৈশ্যঃ শ্রীজীবগোস্বামিপাদানাং প্রিয়শিষ্যঃ। তৎপ্রার্থনাপরবশেন তেন স্বকীয়াত্বং সিদ্ধান্তিতম্' (৯ম কক্ষা)। ভক্তিরত্নাকরে নন্দগ্রামের নিকটবর্তী পাবনসরোবরতীরস্থ কুটিরবাসী সনাতনের অনুগত একজন গোপালদাসের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি জীবশিষ্য গোপালদাস হইতে অভিন্ন হইলেও হইতে পারেন।

সূত্রমালিকা এবং ধাতুসংগ্রহ দুইটি পৃথক গ্রন্থ নহে। ইহা হরিনামামৃত ব্যাকরণেরই অন্তর্ভুক্ত পৃথক পৃথক অধ্যায় বিশেষ। হরিনামামৃত ব্যাকরণে মোট ৩১৮৬টি সূত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে,—(১) ১-৪৩ সূত্রে সংজ্ঞা প্রকরণ, সন্ধিপ্রকরণ, (২) ৪৪-৯৫ সূত্রে সর্বেশ্বর সন্ধি [স্বরসন্ধি], (৩) ৯৬-১৩০ সূত্রে বিষ্ণুজন সন্ধি [ব্যঞ্জন সন্ধি], (৪) ১৩১-১৪৮ সূত্রে বিষ্ণুসর্গসন্ধি [বিসর্গসন্ধি], বিষ্ণুপদ প্রকরণ, (৫) ১৪৯-২১০ সূত্রে সর্বেশ্বরান্ত পুরুষোত্তম লিঙ্গ [স্বরান্ত পুংলিঙ্গ], (৬) ২১১-২২১ সূত্রে লক্ষ্মীলিঙ্গ [স্বরান্ত স্ত্রীলিঙ্গ], (৭) ২২২-২৩৯ সূত্রে ব্রহ্মলিঙ্গ [স্বরান্ত ক্লীবলিঙ্গ], (৮) ২৪০-২৯৫ সূত্রে বিষ্ণুজনান্ত পুরুষোত্তম লিঙ্গ [ব্যঞ্জনান্ত পুংলিঙ্গ], (৯) ২৯৬-২৯৮ সূত্রে লক্ষ্মীলিঙ্গ [ব্যঞ্জনান্ত স্ত্রীলিঙ্গ], (১০) ২৯৯-৩০২ সূত্রে ব্রহ্মলিঙ্গ [ব্যঞ্জনান্ত ক্লীবলিঙ্গ], (১১) ৩০৩-৩১১ সূত্রে বিশেষণ লিঙ্গ, (১২) ৩১২-৩৬৪ সূত্রে কৃষ্ণনাম প্রকরণ [সর্বনাম], (১৩) ৩৬৫-৯৪৮ সূত্রে আখ্যাত প্রকরণ, (১৪) ৯৪৯-১১৪৫ সূত্রে কারক প্রকরণ ও অচ্যুতাদি অর্থ [লকারার্থ নির্ণয়], (১৫) ১১৪৬-১২২১ সূত্রে আত্মপদ-পরপদ প্রক্রিয়া [আত্মনেপদ-পরস্মৈপদবিধান], (১৬) ১২২১-১৬৮৬ সূত্রে কৃদন্ত প্রকরণ, (১৭) ১৬৮৭-২০৫৯ সূত্রে সমাস প্রকরণ, (১৮) ২০৬০-৩১৮৬ সূত্রে তদ্ধিত প্রকরণ।

হরিনামামৃত ব্যাকরণের দুইজন টীকাকারের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী গ্রামের অধিবাসী হরেকৃষ্ণ আচার্য সমাস প্রকরণে ৩৫৯ সূত্র পর্যন্ত টীকা করেন। হরেকৃষ্ণ আচার্যের অসমাপ্ত কার্য গোপীচরণ দাস ১২৫৩ সনে বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্বে বসিয়া সমাপ্ত করেন।

সূত্রমালিকার কোনও পরিচয় অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। ধাতুসংগ্রহ যোগে হরিনামামৃতের কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পুরীদাস সংস্করণ উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণার্চনদীপিকা—রাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা নামে এই গ্রন্থ পুরীদাস কর্তৃক ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থপরিশিষ্টে জীবকৃত বলিয়া লঘু রাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা নামেও একটি গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এই গ্রন্থে শ্রীরাধার সহিত শ্রীমাধবের উপাসনার বিরোধবাক্যখণ্ডনপূর্বক তাহার আবশ্যকীয়ত্ব স্থাপিত হইয়াছে।

আরম্ভ এইরূপ,—

সনাতনাসমো যস্য জ্যায়ান্ শ্রীমান সনাতনঃ।
শ্রীবল্লভোঽনুজঃ সোঽসৌ শ্রীরূপো জীবসদ্গতিঃ॥
পুরাণসংহিতা তন্ত্রমন্ত্রশ্রুতিসমন্বিতম্।
গীতাভাগবতং শাস্ত্রং জয়তাদ্‌ব্রজধামসু॥
শ্রীদামোদররাধার্চনমর্হতি ব্রজস্থানাম্।
আবশ্যকতামশ্রাব্যনয়োরত্রাধিদেব্যং হি॥

অন্ত্য এইরূপ,—

রাধা বৃন্দাবনে যদ্বত্তদ্বদ্দামোদরো হরিঃ।
দর্শিতেষু চ শাস্ত্রেষু তদ্‌যুগ্মং তত্ত্বদীশিতুঃ॥
রাধয়া মাধবো দেবে মাধবেনৈব রাধিকা।
বিভ্রাজন্তে জনেম্বেতি পরিশিষ্টবচস্তথা॥
ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী ন হরিঃ পদ্মজাং বিনা।
হয়গ্রীবপঞ্চরাত্রমিহ প্রকটিতং যতঃ॥
কাতিকব্রতচর্যায়ামতন্তে যুগ্মদেবতে।
রাধাদামোদরাভিখ্যে বীক্ষ্যেতে লোকশাস্ত্রয়োঃ॥
কিং বহূক্ত্যা কুণ্ডযুগ্মং তয়োর্যুগ্মেন বক্ষ্যতে।
শাস্ত্রে চ দর্শিতা তস্মাৎ কৈমুত্যাদ্‌যুগ্মতা তয়োঃ॥
উমা মহেশ্বরৌ কেচিৎ লক্ষ্মীনারায়ণৌপরে।
তে ভজন্তাং ভজামস্ত রাধাদামোদরৌ বয়ম্॥

লঘু কৃষ্ণার্চনদীপিকার আরম্ভ ও অন্ত্য প্রায় অনুরূপ। রাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা পূর্ব গোপালচম্পুর পরে যে রচিত হইয়াছিল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, ইহাতে পূর্ব গোপালচম্পূ হইতে একটি শ্লোক ধৃত হইয়াছে। পূর্ব চম্পুর নিম্নোক্ত শ্লোকটি ইহাতে উদ্ধৃত রহিয়াছে, দেখা যায়।

লক্ষ্মীরভিতঃ স্ত্রিতমা, গোপ্যো লক্ষ্মীতমাঃ প্রথিতাঃ।
রাধা গোপিতমা চেদস্যাঃ কা বা সমা বামা॥

পূর্ব গোপালচম্পু ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। সুতরাং রাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দের পরে রচিত হইয়াছিল স্পষ্টই জানা যাইতেছে। জীবশিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারী ইহার 'প্রভা' নামে একটি টীকা করেন বলিয়া জানা যায় কিন্তু টীকার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

গোপালবিরুদাবলী—রূপের গোবিন্দবিরুদাবলীর অনুকরণে গোপালবিরুদাবলী লিখিত হয়। ইহা গোপালদেবের স্তুতিমূলক গ্রন্থ। জীব মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন,—

গোপালসুখদা সেয়ং গোপালবিরুদাবলী।
অর্থায় শ্রূয়তাং কল্পবিরুদাবলী কল্পতাম্ ॥

অর্থাৎ গোপালদেবের সুখদায়িকা এই গোপালবিরুদাবলী পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম সাধন করিবার জন্য কল্পলতারাজিবৎ উদিত হউক।

গোপালবিরুদাবলীতে মোট ৩৮টি শ্লোক রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ১ হইতে ৬ শ্লোক বধিত, ৭ হইতে ১০ শ্লোক বীরভদ্র, ১১ হইতে ১৪ শ্লোক সমগ্র, ১৫ হইতে ২০ শ্লোক অচ্যুত, ২১ হইতে ২৫ শ্লোক উৎপল, ২৬ হইতে ২৯ শ্লোক তুরঙ্গ, ৩০ হইতে ৩৩ শ্লোক গুণরতি ও ৩৪ হইতে ৩৮ শ্লোক মাতঙ্গখেলিত নামক বিরুদছন্দে লিখিত হইয়াছে। গোপালচম্পূর সর্বশেষ পূরণে জীব বিরুদছন্দে গোপালদেবের স্তুতি করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয়, গোপালচম্পূ রচনাকালে কিংবা তাহার পরে ইহা রচিত হইয়াছিল।

পাণিহাটি গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত পুঁথি মধ্যে রসিকদাস নামে জনৈক ব্যক্তির গোপালবিরুদাবলীর একটি টীকা পাওয়া যায়। পুষ্পিকায় আছে—'কৃতা রসিকদাসেন ব্যারূপ্য গ্রন্থকৃতাং মুদে' (পাণিহাটি পুঁথি নং ১৮)।

ভক্তিরসামৃতশেষ—রূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবর্ণিত কাব্যালঙ্কার-গুণদোষরীতি প্রভৃতি বিষয় বিশ্বনাথ কবিরাজকৃত সাহিত্যদর্পণানুসারে সংক্ষিপ্তাকারে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাকে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পরিশিষ্ট ভাগ বলা যাইতে পারে।

জীব মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন,—

রাধাকৃষ্ণপদাশ্রয়িরূপশ্রীঃ শশ্বদ্ভুতা স্ফুরতি।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর্যস্যাঃ প্রসরন্ জগন্তি পুষ্ণাতি ॥
উজ্জ্বলনীলমণিঃ সোপ্যুদগাত্তস্মাদ্ রসামৃতাম্বুধিতঃ।
ক্ষীরাম্বুধিতঃ প্রকটাং হরিরুচিমপ্যন্যথা ঘটয়ন্ ॥
তদমৃতসিন্ধুবিসৃষ্টং হরয়েঽলঙ্কাররত্নমাকলয়ন্।
সাহিত্যান্বয়ি দর্পণমপি সঙ্কলিতং করিষ্যামি ॥

অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণচরণাশ্রয়ী রূপের সেবাসৌন্দর্য অদ্ভুতরূপে প্রকাশিত হইয়া প্রসারিত হইয়াছে। তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ অনন্ত বিশ্বকে ভক্তি দ্বারা পোষণ করিতেছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে আবার উজ্জ্বলনীলমণি বাহির হইয়া ক্ষীরসমুদ্র হইতে আবির্ভূত ভগবান হরির অঙ্গকান্তিকে যেন ম্লান করিতেছে। সেই অমৃত-সিন্ধুকর্তৃক পরিত্যক্ত অলঙ্কাররত্ন শ্রীহরির উদ্দেশ্যে সমাহরণ করিতে গিয়া আমি এই সাহিত্যসম্বন্ধীয় দর্পণও সঙ্কলন করিব।

'ভক্তিরসামৃতশেষ'-এ সাতটি প্রকাশ আছে। প্রথম প্রকাশে কাব্যস্বরূপ নিরূপণ, দ্বিতীয় প্রকাশে বাক্যস্বরূপাদি নিরূপণ, তৃতীয় প্রকাশে ধ্বনি নির্ণয়, চতুর্থ প্রকাশে

আরম্ভ এইরূপ,—

সনাতনাসমো যস্য জ্যায়ান্ শ্রীমান সনাতনঃ।
শ্রীবল্লভোঽনুজঃ সোঽসৌ শ্রীরূপো জীবসদ্গতিঃ॥
পুরাণসংহিতা তন্ত্রমন্ত্রশ্রুতিসমন্বিতম্।
গীতাভাগবতং শাস্ত্রং জয়তাদ্‌ব্রজধামসু॥
শ্রীদামোদররাধার্চনমর্হতি ব্রজস্থানাম্।
আবশ্যকতামশ্রাব্যনয়োরত্রাধিদেব্যং হি॥

অন্ত্য এইরূপ,—

রাধা বৃন্দাবনে যদ্বত্তদ্বদ্‌দামোদরো হরিঃ।
দর্শিতেষু চ শাস্ত্রেষু তদ্‌যুগ্মং তত্তদীশিতুঃ॥
রাধয়া মাধবো দেবে মাধবেনৈব রাধিকা।
বিভ্রাজন্তে জনেষ্বেতি পরিশিষ্টবচস্তথা॥
ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী ন হরিঃ পদ্মজাং বিনা।
হয়গ্রীবপঞ্চরাত্রমিহ প্রকটিতং যতঃ॥
কার্তিকব্রতচর্যায়ামতন্তে যুগ্মদেবতে।
রাধাদামোদরাভিখ্যে বীক্ষ্যেতে লোকশাস্ত্রয়োঃ॥
কিং বহূক্ত্যা কুণ্ডযুগ্মং তয়োর্যুগ্মেন বক্ষ্যতে।
শাস্ত্রে চ দর্শিতা তস্মাৎ কৈমুত্যাদ্‌যুগ্মতা তয়োঃ॥
উমা মহেশ্বরৌ কেচিৎ লক্ষ্মীনারায়ণৌপরে।
তে ভজন্তাং ভজামস্তু রাধাদামোদরৌ বয়ম্॥

লঘু কৃষ্ণার্চনদীপিকার আরম্ভ ও অন্ত্য প্রায় অনুরূপ। রাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা পূর্ব গোপালচম্পুর পরে যে রচিত হইয়াছিল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, ইহাতে পূর্ব গোপালচম্পূ হইতে একটি শ্লোক ধৃত হইয়াছে। পূর্ব চম্পুর নিম্নোক্ত শ্লোকটি ইহাতে উদ্ধৃত রহিয়াছে, দেখা যায়।

লক্ষ্মীরভিতঃ স্ত্রিতমা, গোপ্যো লক্ষ্মীতমাঃ প্রথিতাঃ।
রাধা গোপিতমা চেদস্যাঃ কা বা সমা বামা॥

পূর্ব গোপালচম্পূ ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। সুতরাং রাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দের পরে রচিত হইয়াছিল স্পষ্টই জানা যাইতেছে। জীবশিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারী ইহার 'প্রভা' নামে একটি টীকা করেন বলিয়া জানা যায় কিন্তু টীকার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

গোপালবিরুদাবলী—রূপের গোবিন্দবিরুদাবলীর অনুকরণে গোপালবিরুদাবলী লিখিত হয়। ইহা গোপালদেবের স্তুতিমূলক গ্রন্থ। জীব মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন,—

গোপালসুখদা সেয়ং গোপালবিরুদাবলী।
অর্থায় শ্রূয়তাং কল্পবিরুদাবলী কল্পতাম্ ॥

অর্থাৎ গোপালদেবের সুখদায়িকা এই গোপালবিরুদাবলী পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম সাধন করিবার জন্য কল্পলতারাজিবৎ উদিত হউক।

গোপালবিরুদাবলীতে মোট ৩৮টি শ্লোক রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ১ হইতে ৬ শ্লোক বর্ধিত, ৭ হইতে ১০ শ্লোক বীরভদ্র, ১১ হইতে ১৪ শ্লোক সমগ্র, ১৫ হইতে ২০ শ্লোক অচ্যুত, ২১ হইতে ২৫ শ্লোক উৎপল, ২৬ হইতে ২৯ শ্লোক তুরঙ্গ, ৩০ হইতে ৩৩ শ্লোক গুণরতি ও ৩৪ হইতে ৩৮ শ্লোক মাতঙ্গখেলিত নামক বিরুদছন্দে লিখিত হইয়াছে। গোপালচম্পূর সর্বশেষ পুরণে জীব বিরুদছন্দে গোপালদেবের স্তুতি করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয়, গোপালচম্পূ রচনাকালে কিংবা তাহার পরে ইহা রচিত হইয়াছিল।

পাণিহাটি গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত পুঁথি মধ্যে রসিকদাস নামে জনৈক ব্যক্তির গোপালবিরুদাবলীর একটি টীকা পাওয়া যায়। পুষ্পিকায় আছে—'কৃতা রসিকদাসেন ব্যারূপ্য গ্রন্থকৃতাং মুদে' (পাণিহাটি পুঁথি নং ১৮)।

ভক্তিরসামৃতশেষ—রূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবর্ণিত কাব্যালঙ্কার-গুণদোষরীতি প্রভৃতি বিষয় বিশ্বনাথ কবিরাজকৃত সাহিত্যদর্পণানুসারে সংক্ষিপ্তাকারে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাকে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পরিশিষ্ট ভাগ বলা যাইতে পারে।

জীব মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন,—

রাধাকৃষ্ণপদাশ্রয়িরূপশ্রীঃ শশ্বদ্ভুতা স্ফুরতি।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর্যস্যাঃ প্রসরন্ জগন্তি পুষ্ণাতি ॥
উজ্জ্বলনীলমণিঃ সোপ্যুদগাত্তস্মাদ্ রসামৃতাম্বুধিতঃ।
ক্ষীরাম্বুধিতঃ প্রকটাং হরিরুচিমপ্যন্যথা ঘটয়ন্ ॥
তদমৃতসিন্ধুবিসৃষ্টং হরয়েঽলঙ্কাররত্নমাকলয়ন্।
সাহিত্যান্বয়ি দর্পণমপি সঙ্কলিতং করিষ্যামি ॥

অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণচরণাশ্রয়ী রূপের সেবাসৌন্দর্য অদ্ভুতরূপে প্রকাশিত হইয়া প্রসারিত হইয়াছে। তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ অনন্ত বিশ্বকে ভক্তি দ্বারা পোষণ করিতেছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে আবার উজ্জ্বলনীলমণি বাহির হইয়া ক্ষীরসমুদ্র হইতে আবির্ভূত ভগবান হরির অঙ্গকান্তিকে যেন ম্লান করিতেছে। সেই অমৃত-সিন্ধুকর্তৃক পরিত্যক্ত অলঙ্কাররত্ন শ্রীহরির উদ্দেশ্যে সমাহরণ করিতে গিয়া আমি এই সাহিত্যসম্বন্ধীয় দর্পণও সঙ্কলন করিব।

'ভক্তিরসামৃতশেষ'-এ সাতটি প্রকাশ আছে। প্রথম প্রকাশে কাব্যস্বরূপ নিরূপণ, দ্বিতীয় প্রকাশে বাক্যস্বরূপাদি নিরূপণ, তৃতীয় প্রকাশে ধ্বনি নির্ণয়, চতুর্থ প্রকাশে

শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার নির্ণয়, পঞ্চম প্রকাশে দোষ নির্ণয়, ষষ্ঠ প্রকাশে রীতি নির্ণয় ও সপ্তম প্রকাশে গুণ নির্ণয় করা হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতশেষে দ্বিতীয় প্রকাশে অভিধামূলক ব্যঞ্জনার উদাহরণ বাক্যে 'যথা শ্রীগোপালচম্পূমনু' বলিয়া গোপালচম্পূ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

বনরুচিরুচিরঃ শ্রীমান্ মদনবিনোদায় নুন্নগোপীকঃ।
অভিতঃ সুরভিতদেশঃ সহচরি পশ্য মাধবঃ স্ফুরতি॥ —পূর্ব চম্পূ

পূর্বগোপালচম্পূ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হওয়ায় ইহা ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দের পরে রচিত হইয়াছিল বোঝা যাইতেছে। শ্রীনিবাসাচার্যকে প্রদত্ত জীবের একটি পত্রে রসামৃত-সিন্ধুর যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা এই ভক্তিরসামৃতশেষ হইবে বলিয়া মনে হয়। 'অপরঞ্চরসামৃতসিন্ধুশ্রীমাধবমহোৎসবোত্তরচম্পূ-হরিনামামৃতানাং শোধনানি কিঞ্চিদ-বশিষ্টানি বর্তন্ত ইতি বর্ষাশ্চেতি সম্প্রতি চ প্রস্থাপিতানি পশ্চাত্তু দৈবানকূল্যেন প্রস্থাপ্যানি'। জীব পিতৃব্য রূপের গ্রন্থ সংশোধন করিতে সাহসী হইবেন মনে হয় না।

মাধবমহোৎসব—গ্রন্থটি নয়টি উল্লাসে বিভক্ত এবং ইহাতে সর্বমোট ১১৫৬টি শ্লোক আছে। শ্রীরাধার অভিষেক বর্ণনাই ইহার বিষয়বস্তু। শ্রীরাধার অভিষেক মধুমাসে পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া অথবা স্বয়ং শ্রীমাধব কর্তৃক সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহা মাধবমহোৎসব আখ্যা লাভ করিয়াছে। অথবা ইহাও কারণ হইতে পারে,—

কিন্তু ত্বং ভবতি যথা তদাভিষেকে
মাতৃণাং গতিকৃত-হ্রীর্ন মে ন তস্যাঃ।
তাসাং স্যান্ মুদপি যথা তথা বিদধ্যা
রাজ্যং নৌ সমমুচিতং যথা তথা চ॥ —৪।৪

অর্থাৎ দেখ, এমনভাবে সকল ব্যবস্থা করিবে, যাহাতে অভিষেক দর্শনে মাতৃবর্গের আগমনে আমার বা তাঁহার লজ্জা না হয়। অথচ তাঁহাদের আনন্দও হয় এবং যাহাতে বনরাজ্যে আমাদের উভয়েরই সমানভাবে সমুচিত অধিকার সূচিত হয়, তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখিবে।

জীব গোস্বামী এই কাব্যে বৃন্দাবনরাজ্যে শ্রীরাধার অভিষেক কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। ইহাতে ঘটনাবিন্যাস অপেক্ষা নায়কনায়িকার মনোভাব বিশ্লেষণ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবর্ণনা মুখ্যস্থান অধিকার করিয়াছে। চন্দ্রাবলীকে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন-রাজ্যের অধিকার দিয়াছেন শুনিয়া রাধা মান করিলেন। পৌর্ণমাসী দেবী রাধাকে বলিলেন যে তিনি ভুল শুনিয়াছেন। চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা যখন চন্দ্রাবলীর জন্য বৃন্দাবনের আধিপত্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে যাঁহার

নামের আদিতে 'চন্দ্র' এই নামাঙ্কিত আছে, যিনি মাধবের সহিত বেদে একসঙ্গে উক্ত হইয়াছেন, তিনিই কৃষ্ণের বনলক্ষ্মী প্রাপ্ত হউন। ইহার দ্বারা রাধাকেই অভিষেক করার ইচ্ছা ব্যক্ত হইয়াছিল, ইহার পর অভিষেকের আয়োজন চলিতে লাগিল। কুঞ্জ সাজানো হইল। দেবীরা অসিলেন, গন্ধর্বকন্যারা গান করিতে লাগিলেন। নানা তীর্থের জল আনা হইল। পরে অভিষেক করিয়া শ্রীরাধাকে রাজসিংহাসনে বসানো হইল। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার সঙ্গে বসিয়া সখীদিগকে বলিলেন, আমার পট্টমহিষীরূপেই তো তোমাদের সখীকে অভিষেক করা হইয়াছে, আমি সিংহাসনে না বসিলে চলিবে কেন? ইহাতে রাধাকে পরকীয়ারূপেই চিত্রিত করা হইয়াছে যদিও পরবর্তীকালে গোপালচম্পূতে জীব রাধাকৃষ্ণের পরিণয়োৎসব বর্ণনা করিয়াছেন।

জীব গ্রন্থশেষে রচনার কাল দিয়াছন,—

সপ্তসপ্তমনৌ শাকে জীবো বৃন্দাবনে বসন্।
স্বমনোরথবন্নব্যং কাব্যমেতদপূরয়ৎ ॥

অর্থাৎ ১৪৭৭ শকাব্দে জীব বৃন্দাবনে অবস্থানপূর্বক নিজ চিত্তবৃত্তির অনুরূপ এই নব কাব্যগ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ করেন। এই গ্রন্থের পূর্বে অন্য কোন গ্রন্থ জীব রচনা করিলেও করিতে পারেন কিন্তু ইহার পূর্বে তারিখযুক্ত অন্য কোন গ্রন্থ পরিদৃষ্ট হয় না।

সংকল্পকল্পবৃক্ষ—'সংকল্পকল্পদ্রুম' নামে শচীনন্দন গোস্বামী কর্তৃক বিমলাটীকা যোগে নবদ্বীপ হইতে প্রকাশিত হয়। জীব গ্রন্থটিকে সংকল্পকল্পদ্রুমই বলিয়াছেন। উপসংহারে আছে,—

ইতিসংকল্পকল্পদ্রুমনাম-কাব্যমামকস্পৃহাধাম
শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপপূরমপি পূরয়ত্তৎ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণচরণার্পিতমেব মম
সর্বমিতি তদিদমপি তথা ভবেদেবম্ ॥

অর্থাৎ যেরূপ আমার সমূহ কিছু শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণে অর্পিত হইয়াছে তদ্রূপ আমার বাঞ্ছানুরূপে কৃত এই সংকল্পকল্পদ্রুম গ্রন্থ যাহা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপগুণলীলাপূর্ণ তাহাও সেই চরণে অর্পিত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণলীলার সমন্বয়, সুসিদ্ধান্ত ও ভাষ্যরূপে গোপালচম্পূ রচনা করিয়া তাহারই অনুক্রমণিকারূপে জীব এই গ্রন্থ লেখেন। ইহাতে (১) শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি অপ্রকটপ্রকাশ গমনান্ত লীলা, (২) শ্রীরাধামাধবের নিত্যলীলা, (৩) সর্বঋতুলীলা ও (৪) ফলনিষ্পত্তি এই চারিটি বিভাগ রহিয়াছে। জীব বলিয়াছেন যে জন্মাদি লীলা এই কল্পবৃক্ষের মূল, নিত্যলীলা স্কন্ধ, ঋতুবর্ণনাত্মক শ্লোকাবলী ইহার শাখা এবং প্রেমময়ী স্থিতিই ফল।

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে জীব শ্রীচৈতন্যের সহিত রূপ, রঘুনাথ, সনাতন ও গোপাল ভট্টের বন্দনা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য সসনাতনরূপক।
গোপাল রঘুনাথাপ্ত ব্রজবল্লভ পাহি মাম্॥

গ্রন্থটি রচনাকালে জীব যে বার্ধক্যে পৌঁছাইয়াছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

বৃন্দারণ্যে জরন্ জীবঃ কশ্চিৎ প্রাহ মনঃ প্রতি।
মিয়তেঽসাম্প্রতং মূঢ় গুহ্যামেতাং সুধাং পিব॥

ইহার ১।২৬৪, ২।১০ শ্লোকে গোপালচম্পূদ্বয় সম্পর্কে ইঙ্গিত থাকায় ইহা গোপালচম্পূ-দ্বয়ের পরে অর্থাৎ ১৫৯২ খৃষ্টাব্দের পরে রচিত হইয়াছিল জানা যায়।

যশ্চম্পূযুগলপ্রান্তমীদৃক্‌সিদ্ধান্তমীরিতং।
জীবান্তর্যামিতং প্রাপ্তস্তূর্ণং পূর্ণমচীকরৎ॥ —১।২৬৪

যদপি মণিময়ং তদেকরূপং
তদপিসদদ্ভুতমধ্যমধ্যভাগং।
যদিবহুবিধমুহিতং সমীহা
স্মর মম মানস গোপচম্পূযুগ্মং॥ —২।১০

ভাবার্থসূচকচম্পূ—জীবশিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারীর প্রদত্ত তালিকা অবলম্বনে নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকরে জীবকৃত গ্রন্থ তালিকা দিতে গিয়া মনে হয় একটি ভ্রান্তি করিয়াছেন। তিনি 'ভাবার্থসূচকচম্পূ অতি চমৎকার' লিখিয়া ভাবার্থসূচকচম্পূ একটি পৃথক গ্রন্থ নির্দেশ করিতে চাহিয়াছেন।

কৃষ্ণদাস অধিকারী লিখিয়াছেন,—

রসামৃতশ্চ শেষশ্চ শ্রীমাধবমহোৎসবঃ।
সংকল্পকল্পবৃক্ষো যশ্চম্পূর্ভাবার্থসূচকঃ॥

নরহরি চক্রবর্তী লিখিতেছেন,—

শ্রীসংকল্পকল্পবৃক্ষ গ্রন্থের প্রচার।
ভাবার্থসূচকচম্পূ অতি চমৎকার॥

'যঃ চম্পূর্ভাবার্থসূচকঃ' বাক্যটির সাহায্যে 'ভাবার্থসূচকচম্পূ' সংকল্পকল্পবৃক্ষের বিশেষণ-রূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে মনে হয়। সংকল্পকল্পবৃক্ষ গ্রন্থটি কি রকম, যাহা চম্পূর ভাবসূচক। পূর্বেই দেখাইয়াছি, সংকল্পকল্পবৃক্ষ গোপালচম্পুর পরে এবং তাহারই অনুক্রমণিকারূপে লিখিত। চম্পূর ভাবসূচক বলিতে এখানে গোপালচম্পূকেই উদ্দেশ্য করিতেছে মনে হয়।

গোপালতাপনীটীকা—অথর্ববেদের অন্তর্গত পিপ্পলাদ শাখার অন্তর্ভুক্ত গোপাল-তাপনী উপনিষদসমূহ উপনিষদের শিরোমণি বলিয়া পরিগণিত। শ্রীচৈতন্যের

অভিপ্রেত বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে সুত্রাকারে সূচিত থাকায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিকট এই উপনিষদ পরমরত্নরূপে বিবেচিত হয়। জীব, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও বলদেব বিদ্যাভূষণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই তিন প্রধান ইহার উপর টীকা করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও বিশ্বেশ্বর ভট্ট ও প্রবোধ যতি (প্রবোধানন্দ সরস্বতী) ইহার দুইটি টীকা করেন। গোপালতাপনী টীকাতে জীব ইঁহাদের কৃত টীকার কথা বলিয়াছেন।

১৩০৬ বঙ্গাব্দে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন জীবকৃত গোপালতাপনীর টীকাকে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত বলিয়া প্রকাশ করেন। পরিশিষ্টে আছে,—

শ্রীসনাতনরূপস্য চরণাব্জসুধেপ্সুনা।
পূরিতা টিপ্পনী চেয়ং জীবেন সুখবোধিনী॥

টীকার নাম সুখবোধিনী ছিল জানা যাইতেছে। এই টীকার মধ্যে জীব শ্রীমদ্ভাগবত, সাম-কেন-কঠাদি উপনিষৎসমূহ, ব্রহ্মসূত্র, গৌতমীয় তন্ত্র প্রভৃতি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধার করিয়া পূর্ব ও উত্তর তাপনীর প্রত্যেক মন্ত্রের বিশদ বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তমত্ব ও তাঁহার রূপগুণাদি মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে।

ব্রহ্মসংহিতার টীকা—ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থটি শততম অধ্যায়ে রচিত ছিল বলিয়া জানা যায়। শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে কেবলমাত্র ইহার পঞ্চম অধ্যায় উদ্ধার ও প্রচার করেন (চৈ. চ. ২৷৯৷২৮১)। জীব ইহার একটি টীকা রচনা করেন। টীকাটির নাম টীকামধ্যে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু অফ্রেক্ত তাঁহার Catalogus Catalogorum গ্রন্থে (Vol. II, p. 42) টীকাটির নাম দিগ্‌দর্শিনী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত পুঁথিতে (পুঁথি নং ৫১৪) 'জীবগোস্বামীকৃত ব্রহ্মসংহিতাটীকা দিগ্‌দর্শিনী' লিখিত আছে। বৃন্দাবনচন্দ্র তর্কালংকার সংক্ষেপভাগবতামৃতের 'রসিকরঙ্গদা' টীকায় ১৷১৪-এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন 'অন্যদিক্‌প্রদর্শিনী নাম্ন্যাং ব্রহ্মসংহিতা টীকায়াং দ্রষ্টব্যম্'। দিক্‌-প্রদর্শিনী ও দিগ্‌দর্শিনী একার্থকই। ইহা হইতে মনে হয় টীকাটির নাম হয়তো দিগ্‌দর্শিনী ছিল।

জীব টীকার মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণরূপমহিমা মম চিত্তে মহীয়তাম্।
যস্য প্রসাদাদ্ব্যাকর্তুমিচ্ছামি ব্রহ্মসংহিতাম্॥
দুর্যোজনাপি যুক্তার্থা সুবিচারাদৃষিস্মৃতিঃ।
বিচারে তু মমাত্র স্যাদৃষীণাং স ঋষির্গতিঃ॥
যদ্যপ্যধ্যায়শতযুগসংহিতা সা তথাপ্যসৌ।
অধ্যায়ঃ সূত্ররূপত্বাত্তস্যাঃ সর্বাঙ্গতাং গতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতাদ্যেষু দৃষ্টং যন্মৃষ্টবুদ্ধিভিঃ।
তদেবাত্র পরামৃষ্টং ততো হৃষ্টং মনো মম॥
যদ্‌যচ্ছ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বিস্তরাদ্বিনিরূপিতম্।
অত্র তৎ পুনরামৃশ্য ব্যাখ্যাতুং স্পৃশ্যতে ময়া॥

অর্থাৎ যাঁহার কৃপাবলে আমি এই ব্রহ্মসংহিতার ব্যাখ্যা লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছি, সেই শ্রীকৃষ্ণরূপের মহিমা আমার অন্তরে সর্বদা পূজিত হউক। ঋষিগণের রচিত স্মৃতিগ্রন্থ সুবিচারপূর্ণ, আপাতদৃষ্টিতে দুর্যোজনাযুক্ত মনে হইলেও যুক্তার্থসমন্বিত। অতএব সেই ঋষিগণের গ্রন্থবিচারে ঋষিগণেরও পরমপূজ্য রূপই আমার একমাত্র গতি। যদিও এই সংহিতা গ্রন্থটি একশত অধ্যায়যুক্ত, তথাপি এই পঞ্চম অধ্যায়ই সূত্ররূপে সমগ্র সংহিতার সম্পূর্ণতা বিধান করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে বিদ্বজ্জন যে সমস্ত সিদ্ধান্ত অবগত হন, এই গ্রন্থেও সেই সকল বিষয় দর্শন করিয়া আমার চিত্তে পরমানন্দের সঞ্চার হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে যাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে এখানে তাহার পুনরালোচনা করিয়া আমি ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেছি।

ব্রহ্মসংহিতা টীকার একস্থানে আছে 'অত্র বিশেষ জিজ্ঞাসায়াং কৃষ্ণার্চনদীপিকা দ্রষ্টব্যা'। ইহা হইতে ব্রহ্মসংহিতার টীকা কৃষ্ণার্চনদীপিকার পর রচিত হইয়াছিল বোঝা যাইতেছে। পূর্বেই দেখাইয়াছি কৃষ্ণার্চনদীপিকা পূর্ব গোপালচম্পূর পরে রচিত। সুতরাং ব্রহ্মসংহিতার টীকাও পূর্ব গোপালচম্পূর পরে অর্থাৎ ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দের পরে রচিত হইয়াছিল সিদ্ধান্ত করা যায়।

দুর্গমসঙ্গমনী—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু টীকার নাম দুর্গমসঙ্গমনী। এই নামকরণের তাৎপর্য জীব উপসংহারে দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণঃ সর্বপূর্ণঃ স চরতি বিপুলে গোকুলে ব্যক্ততত্ত-
ন্মাধুর্যৈশ্বর্যবর্যঃ স চ পশুপসুতানন্তলক্ষ্মীভিরিষ্টঃ।
শ্রীরাধাবর্গমধ্যে স চ মধুরগুণ-শ্রীধুরাধামধারী-
ত্যস্মিন্ গ্রন্থে রসাব্ধাবভিমতমহিমাধারসারপ্রচারঃ॥
যদপি চ নাতিবিশুদ্ধা তদপি চ সদ্ভিঃ কদাহপ্যুরীকার্যা
দুর্গমসঙ্গমনীয়ং নৌকেবাস্যামৃতাম্ভোধেঃ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই পরিপূর্ণ তত্ত্ব। তিনি বিপুলধাম গোকুলে ব্যক্তভাবে মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের শ্রেষ্ঠ পাত্র হইয়াও নন্দযশোদার পুত্ররূপে এবং ব্রজযুবতীদের দয়িতরূপে সর্বদা বিলাস করিতেছেন। তিনি শ্রীরাধা ও তাঁহার সখীদের মধ্যে লীলাবিগ্রহরূপে বিরাজ করেন। এইরূপ ইষ্টদেবমহিমা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমার এই টীকা বিশুদ্ধ না হইলেও সাধজন অবশ্যই ইহার অনুশীলন করিবেন।

কারণ এই টীকা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পার হওয়ার নৌকাস্বরূপ। সম্ভবতঃ দুর্গম-সঙ্গমনীই জীবের জীবনের শেষ কীর্তি। টীকার একস্থানে আছে, 'বিশেষ জিজ্ঞাসা চেৎ বৈষ্ণবতোষণী কৃষ্ণসন্দর্ভগোপালচম্পূদ্বয়-লোচনরোচনীনামোজ্জ্বলমণিটীকাঃ দ্রষ্টব্যাঃ (৩৷৪৷৭৭-৭৯, হরিদাস দাস সং)। গোপালচম্পূ ও লোচনরোচনীর পরে যে ইহা লিখিত হইয়াছিল তাহা সুস্পষ্ট বোঝা যাইতেছে। তাহা হইলে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে গোপালচম্পূ রচনার পর জীব সংকল্পকল্পদ্রুম, ব্রহ্মসংহিতার টীকা, কৃষ্ণার্চনদীপিকা, ভক্তিরসামৃতশেষ, লোচনরোচনী টীকা ও দুর্গমসঙ্গমনী টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত গ্রন্থের কোনটিতে রচনাকাল নাই। ফলে সর্বশেষ কোন গ্রন্থটি রচিত হইয়াছিল তাহা বলা দুরূহ। তবে রচনার বিষয়গুরুত্ব হইতে মনে হয় দুর্গমসঙ্গমনীই শেষ রচনা।

লোচনরোচনী—উজ্জ্বলনীলমণি টীকার নাম লোচনরোচনী। জীব টীকার মঙ্গলাচরণে এই নাম ব্যক্ত করিয়াছেন।

> সনাতনসমো যস্য জ্যায়ান্ শ্রীমান্ সনাতনঃ।
> শ্রীবল্লভোঽনুজঃ সোঽসৌ শ্রীরূপো জীবসদ্গতিঃ॥
> হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ জাতে পুরা দুরালোকে।
> উজ্জ্বলনীলমণৌ মম লোচনরোচন্যসৌ বিবৃতিঃ॥

অর্থাৎ পুরাকালে হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু যখন সুধী ব্যক্তি কর্তৃক সমাদরে আলোচিত হইতেছিল না, তখন উজ্জ্বলনীলমণির এই লোচনরোচনী নামে টীকা লিখিত হইয়াছিল।

এই টীকা যে গোপালচম্পূর পরে লিখিত তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ লোচন-রোচনীতে গোপালচম্পূ নাম উদ্ধৃত হইয়াছে,—'প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপীত্যত্র যুক্তিশ্চ শ্রীগোপালচম্পাং'।

যোগসারস্তব টীকা—যোগসারস্তব পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের ১২৭ অধ্যায়ের অংশবিশেষ। দেবদ্যুতি মুনির মুখনিঃসৃত এই স্তোত্র শুনিয়া শ্রীহরি তাঁহাকে দেখা দেন ও বিশুদ্ধাভক্তি দান করেন। জীব এই স্তোত্রের কঠিন অংশেরই টীকা করিয়াছেন। দুর্বোধ্য ও দার্শনিক শব্দগুলির সহজ ও সুবোধ্য অর্থ করিয়া স্তবটির সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছেন। এই জন্যই বোধ হয় ভক্তিরত্নাকরে উক্ত হইয়াছে —'যোগসারস্তবের টীকাতে সুসঙ্গতি'।

গায়ত্রীব্যাখ্যা-বিবৃতি—অগ্নিপুরাণের ২১৬শ অধ্যায়ের সতেরটি শ্লোক ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার প্রথম শ্লোকের বিবৃতিতে জীব উক্থ, ভগ, প্রাণ, গায়ত্রী, সরস্বতী প্রভৃতি শব্দের নিরুক্তি দিয়াছেন। ইহাতে গায়ত্রীর প্রতি পদের অর্থ সহজভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহার মঙ্গলাচরণে দুর্গমসঙ্গমনী ও লোচনরোচনীর

অনুরূপ 'সনাতনসমো যস্য জ্যায়ান্' প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে মনে হয় উক্ত টীকা দুইটি রচনাকালে ইহা রচিত হইয়াছিল।

পদ্মপুরাণোক্ত কৃষ্ণপদচিহ্ন এবং শ্রীরাধিকার করপদচিহ্ন—বহুস্থান অন্বেষণ করা হইয়াছে কিন্তু অদ্যাবধি ইহার কোন পুঁথি বা পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

গোপালচম্পূ—কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

গোপালচম্পূ নামে গ্রন্থ মহাশূর।
নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরসপুর ॥—২।১।৩৯

গোপালচম্পূ জীবের জীবনের মহতী কীর্তি। ভাগবতের দশমস্কন্ধের কৃষ্ণলীলা বর্ণনাই ইহার মুখ্য বিষয়বস্তু। পূর্ব ও উত্তর এই দুই খণ্ডে ইহা বিভক্ত। পূর্ব খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা এবং উত্তর খণ্ডে মথুরা ও দ্বারকালীলা বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব চম্পূতে তেত্রিশটি পূরণ এবং উত্তর চম্পূতে সাঁইত্রিশটি পূরণ রহিয়াছে। পূর্ব-চম্পূতে গ্রন্থরচনার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া জীব বলিয়াছেন,—

যন্ময়া কৃষ্ণসন্দর্ভে সিদ্ধান্তামৃতমাচিতম্।
তদেব রস্যতে কাব্যকৃতিপ্রস্তারসত্তয়া ॥
সোঽহং কাব্যস্য লক্ষ্যেণ মনো নির্মামি তাদৃশম্।
তন্মহান্তো মদীক্ষেরং স্তদা হেম্নি চিতো মণিঃ ॥
পূর্বোত্তরতয়া চম্পূদ্বয়ী সেয়ং ত্রয়ী ত্রয়ী।
পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থতুল্য যথেচ্ছং সদ্ভিরীক্ষ্যতাম্ ॥
শ্রীগোপালগণানাং গোপালানাং প্রমোদায়।
ভবতু সমন্তাদেষা নাম্না গোপালচম্পূর্যা ॥
যদ্যপি চিরমন্তর্ধা জাতা শ্রীগোকুলস্থানাম্।
তদপি মহাত্মসু তেষাং ব্যূহসমূহঃ স্ফুরন্ জয়তি ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণসন্দর্ভে যে সিদ্ধান্তামৃত সঞ্চয় করিয়াছি, এই গ্রন্থে সেই কৃষ্ণতত্ত্বই পুনরায় কাব্যাকারে বর্ণিত হইবে। কাব্যরচনাচ্ছলে মনকে আস্বাদনযোগ্য রসনার ন্যায় নির্মাণ করিতেছি। যদি এই গ্রন্থ সুধীজন দেখেন, তাহা হইলে যথার্থই মণিখচিত হইল। পূর্ব ও উত্তর এই দুই বিভাগ আবার তিন অংশে বিভক্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থের তুল্য হইয়াছে। পণ্ডিতগণ যথেচ্ছা এই গ্রন্থ পাঠ করুন। কৃষ্ণের গণ ও গোপগণের সম্যক আনন্দের জন্য এই গোপালচম্পূ গ্রন্থ। যদিও গোকুলের গোপগণসহ শ্রীকৃষ্ণ বহুপূর্বে অন্তর্হিত তথাপি মহাজনদের সম্মুখে নিত্যকালই প্রকটিত থাকিয়া জয়যুক্ত হউন।

পূর্বচম্পুর তেত্রিশটী পূরণে নিম্নলিখিত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে,—

(১) গোলোকরূপ নিরূপণ, (২) গোলোকবিলাসবিকাসন, (৩) কৃষ্ণজন্ম,

(৪) কৃষ্ণজন্মোৎসব, (৫) পূতনাবধ, (৬) শকটভঞ্জন, (৭) তৃণাবর্তবধ ও মৃভক্ষণ, (৮) যশোদা কর্তৃক দামবন্ধন ও যমলার্জ্জুনমোচন, (৯) গোপগণের সহিত কৃষ্ণ ও বলরামের বৃন্দাবনে প্রবেশ, (১০) বৎসাসুরবধ, (১১) অঘাসুর বধ, (১২) সখাদের সহিত গোচারণ, (১৩) কালিয়দমন এবং দাবানল নির্বাপণ, (১৪) গর্দভাসুর বধ, (১৫) রাধাকৃষ্ণের প্রণয়, (১৬) প্রলম্বাসুরবধ, (১৭) বংশীশিক্ষাচ্ছলে কৃষ্ণের প্রেয়সী ভিক্ষা, (১৮) ইন্দ্রযজ্ঞভঙ্গ ও গিরিগোবর্ধন পূজা, (১৯) ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব স্তম্ভন, (২০) নন্দমহারাজের বরুণলোকে যাত্রা ও গোলোকদর্শন, (২১) গোপীগণের বস্ত্রহরণ, (২২) যজ্ঞপত্নীগণের নিকট কৃষ্ণের অন্ন ভিক্ষা, (২৩) রাসলীলারম্ভ, (২৪) রাসলীলা হইতে কৃষ্ণের অন্তর্ধান, (২৫) গোপীদের বিরহ ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি, (২৬) রাসবিলাসের বিস্তার, (২৭) জলকেলি ও বনভ্রমণ, (২৮) কৃষ্ণের অম্বিকাবনে গমন ও বিদ্যাধর শাপমোচন, (২৯) কৃষ্ণের নির্জনে কৌতুককেলি বর্ণন, (৩০) শঙ্খচূড়বধ, (৩১) বৃষাসুরবধ, (৩২) কেশিদৈত্যবধ, (৩৩) ভক্তগণের সর্ব-মনোরথ-পূরণ।

প্রথম হইতে ত্রয়োদশ পূরণ পর্যন্ত বিলাসকে কৃষ্ণের বাল্যবিলাস এবং চতুর্দশ হইতে তেত্রিশ পূরণ পর্যন্ত বিলাসকে কৈশোর বিলাস বলা চলে।

১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে পূর্বচম্পূর রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল জানা যাইতেছে,—

সম্বৎপঞ্চকবেদষোড়শযুতং শাকং দশেন্বেক ভাগ্-
জাতং যর্হি তদাখিলং বিলিখিতা গোপালচম্পূরিয়ম্ ॥

অর্থাৎ ১৬৪৫ সম্বৎ বা ১৫১০ শকে (১৫৮৮ খৃষ্টাব্দ) এই গোপালচম্পূ লিখিত হইয়াছে।

জীব উত্তরচম্পূর মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য সসনাতনরূপক।
গোপাল রঘুনাথাপ্ত ব্রজবল্লভ পাহি মাম্ ॥
সম্পূর্ণাসীদাশু গোপালচম্পূ-
রেষাং যস্মাদাশয়াদেব পূর্বা।
এষা তস্মাদুত্তরাপ্যুত্তরা স্যাৎ
এবং তং কমন্যং ভজেম ॥

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, হে চৈতন্য, হে রূপসনাতন, গোপাল, রঘুনাথ, হে বল্লভ। আপনারা সকলে ব্রজে আমাকে চিরকাল পালন করুন।

যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া গোপালচম্পূর পূর্বচম্পূ শীঘ্র সম্পূর্ণ হইয়াছে, এই প্রারব্ধ উত্তরচম্পূ রচনাও যাঁহার কৃপাবলে সমাপ্ত হইবে, সেই আমার অভীষ্টদেব ভিন্ন আর কাহার ভজনা করিব ?

উত্তরচম্পুর সাঁইত্রিশটি পুরণে নিম্নলিখিত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে,—

(১) ব্রজবাসীদিগের অনুরাগ বিস্তার, (২) অক্রূরের আগমন ও গোপীদিগের বিলাপ, (৩) রামকৃষ্ণের মথুরাযাত্রা, (৪) রামকৃষ্ণের মথুরাপ্রবেশ, (৫) কংসবধ, (৬) ব্রজের অভিমুখে নন্দ মহারাজের যাত্রা, (৭) নন্দ মহারাজের ব্রজপ্রবেশ, (৮) রামকৃষ্ণের বিদ্যাধ্যয়ন, (৯) রামকৃষ্ণের যমালয় হইতে গুরুপুত্র আনয়ন, (১০) উদ্ধবের ব্রজে আগমন, (১১) দূতভ্রমে ভ্রমরের উদ্দেশ্যে রাধিকার উক্তি, (১২) উদ্ধবের নিকট কৃষ্ণের ব্রজের বার্তা শ্রবণ, (১৩) জরাসন্ধবন্ধন, (১৪) জরাসন্ধবিজয়, (১৫) বলরামের বিবাহ, (১৬) কৃষ্ণের রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ, (১৭) সত্যভামাদি সপ্ত কন্যার বিবাহ, (১৮) কৃষ্ণের নরক বধ, পারিজাতহরণ ও ষোড়শ সহস্র কন্যা বিবাহ, (১৯) কৃষ্ণের মহাদেববিজয় ও বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ, (২০) বলরামের ব্রজে যাত্রা, (২১) পৌণ্ড্রকাদির সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধের কথা শুনিয়া বলরামের পুনরায় দ্বারকায় আগমন, (২২) বলরাম কর্তৃক দ্বিবিদ দানববধ, (২৩) নন্দ মহারাজসহ ব্রজবাসীদের কুরুক্ষেত্রে যাত্রা, (২৪) কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ব্রজবাসিগণের বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন, (২৫) উদ্ধবের মন্ত্রণা, (২৬) জরাসন্ধ কর্তৃক বন্দী রাজাদের মুক্তি, (২৭) রাজসূয় যজ্ঞ ও শিশুপাল বধ, (২৮) সাল্ববধ, (২৯) ভাবীকথার প্রমাণবিস্তার, (৩০) দন্তবক্রবধ ও কৃষ্ণের পুনরায় ব্রজে আগমন, (৩১) পৌর্ণমাসী প্রভৃতি কর্তৃক রাধিকাদি গোপীবৃন্দের বাধাসমাধান, (৩২) বাধাসমাধানের পর বিবাহারম্ভ, (৩৩) রাধামাধবের অধিবাস মহোৎসব, (৩৪) রাধামাধবের নানাবিধ অলংকার পরিধান, (৩৫) রাধামাধবের শুভবিবাহ, (৩৬) দিব্যমঙ্গলানুষ্ঠান, (৩৭) কৃষ্ণের সর্বসুখপূর্ণ গোলোকপ্রবেশ।

১৫৯২ খৃষ্টাব্দে উত্তরচম্পুর রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল জানা যায়,—

পবনকলামিতি সম্বদ্বিন্দন্ বৃন্দাবনান্তঃস্থঃ।
জীবঃ কশ্চন চম্পূং সম্পূর্ণাঙ্গীচকার বৈশাখে ॥

১৬৪৯ সম্বতে (১৫৯২ খৃষ্টাব্দ) বৈশাখ মাসে বৃন্দাবনে অবস্থানকারী 'জীব' নামক কোন ব্যক্তি এই চম্পূ সমাপ্ত করিয়াছেন।

গদ্য ও পদ্যাত্মক এই বিশাল গ্রন্থটিকে মহাকাব্য আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রচলিত কৃষ্ণের যাবতীয় লীলাই এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। কেবলমাত্র ভাগবতে উল্লিখিত কাহিনী বর্ণনার জন্যই নহে, সিদ্ধান্তগ্রন্থ হিসাবেও ইহা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চির আদৃত। পাণ্ডিত্য, দার্শনিকতা, কবিত্ব ও রচনাচাতুর্যে এই গ্রন্থ জীবের অসাধারণ মনীষার স্বাক্ষর বহন করিতেছে। যদিও ইহা কাব্য, তথাপি ইহাতে জীবের স্বীয় দর্শন ও তত্ত্বকথাই প্রধানতঃ প্রকাশ পাইয়াছে।

অফ্রেতের Catalogus Catalogorum গ্রন্থে (Vol. I, p. 208 and

Vol. II, p. 32) ব্রজরাজের পুত্র জীবরাজ নামক এক ব্যক্তির 'গোপালচম্পূ' নামক গ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Notices of Skt. Mss. গ্রন্থে (Vol. I, p. 41-42) জীবরাজকৃত গোপালচম্পূর বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রন্থকার জীবগোস্বামী হইতে পৃথক ব্যক্তি। ইঁহার নাম জীবরাজ দীক্ষিত। ইনি মহারাষ্ট্রের অধিবাসী।

নিত্যানন্দ বংশ মাড়োগ্রামনিবাসী বীরচন্দ্র গোস্বামী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জীবকৃত গোপালচম্পূর 'শব্দার্থবোধিকা' নামে একটি টীকা করেন বলিয়া জানা যায়।

ষট্সন্দর্ভ—রূপসনাতনের আদেশে জীব সম্বন্ধতত্ত্ব, অভিধেয়তত্ত্ব ও প্রয়োজনতত্ত্ব বিনিরূপণের জন্য ভাগবতসন্দর্ভ রচনা করেন। এই ভাগবতের অন্তর্গত পৃথক্ পৃথক্ নামে ছয়টি সন্দর্ভ রহিয়াছে। তাই ইহার নামান্তর ষট্সন্দর্ভ। ষট্সন্দর্ভ যথাক্রমে তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম, কৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতি। তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও কৃষ্ণসন্দর্ভে সম্বন্ধজ্ঞানতত্ত্ব, ভক্তিসন্দর্ভে অভিধেয়তত্ত্ব ও প্রীতিসন্দর্ভে প্রয়োজনতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

জীবের সমগ্র জীবনের মহতী কীর্তি এই ষট্সন্দর্ভ রচনা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার মূলে জীবের সমগ্র জীবনের যে দীর্ঘ সাধনা তাহা ইহাতে নিহিত রহিয়াছে। জীব এই গ্রন্থ রচনার সমূহ খ্যাতির অধিকারী হইলেও মূলে কোনও এক দাক্ষিণাত্য ভট্টের অবদান রহিয়াছে। তিনি সম্ভবতঃ রূপসনাতনের জন্য একটি কারিকাগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচনাতে ক্রমপারম্পর্যাদি না থাকায় জীব ইহাকে আমূল সংশোধন করেন। এই দাক্ষিণাত্য ভট্টের মূল রচনা কোনটি এবং জীবেরই বা সংযোজন কোনটি তাহা বলা সম্ভব নহে। গ্রন্থের উৎপত্তির কারণ নির্দেশ করিয়া জীব গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন,—

জয়তাং মথুরাভূমৌ শ্রীলরূপসনাতনৌ।
যৌ বিলেখয়তস্তত্ত্বং জ্ঞাপকৌ পুস্তিকামিমাম্ ॥
কোঽপি তদ্বান্ধবো ভট্টো দক্ষিণদ্বিজবংশজঃ।
বিবিচ্য ব্যলিখদ্ গ্রন্থং লিখিতাদ্ বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ ॥
তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্তব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতম্।
পর্যালোচ্যাথ পর্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ ॥

অর্থাৎ যাঁহারা ভগবানের তত্ত্ব জানাইবার জন্য আমাকে এই পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছেন, সেই মথুরানিবাসী রূপসনাতনের জয় হউক। বৃদ্ধ বৈষ্ণবাদি রচিত গ্রন্থের সার সংকলন করিয়া তাঁহাদের বান্ধব কোনও দাক্ষিণাত্য ভট্ট একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থখানি কোথাও ক্রমভঙ্গভাবে, কোথাও বা ক্রমপর্যায়ে এবং কোন কোন স্থানে খণ্ডিতভাবে লিখিত ছিল। সেই গ্রন্থ পর্যালোচনা করিয়া ক্ষুদ্র জীব ক্রমানুসারে ইহা লিখিতেছি।

এই দাক্ষিণাত্য ভট্ট কে ছিলেন বলা কঠিন। বলদেব বিদ্যাভূষণের মতে এই দাক্ষিণাত্য ভট্ট ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্ট, ইহা সম্ভবপর ধারণা।

ভাগবতসন্দর্ভের প্রধান উপজীব্য শ্রীমদ্ভাগবত। পূর্বসূরিগণের ঋণ স্বীকার করিলেও এবং শ্রীমদ্ভাগবত জীবের প্রধান অবলম্বন হইলেও জীবগোস্বামীর মৌলিক চিন্তায় ইহা সমুজ্জ্বল। সন্দর্ভগুলির বিস্তৃত আলোচনা একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থেরই অপেক্ষা রাখে। বর্তমান প্রসঙ্গে ইহার সেরূপ আবশ্যকতা না বিধায় প্রতিটি সন্দর্ভের প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলি অতি সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

তত্ত্বসন্দর্ভ—ইহাই প্রথম সন্দর্ভ। প্রমাণ বিষয়ে ইহাতে প্রধানতঃ আলোচনা করা হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দু দর্শনগুলিতে স্বীকৃত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অভাব বা অনুপলব্ধি, সম্ভব ও ঐতিহ্য প্রভৃতি প্রমাণসমূহের মধ্যে জীব শব্দপ্রমাণকেই একমাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, অন্যান্য প্রমাণগুলি নিম্ন-বিধ দোষে দুষ্ট,—

(১) ভ্রম—এক দ্রব্যকে অপর দ্রব্য জ্ঞান।
(২) প্রমাদ—অনবধানতাজনিত ভ্রান্তি।
(৩) বিপ্রলিপ্সা—প্রতারণার ইচ্ছার্থ ভ্রান্তি।
(৪) করণাপাটব—ইন্দ্রিয়ের অপটুত্বনিমিত্ত ভ্রান্তি।

জীব যে শব্দ ব্যতিরেকে অন্যান্য প্রমাণগুলিকে অস্বীকার করিয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার মতে অপর প্রমাণগুলির স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না, কেবল শব্দের সহায়ক হিসাবে ইহাদের উপযোগিতা মানিয়া লওয়া যায়। কিন্তু শব্দপ্রমাণ প্রমাণান্তরনিরপেক্ষ।

ভগবৎসন্দর্ভ—ইহাতে ব্রহ্ম ও ভগবানের স্বরূপ বিচার করা হইয়াছে। শ্রীমদ্-ভাগবতের

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্ত্বং যজ্‌জ্ঞানদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে॥ —১।২।১১.

এই শ্লোক অনুসারে একই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্ম ও ভগবান এই ত্রিবিধরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে জীব ভগবানের শক্তি ও গুণসমূহের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। এই গুণ ও শক্তি ভগবানে আরোপিত নহে, তাঁহার স্বরূপভূত। ভগবানের সহিত ইহাদের কেবল যে সংযোগ সম্বন্ধ আছে তাহা নহে, সমবায় সম্বন্ধও বর্তমান। ভগবৎ শব্দের নিরুক্তি প্রসঙ্গে পুরাণের প্রমাণানুযায়ী 'ভ' ভর্তৃ বা সম্ভর্তৃ ও 'গ' গময়িতৃ বা নেতৃ বলা হইয়াছে। আর 'ভগ' শব্দের অর্থ করা হইয়াছে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রভৃতি গুণের সমাবেশ। এই সন্দর্ভে দেখানো হইয়াছে যে ভগবানের ত্রিবিধ শক্তি (১) স্বরূপ শক্তি বা পরা শক্তি,

(২) তটস্থা শক্তি বা জীব শক্তি ও (৩) বহিরঙ্গা শক্তি বা মায়া শক্তি। শক্তিমানের সহিত শক্তির সম্বন্ধ বিচিত্র। এই সম্বন্ধের ভেদও দুর্জ্ঞেয়, অভেদও দুর্জ্ঞেয়। সুতরাং ইহা অচিন্ত্য। এই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের মূল মেরুদণ্ড।

পরমাত্মসন্দর্ভ—ইহাতে পরমাত্মার সঙ্গে জীব ও প্রকৃতির সম্বন্ধ আলোচনা করা হইয়াছে। সমূহ জীবকে ভগবদুন্মুখ ও ভগবৎ-পরাঙ্মুখ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। জীব ও পরমাত্মার একত্ব সম্পর্কে জীবগোস্বামী আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে জীব পরমাত্মার অংশ হইলেও 'প্রতিক্ষেত্রং ভিন্নঃ'। জীবের বহুত্ব থাকিলেও সকল জীবই 'একরূপভাক্' বলা যাইতে পারে। জীব কেবল কর্মফলহেতুই বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়। মায়া শক্তিকে বহিরঙ্গা শক্তি বলা হইয়াছে। এই মায়া শঙ্করের বেদান্তমতের মায়া হইতে ভিন্ন। শঙ্করের মতে, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। ইহা সত্য নহে, মায়ামাত্র। জীব গোস্বামীর মতে, জগৎ ভগবানের উপাদান মায়ার পরিণাম, ইহার অস্তিত্ব সত্য।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—সম্বন্ধজ্ঞানতত্ত্ব আলোচনার ইহাই শেষ সন্দর্ভ। এই সন্দর্ভ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের সর্বাপেক্ষা প্রধান গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হইয়া থাকে। পূর্ববর্তী সন্দর্ভগুলিকে ইহার ভূমিকা স্বরূপ বলা যায়। ইহাতে জীব দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, পূর্ববর্তী সন্দর্ভগুলিতে যে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, সেই তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণ। 'এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকানুসারে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, কৃষ্ণ অবতার নহেন, তিনি অবতারী। নানা যুক্তি ও প্রমাণ সাহায্যে জীব ইহাও প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, চতুঃসন, বরাহ, কপিল, দত্তাত্রেয়, মৎস্য, কূর্ম, বামন, পরশুরাম, রাম প্রভৃতি দ্বাবিংশ অবতার এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এক কৃষ্ণের প্রকাশ। ভগবান কৃষ্ণের সর্বপ্রকাশ ঐশীশক্তি বর্তমান, এই স্বরূপ শক্তিসমূহের মধ্যে হ্লাদিনী শক্তিই প্রধান।

কৃষ্ণের ব্যূহ, পরিকর, ধাম প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনান্তে কৃষ্ণের সহিত গোপীগণের সম্বন্ধ বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। জীব বলিয়াছেন, গোপীগণ কৃষ্ণবধূ, কৃষ্ণের স্বকীয়া সুতরাং পরকীয়াবাদ সত্য নহে। জীবের মতে, গোপীরা বিবাহিত হইলেও গোপীদের সঙ্গে তাহাদের যৌনসম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। কারণ কৃষ্ণ মায়াশক্তির সাহায্যে গোপদের নিকট মায়াগোপবধূ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। গোপীরা নহে, তাহাদের পরিবর্তে তদনুকারী মায়িকরূপ গোপদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। গোপবধূরা পরস্ত্রী নহে, কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি। সুতরাং নিজশক্তির সঙ্গে বিহার কখনো দূষণীয় হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে জীবের মতে, গোপীগণ কৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী। তাহারা কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিরই প্রকাশ বলিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে

তাহাদের নিত্যলীলা অনুষ্ঠিত হয়। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির প্রকাশ গোপীগণ। কৃষ্ণের প্রতি তাহাদের ভাবের তারতম্যানুসারে এবং তাহাদের নিকট কৃষ্ণের আত্ম-প্রকাশের বিভিন্নতানুযায়ী গোপীগণের নানারূপ শ্রেণীবিভাগ বর্তমান। রাধা মহাভাবের অধিকারিণী বলিয়া কৃষ্ণের প্রিয়তমা। কৃষ্ণ ইঁহার নিকট পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। ভাগবতে রাধা শব্দের উল্লেখ না থাকিলেও ঐ গ্রন্থের আদি শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জীব বলিয়াছেন যে, 'তদ্ ধীমহি'—ইহাতে তৎ শব্দের দ্বারা রাধা ও কৃষ্ণের শক্তি ও শক্তিমান্ সম্বন্ধই সূচিত হইতেছে।

ভক্তিসন্দর্ভ—ইহাতে ভক্তির লক্ষণ ও শ্রেণীবিভাগ এবং ভক্তিবাদের প্রাধান্য আলোচিত হইয়াছে। জীব গোস্বামীর মতে ভগবানের প্রতি প্রবণতার দিক হইতে লক্ষ্য করিলে জীব দুই প্রকার। এক প্রকার জীবের শিক্ষা বা উপদেশ ব্যতিরেকেই অন্তরে নিজ হইতে ভগবদ্ভক্তি জাগ্রত হয়, আর এক প্রকার জীবের মায়াবশতঃ ভগবানের প্রতি বিমুখতা লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় প্রকার জীবের মধ্যে 'ভগবৎ-সান্মুখ্যে'র জন্যই ভক্তির আবশ্যক। জ্ঞানকর্মাদি ভক্তির সচিবত্ব হেতু ভক্তিদ্বারাই ভগবান্ ভজনীয়। ভগবানের আনন্দোৎপাদন ভিন্ন অন্য কোনরূপ উদ্দেশ্য না থাকায় ভগবদ্ভক্তি অহৈতুকী বা অকিঞ্চনা (যাহা কোনও হেতু বা বাসনাহীন) এবং অপ্রতিহতা (যাহা সুখদুঃখের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না)। জ্ঞান এবং যোগ অপেক্ষা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মাকে জ্ঞানের পথে জানিতে পারা যায় সত্য কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষ নহে। আবার যোগসাহায্যে বিশ্বরূপের উপলব্ধি ঘটিতে পারে সত্য কিন্তু উপলব্ধিও মোক্ষ নহে। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর প্রাপ্তিই মোক্ষ, আর ইহা কেবল একমাত্র ভক্তি দ্বারাই পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গ সাহায্যে ভগবানের অংশমাত্র অধিগম্য হইলেও মূলতঃ ঈশ্বরের পূর্ণদর্শন ও সান্নিধ্য-লাভ ভক্তি দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে। কর্মমার্গের সহিত ভক্তিমার্গের সামঞ্জস্য বিধানে জীব প্রধানতঃ গীতাকেই অনুসরণ করিয়াছেন। ভক্তিযোগ না হওয়া পর্যন্তই কর্মমার্গের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে। অন্যান্য মার্গের সহিত ভক্তির সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া জীব বলিয়াছেন যে, জ্ঞান, যোগ, কর্ম, বৈরাগ্য প্রভৃতি সবই উৎকর্ষের জন্য 'তৎসাপেক্ষ' অর্থাৎ ভক্তির উপর নির্ভরশীল, কিন্তু ভক্তি স্বতন্ত্র। এই ভক্তি আবার জ্ঞানমিশ্রা, যোগমিশ্রা, কর্মমিশ্রা, ও শুদ্ধা হইতে পারে। তন্মধ্যে শুদ্ধা ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠস্থান দেওয়া হইয়াছে।

ভগবৎ কৃপাকেই ভক্তিলাভের প্রথম সোপান বলা যাইতে পারে। আর এই কৃপালাভ করিতে হইলে সৎসঙ্গের প্রয়োজন। এই সৎসঙ্গ হইতেই উপাস্য ও উপাসনার প্রতি রুচি জন্মে এবং তাহা হইতে অন্তরে শ্রদ্ধার উন্মেষ হয়। ভক্তির প্রাথমিক অবস্থা এই শ্রদ্ধা। ইহা হইতেই গুরুকরণের উৎপত্তি। এই গুরু তিন প্রকার—

(১) শ্রবণগুরু, (২) শিক্ষাগুরু ও (৩) মন্ত্রগুরু। যাঁহার নিকট হইতে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শ্রুত হয়, তিনি শ্রবণগুরু। যিনি চিত্তকে ভক্তির জন্য প্রস্তুত করেন তিনি শিক্ষাগুরু এবং যাঁহার নিকট হইতে গূঢ় মন্ত্রলাভ করা যায় তিনি মন্ত্রগুরু। শ্রবণ ও দীক্ষাগুরু অনেক হইতে পারে কিন্তু মন্ত্রগুরু একজনই। তাঁহার কৃপাতেই ভগবদাবির্ভাববিশেষে এবং ভজনবিশেষে রুচি হয়।

ভক্তি শব্দের ব্যুৎপত্তি 'ভজ্' ধাতু হইতে, ভজ্ ধাতুর অর্থ সেবা। উৎপত্তি ও প্রকার অনুসারে ভক্তি তিন প্রকার।

(১) আরোপসিদ্ধা—নিজের ভক্তিত্বাভাবেও ভগবদর্পণাদিদ্বারা ভক্তিত্বপ্রাপ্তি।

(২) সঙ্গসিদ্ধা—সৎসঙ্গজনিত ভক্তি।

(৩) স্বরূপসিদ্ধা—ইহা ভক্তের স্বভাবসিদ্ধ, তাহার অজ্ঞাতসারেও অন্তরে ইহার আবির্ভাব হইতে পারে। এই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি অন্য কোন উদ্দেশ্যযুক্ত হইয়া জ্ঞানমিশ্রা বা কর্ম্মমিশ্রা হইলে সকৈতবা হয়। আর ভগবৎপ্রীতি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিলে অকৈতবা হয়।

অকৈতবার দুইটি শাখা—(১) বৈধী ও (২) রাগানুগা। শাস্ত্রোক্ত বিধিদ্বারা যাহা প্রবর্তিত হয়, তাহা বৈধী। এই বৈধীভক্তির আবার এই স্তরগুলি রহিয়াছে—শরণাপত্তি, গুরুসেবা, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবা, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। রাগ ('বিষয়িণঃ স্বাভাবিকো বিষয়সংসর্গেচ্ছাতিশয়ঃ প্রেমা রাগঃ') বা সহজ চিত্তবৃত্তির অনুগমন করে বলিয়া ইহার নাম রাগানুগা। ইহাতে শাস্ত্রবিধির কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। রাগানুগা ভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তিকেই অনুসরণ করে। যাহাতে চিত্তের অনুরাগ ভিন্ন আর কিছু নাই, তাহাই রাগাত্মিকা। কৃষ্ণের প্রতি ব্রজ-যুবতীদের অনুরাগকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলা যাইতে পারে।

প্রীতিসন্দর্ভ—ইহাই সর্বশেষ সন্দর্ভ। ইহাতে মুক্তির স্বরূপ, ভগবৎপ্রীতি, ভক্তি-রস, কৃষ্ণগোপীসম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। মানবজীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি। একমাত্র ভগবৎপ্রীতিই এই দুইটি লাভের উপায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে জীবকে ভগবানের সহিত অভিন্ন মনে করা হয় নাই। ভগবানের সহিত সাক্ষাৎকারই ভগবৎপ্রাপ্তি। ইহা সর্ব দুঃখনিবারক ও অনন্ত আনন্দজনক। এই ভগবৎসাক্ষাৎকার প্রীতি ভিন্ন ঘটিতে পারে না। জীব ভগবানের প্রতি প্রীতিতে আকৃষ্ট হইলে মুক্তিও তাহার নিকট তুচ্ছ আর প্রকৃতপক্ষে জীবের ভগবৎপ্রাপ্তিই তো মুক্তি। মুক্তি যদি প্রীতির অঙ্গীভূত না হয় তাহা হইলে তাহা 'কৈতব'। তাই মুক্তিলাভকারী ব্যক্তিও প্রীতির বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। মৃত্যুর পরে যে মুক্তিলাভ হয়, তাহা পাঁচ প্রকারের—(১) সালোক্য—দেবলোকপ্রাপ্তি, (২) সার্ষ্টি—দৈবশক্তি বা অবস্থার তুল্যশক্তি বা অবস্থা লাভ, (৩) সারূপ্য—দৈবরূপ

লাভ, (৪) সামীপ্য—দেবসান্নিধ্য লাভ, (৫) সাযুজ্য—দেবতার সহিত একীভাব। এই মুক্তিলাভের ফল— (১) মায়াশক্তির বিদূরণ এবং ভক্তিপ্রসূত প্রীতি দ্বারা জীবের স্বরূপোলব্ধি, (২) মৃত্যুর পরে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর পরিত্যাগের পর গুণাতীত অবস্থা লাভ, (৩) কর্মের বিলুপ্তি, কিন্তু ভক্তির অবিলুপ্তি, (৪) সংসার বা পুনর্জন্মনিবৃত্তি, (৫) ভগবৎসাক্ষাৎকারজনিত পরমানন্দ লাভ, (৬) মুক্ত জীবের ভগবান্ হইতে পৃথক সত্তা এবং সেইরূপ পৃথক সত্তায় ভগবৎ সেবা ও প্রীতি প্রভৃতি রসভোগ।

ভগবানের প্রতি উদ্দিষ্ট প্রীতি প্রেমভক্তি নামে অভিহিত। ভগবানের স্বরূপ শক্তির প্রকাশই প্রীতির স্বরূপলক্ষণ ; চিত্তের দ্রবতা, রোমহর্ষ প্রভৃতি তটস্থ লক্ষণ। ভক্তচিত্তে প্রীতির আবির্ভাব দ্বিবিধ অবস্থা সৃষ্টি করে, (১) ভক্তচিত্তসংস্ক্রিয়াবিশেষ— ইহা ভক্তচিত্তের প্রস্তুতি ঘটায়, (২) অভিমানবিশেষ—ভক্তচিত্তে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবের সৃষ্টি করে। প্রীতির বিকাশ রতি, প্রেম, প্রণয়, মান, স্নেহ, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাবের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। প্রীতির চরমাবস্থা মহাভাব। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য—এই পাঁচটি ভগবৎপ্রীতির মূলীভূত ভাব ; পরপর ইহারা শ্রেয়। রসশাস্ত্রে এই পাঁচটি ভাবেরই নাম স্থায়িভাব ; ইহাদের প্রত্যেকটি কৃষ্ণরতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবসংযোগে লৌকিক কাব্যরসের ন্যায় এই স্থায়িভাবগুলি অলৌকিক রসে পরিণতি লাভ করে। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের এই পাঁচ প্রকার ভক্তিরসকে বলা হয় প্রীতি বা প্রেমভক্তি। ইহাদের তুলনায় গৌণ আরও পাঁচটি রস বর্তমান, যথা—হাস্য, করুণ, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র, বীর ও অদ্ভুত।

এই সন্দর্ভে জীব গোস্বামীর দুইটি বিষয়ের আলোচনা উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, ভক্তি রস বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কিনা এবং দ্বিতীয়তঃ, কৃষ্ণগোপী সম্বন্ধ। প্রাচীন আলংকারিকগণের মতে 'দেবাদিবিষয়া' ভক্তি একটি ভাবমাত্র। ইহা কাব্য-রসের তুল্য কখনও রসত্বে পরিণতি লাভ করিতে পারে না। জীবের মতে, এই আপত্তি সাধারণ দেবদেবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে, কিন্তু স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের ভক্তির ক্ষেত্রে নহে। তিনি দেখাইয়াছেন যে, কৃষ্ণভক্তির রসে পরিণতি লাভে কোন বাধা নাই। কৃষ্ণরতিতে স্থায়িভাবের সমস্ত প্রকরণই বর্তমান। প্রাচীন অলংকার-শাস্ত্রের তেত্রিশটি অনুভাবও কৃষ্ণরতিতে পাওয়া যাইবে।

কৃষ্ণগোপী সম্বন্ধের আলোচনায় জীব নানা প্রমাণবলে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের আসক্তিতে প্রকৃত কাম নাই, পরকীয়া ভাবও নাই। তাহাদের পরকীয়া ভাব মায়ামাত্র, বস্তুতঃ তাহারা কৃষ্ণের স্বীয়া। গোপীগণ কৃষ্ণের প্রিয় হইলেও তিনি দ্বারকায় যাহাদের বিবাহ করিয়াছিলেন তাহারা ও গোপবধূরা একাত্মা।

ষট্‌সন্দর্ভের মধ্যে কেবলমাত্র তত্ত্বসন্দর্ভের উপর বলদেব বিদ্যাভূষণের একটি টীকা পাওয়া যায়। অদ্বৈতবংশীয় রাধামোহন ভট্টাচার্যও ইহার একটি টীকা করেন। নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এই দুইটি টীকাযোগে তত্ত্বসন্দর্ভের একটি সংস্করণ বাহির করেন।

সংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণীর বিভিন্ন স্থানে এই সন্দর্ভগুলির উল্লেখ আছে, যথা— তদেতচ্ছ্রীভাগবতসন্দর্ভ-পরমাত্মসন্দর্ভ ভক্তিসন্দর্ভেষু বিস্তৃতমস্তীত্যলমতিবিস্তরেণ' (৮৯।২০ পুরীদাস সং)। অন্যানি তু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বিবৃতানি (৮৯।২০১ ঐ), এতদ্বিবরণঞ্চ শ্রীভাগবতসন্দর্ভ-তট্টীকয়োর্দৃশ্যম্ (৮৭।৩৮ ঐ) ইত্যাদি। ইহা হইতে এই সন্দর্ভগুলি ১৫৮২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত হইয়াছিল বোঝা যায়, কারণ সংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণীর রচনাকাল ১৫৮২ খৃষ্টাব্দ।

ক্রমসন্দর্ভ—ইহা দ্বাদশ স্কন্ধযুক্ত সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা। জীব গ্রন্থ রচনার কারণ নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন 'অধুনা তু শ্রীমদ্‌ভাগবত-ক্রমব্যাখ্যানায় তথাপি সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন নির্ণয়-দর্শনায় চ সপ্তমঃ ক্রমসন্দর্ভোঽয়মারভ্যতে।

শ্রীভাগবতনিধ্যর্থা টীকাদৃষ্টিরদায়ি যৈঃ।
শ্রীধরস্বামিপাদানাংস্তান্ বন্দে ভক্ত্যেকরক্ষকান্ ॥
স্বামিপাদৈর্ন যৎব্যক্তং যদ্‌ব্যক্তং চাস্ফুটং কৃচিৎ।
তত্র তত্র চ বিজ্ঞেয়ঃ সন্দর্ভঃ ক্রমনামকঃ ॥

জীবের সর্বসম্বাদিনীতে ক্রমসন্দর্ভের উল্লেখ আছে 'অথ নমস্কুর্বন্নেবেতি সূত্রস্থানীয়-স্যাভ্যাস-বাক্যস্য বিষয়স্থানীয় শ্রীভাগবতবাক্য সমাপ্তাবস্কবিন্যাসস্তদ্বাক্য-সঙ্গতি গণনাপরঃ, স চ ক্রমসন্দর্ভানুকূলো ভবিষ্যতি'। (রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত সর্বসম্বাদিনী, পৃঃ ২৩)।

সর্বসম্বাদিনীর কথা বৈষ্ণবতোষণীতে ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে, 'এতদ্বিবরণঞ্চ শ্রীভাগবতসন্দর্ভতট্টীকয়োর্দৃশ্যম্' (৮৭।৩৮ পুরীদাস সং)। এই টীকা সর্বসম্বাদিনীকেই সূচিত করিতেছে মনে হয়। জীব সর্বসম্বাদিনীর মঙ্গলাচরণে বলিতেছেন,—

শ্রীকৃষ্ণং নমতা নাম সর্বসম্বাদিনী ময়া।
শ্রীভাগবতসন্দর্ভস্যানুব্যাখ্যা বিরচ্যতে ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া ভাগবতসন্দর্ভের 'সর্বসম্বাদিনী' নামে অনুব্যাখ্যা রচনা করিতেছি।

অনুব্যাখ্যা ও টীকার মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। সর্বসম্বাদিনীতে ক্রম-সন্দর্ভের উল্লেখ এবং বৈষ্ণবতোষণীতে সর্বসম্বাদিনীর উল্লেখে প্রমাণিত হয় যে ক্রমসন্দর্ভ বৈষ্ণবতোষণীর পূর্বে অর্থাৎ ১৫৮২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হইয়াছিল।

সর্বসম্বাদিনী—এই গ্রন্থখানি ভাগবতসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা। প্রথম চারিটি সন্দর্ভের

টীকাস্বরূপ বলিয়া বোধ হয়, ইহার স্বতন্ত্র নামোল্লেখ কেহ করেন নাই। টীকা হইলেও রচনাগৌরবে ইহা একটি পৃথক গ্রন্থের মর্যাদা দাবী করিতে পারে। দার্শনিক আলোচনা হিসাবে বিচার করিতে গেলে ইহা মূল হইতেও উপাদেয়। কিন্তু জীবের অক্ষরকার্পণ্য স্বভাবহেতু সূত্রবৎ সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত বাক্যবিন্যাসের ফলে অনেকস্থলে অর্থের উপলব্ধি দুরূহ ব্যাপার। তাই এই গ্রন্থ অস্পষ্ট, জটিল ও কিছুটা দুরধিগম্য। বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতি, পুরাণ, নিরুক্ত ও ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ মন্থন করিয়া সর্বসংবাদ আলোচনা, সমন্বয়পূর্বক এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় ইহার নাম সর্বসম্বাদিনী। সর্ব-সম্বাদিনীর মঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অবতারিত্ব সম্বন্ধে বিচার করিয়া তত্ত্ব-সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যারূপে দশবিধ প্রমাণের মধ্যে শব্দপ্রমাণের শ্রেষ্ঠতা, শব্দশক্তি বিচার, স্ফোটবাদ, মহাবাক্যার্থাবগমের উপায়, ভগবৎস্বরূপ বিনির্ণয়, সর্গাদি বিচার, ভগবানের বিগ্রহত্বে অদ্বৈতবাদীর পূর্বপক্ষ এবং মধ্বাচার্যের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিচার করিয়া আলোচনা সমাপ্ত করিয়াছেন। ভগবৎসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ প্রধানতঃ বিচারিত হইয়াছে—শক্তিসিদ্ধান্ত, শক্তির অস্বীকারে দোষ, 'আনন্দ-ময়োঽভ্যাস্যাৎ' সূত্র ব্যাখ্যা, নির্বিশেষবাদ খণ্ডন, ত্রিবিধ ভেদবিচার, ভগবদ্‌বিগ্রহের নিত্যতা, পরিচ্ছিন্নত্ব-অপরিচ্ছিন্নত্ব ও শ্রীকৃষ্ণে সর্বশাস্ত্রের সমন্বয় ইত্যাদি।

পরমাত্মসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় জীবের অণুত্ব, জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব প্রভৃতি ; ব্রহ্মা হইতে জীবচৈতন্যসমূহের ভেদ, বিবর্তবাদ খণ্ডন, পরিণামবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত, চতু-র্ব্যূহবিচার, পঞ্চরাত্রমত সমর্থন ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আর কৃষ্ণসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় অবতারতত্ত্ব বিচার, কৃষ্ণের কেশাবতারত্ব খণ্ডন, কৃষ্ণনামের শ্রেষ্ঠত্বহেতু তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তা, গোপীভজনের সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

সংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণী—সনাতন শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের উপর যে টীকা করেন তাহা বৈষ্ণবতোষণী নামে প্রসিদ্ধ। জীব পিতৃব্যের আদেশে ইহার সংক্ষিপ্তি সাধন করেন। সংক্ষিপ্তিকৃত বৈষ্ণবতোষণীকে পৃথক করিবার নিমিত্ত সনাতনের গ্রন্থটি বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী ও জীবের গ্রন্থ লঘু বা সংক্ষেপ বৈষ্ণবতোষণী নামে অভিহিত হয়। উপসংহারে প্রদত্ত শ্লোক হইতে ইহা ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে রচনা জানা যায়। নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকরেও ইহার রচনাকাল জ্ঞাপক শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

> শাকে ষটসপ্ততিমনৌ পূর্ণেয়ং টিপ্পনী শুভা।
> সংক্ষিপ্তা যুগ শূন্যাগ্রপঞ্চৈকগণিতে তথা॥
> চৌদ্দশত সপ্ত ছয়ে সম্পূর্ণ বৃহৎ।
> পনরশত চারিশকে লঘু সম পত॥ —ভ. র. ১।৭৯৪

কেহ কেহ 'যুগশূন্য' অর্থে যুগলশূন্য ধরিয়া ১৫০০ শক (১৫৭৮ খৃষ্টাব্দ) রচনাকাল ধরিয়াছেন।[১] নরহরি চক্রবর্তী যখন স্পষ্টভাবে ১৫০৪ শক বলিয়াছেন, তখন তাহাই গ্রহণ করা সঙ্গত বিবেচনায় আমরা ১৫৮২ খৃষ্টাব্দ রচনাকাল ধরিয়াছি।

সংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণীর যে সংস্করণ পুরীদাস প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাতে বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণীর কিছু কিছু অংশ ঢুকিয়া গিয়াছে, কারণ জীব তাঁহার গ্রন্থে কখনও লিখিতে পারেন না—ইতি বিবৃতং চৈতদনুজবরৈঃ শ্রীরূপমহাভাগবতৈরুজ্জ্বল-নীলমণেঃ স্থায়িভাববিবরণে' (৩২।৮ পুরীদাস সং)। এখন বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণীর কতটুকু অংশ ইহাতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার।

জীবের নামে আরোপিত গ্রন্থ ও স্তবাদি

অফ্রেত তাঁহার Catalogus Catalogorum গ্রন্থে (Vol. I, p. 207) মুক্তা-চরিত ও স্তবমালা জীবে আরোপ করিয়াছেন। মুক্তাচরিত রঘুনাথ দাসের লিখিত এবং স্তবমালার রচয়িতা রূপ, জীব ইহার সংকলকমাত্র।

কৃষ্ণমাচারিয়ার তাঁহার History of Classical Sanskrit Literature গ্রন্থে (p. 289) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও গোবিন্দবিরুদাবলীকে জীবের গ্রন্থ হিসাবে ধরিয়াছেন। উভয়গ্রন্থই রূপের রচিত। পুলিনবিহারী দাস বৃন্দাবন কথায় (পৃঃ ৮১) অলংকারকৌস্তুভ জীবরচিত বলিয়াছেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত রচয়িতা কবি-কর্ণপুর। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার The Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal গ্রন্থে (p. 43) ও কেনেডি The Chaitanya Move-ment গ্রন্থে (p. 137) বলিয়াছেন যে জীব গোস্বামী কৃষ্ণকর্ণামৃতের একটি টীকা লিখিয়াছেন। কৃষ্ণকর্ণামৃতের যে কয়টি টীকা পাওয়া যায় তাহার রচয়িতা রূপে কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্যদাস ও দ্রবিড় ব্রাহ্মণ গোপাল ভট্টের পরিচয় পাওয়া যায়। জীব কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা রচনা করিয়াছেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

জগদ্বন্ধু ভদ্র গৌরপদতরঙ্গিণীতে (পৃঃ ৪৫) এবং হরিলাল চট্টোপাধ্যায় বৈষ্ণব ইতিহাসে (পৃঃ ১০৮) কৃপাম্বুধি নামে একটি স্তব জীবকৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ বলরাম দাসের নিম্নোক্তপদ হইতে তাঁহারা এই স্তবের পরিচয় জানিয়াছিলেন।

শ্রীগোপালচম্পূ আর রসামৃতশেষ।
কৃপাম্বুধিস্তব সপ্তসন্দর্ভ বিশেষ॥

[১] গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর পৃঃ ৪৬১ ; অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, পৃঃ ৫৬

সূত্রমাত্রা ধাতুসংগ্রহ কৃষ্ণার্চন।
সংকল্পকল্পবৃক্ষ হরিনাম ব্যাকরণ ॥
লিখিলা লিখিলা গ্রন্থ কত কৈব নাম।
খুলিলা ভক্তির দ্বার কহে বলরাম ॥

—বলরাম দাসের পদাবলী, ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য সং

বলরাম দাসের বিবৃতি হইতে জীবকৃত কৃপাম্বুধি স্তবের নাম পাওয়া গেলেও অদ্যাবধি ইহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এই বলরাম দাস নিত্যানন্দ পরিকর সুপ্রসিদ্ধ বলরাম দাস নহেন, কেননা তিনি এমন নীরস গ্রন্থতালিকা পয়ার ছন্দে লিখিবেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার পক্ষে বৃন্দাবনবাসী জীবের সমস্ত পরিচয় দেওয়াও সম্ভব নহে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার Notices of Skt. Mss. (Vol. IV, pp. 303-305) গ্রন্থে জীবের নামে সারসংগ্রহ নামে একটি গ্রন্থ আরোপ করিয়াছেন।

ইহার আরম্ভ এইরূপ ঃ

শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরে কৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্ণি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ ॥
আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপাদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্ম জন্মনি ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণং নৌমি শরণং মম সন্ততাম্।
হরণং সর্বদুঃখানাং স্মরণং যস্য···অপি ॥
শ্রীমুকুন্দপদদ্বন্দ্বং কন্দমানসন্ততেঃ।
তনোতু ময়ি কারুণ্যং স্বমাত্রৈকগতৌ সকৃৎ ॥
স্বমনোদ্রঢ়িমৈকার্থলাভায়াস্বদ্যতে ময়া।
শ্রীরূপকৃতগ্রন্থানাং কোঽপি কোঽপিনবঃ স্ফুটঃ ॥
জয়তাং মথুরাভুমৌ শ্রীলরূপসনাতনৌ।
যৌ বিলেখয়তস্তত্ত্বজ্ঞাপিকাং পুস্তিকামিমাম্ ॥
শ্রীরূপকবীন্দ্রস্য পাদপদ্মমহর্নিশম্।
স্ফুরতাং মানসে সম্যঙ্মম মন্দস্য দুর্মতেঃ ॥

উপসংহার ঃ

শ্রীমদ্রাধাচরণচরিতানন্দপীযূষধারাং।
বারং বারং রসিকসদসি প্রেমমত্তঃ প্রবর্ষন্।
স্মেষাকুণ্ডে পুনরপি কদা শ্রীমুকুন্দাখ্য আরা-
ন্নেত্রানন্দং প্রভুরনুপমং হা মদীয়ং বিধাতা ॥

পুষ্পিকা ঃ ইতি জীব গোস্বামী কৃত সারসংগ্রহ সম্পূর্ণ।

মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোক শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণো ইত্যাদি বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য গোপালগুরুর হরিনামার্থনির্ণয়েও দৃষ্ট হয়। ইহার দ্বিতীয় শ্লোক রঘুনাথ দাসের মুক্তাচরিতের উপসংহারের প্রথম শ্লোক। জীব অন্যকৃত শ্লোক মঙ্গলাচরণে উদ্ধার করিবেন ইহা বিশ্বাস হয় না। গ্রন্থটিতে পরকীয়া মত স্থাপিত হইয়াছে। জীবের গ্রন্থে পরকীয়া মতের সমর্থন থাকিলেও স্বকীয়া মতের প্রাধান্য দেখা যায়। জীবের দুর্গমসঙ্গমনীর সমর্থন ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে ; 'অতএব সাধূক্তং শ্রীদুর্গমসঙ্গমন্যাং অখিলরসামৃতমূর্তিঃ ইত্যাদি পদ্যস্য ব্যাখ্যায়াম্'। জীব কখনও নিজ গ্রন্থ সম্পর্কে 'সাধু উক্তম্' লিখিতে পারেন না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর 'ত্রিবর্ষ বালিকা সেয়ম্' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া জীব বালিকেয়ম্ ত্রিবর্ষীয় পাঠ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু সারসংগ্রহে 'বালিকেয়ম্ ত্রিবর্ষীয়' পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে। দুর্গম-সঙ্গমনীতে যুক্তিপ্রমাণের সাহায্যে যাহা অস্বীকার করিয়াছেন তাহা এখানে স্বীকার করিতে পারেন না।

এই গ্রন্থের বর্ণিত কোনও কোনও অংশের সহিত রাধাকৃষ্ণ দাসের সাধনদীপিকার হুবহু সামঞ্জস্য দেখা যায়। সাধনদীপিকার একস্থানে আছে 'অতএব শ্রীমহাপ্রভোঃ-শক্তিরূপৈঃ শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈঃ শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণিঃ শ্রীবিদগ্ধমাধবঃ দানকেলি-কৌমুদ্যাদিগ্রন্থানাং সমর্থারতি বিলাসরূপাণাং সূত্ররূপে শ্রীস্মরণমঙ্গলে প্রতিজ্ঞাতম্' (সাধনদীপিকা, নবম কক্ষা)। আর সারসংগ্রহেও একস্থানে অবিকল এই ভাষায় আছে, 'অতএব শ্রীমদ্রূপগোস্বামীচরণৈঃ শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণিঃ বিদগ্ধমাধবঃ দানকেলি-কৌমুদ্যাদিগ্রন্থানাং সমর্থারতি বিলাসরূপাণাং সূত্ররূপে শ্রীস্মরণমঙ্গলে প্রতিজ্ঞাতম্' (পৃঃ ৩৩)। সাধনদীপিকাতে আছে, 'এতদভাবে হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্তিতোঽহং বরাক-রূপোঽপি ইতি বচনাৎ শ্রীমহাপ্রভুণা নিজপ্রাকট্যস্য প্রয়োজনস্য শ্রীমদ্রূপগোস্বামিকৃত শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণ্যাদিভিঃ সম্পাদিতত্বাৎ। প্রাকট্যমুখ্যপ্রয়োজনস্য হ্যান্যা শ্রীমহাপ্রভোঃ প্রাকট্যমপ্রয়োজকম্' (পৃঃ ২৫৫)। আর সারসংগ্রহে আছে 'তেন হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি ইতি রচনাচ্ছ্রীমহাপ্রভুণা নিজপ্রাকট্যমুখ্যপ্রয়োজনস্য শ্রীমদ্রূপগোস্বামীকৃত শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণ্যাদিভিঃ সম্পাদিতত্বাৎ, প্রাকট্যমুখ্যপ্রয়োজনহ্যান্যা মহাপ্রভু প্রাকট্য প্রয়োজকং স্যাৎ' (পৃঃ ৩২)।

রাধাকৃষ্ণদাস তাঁহার গ্রন্থে যখনই কোন প্রমাণবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন তখনই তিনি যে গ্রন্থ কিংবা গ্রন্থকারের রচনা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণদাস যদি এই অংশগুলি সারসংগ্রহ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি ইহার নামোল্লেখ করিতেন। কিন্তু তিনি কোন নাম উল্লেখ না করায় স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে সারসংগ্রহের গ্রন্থকারই রাধাকৃষ্ণদাস

হইতে এই অংশ লইয়াছেন। জীব সারসংগ্রহের রচয়িতা হইলে তাঁহার পক্ষে রাধা-কৃষ্ণদাসকৃত সাধনদীপিকা গ্রন্থের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা কিছুতেই সম্ভব নহে।

সারসংগ্রহ গ্রন্থটি রূপকবিরাজের নামে আশুতোষ সংস্কৃত সিরিজের তৃতীয় গ্রন্থ হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৪৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক দেখাইয়াছেন যে এই গ্রন্থটি জীবের লেখা নহে। আমাদের অনুমানও ইহার সহিত মিলিয়া যাইতেছে।

জীবের নামে বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরে বৈষ্ণববন্দনার একটি পুঁথি রক্ষিত আছে (বিবিধ গ্রন্থ ৬৩ নং)। উক্ত গ্রন্থটি ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁহার 'চৈতন্য-চরিতের উপাদান' গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত করেন।

আরম্ভ এইরূপ ঃ সনাতনসমো যস্য জ্যায়ান্ শ্রীমান্ সনাতনঃ।
শ্রীবল্লভোহনুজঃ সোঽসৌ শ্রীরূপো সদ্গতিঃ॥
সর্বাবতারতত্ত্বজ্ঞে র্ভগবান্ শ্রীশচীসুতঃ।
অবতীর্ণঃ কলৌ কৃষ্ণ স্তত্তদ্ভাবপরঃ প্রভুঃ॥

উপসংহার ঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্গুণময়ং তদ্ভক্তবর্গাননু।
জীবেনৈব ময়া সমাপিতামিদং কৃষ্ণাতুপাদার্পিতম্॥

পুষ্পিকা ঃ ইতি জীব গোস্বামী বিরচিতা মাধবসম্প্রদায়ানুসারিণী চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণববন্দনা সমাপ্তা।

'সনাতনসমো যস্য জ্যায়ান্' ইত্যাদি এই আরম্ভ শ্লোকটি উজ্জ্বলনীলমণিটীকার মঙ্গলাচরণে ও শেষে, ব্রহ্মসংহিতার টীকার শেষে, দুর্গমসঙ্গমনীর মঙ্গলাচরণে এবং অগ্নিপুরাণান্তর্গত গায়ত্রীব্যাখ্যার মঙ্গলাচরণে দেখা যায়। বৈষ্ণববন্দনার তিনটি স্থানে জীব গোস্বামী নিজের নাম এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

তদ্বন্দনং তৎস্মরণং সর্বসিদ্ধিবিধায়কম্।
জীবেন কেন ক্রিয়তে পৌর্বাপৌর্যমজানতা॥

*　　*　　*

যৎপাদাব্জপরিমলগন্ধলেশবিভাবিতঃ।
জীবনামানিমেষেবেয়তা বিহৈব ভবে ভবে॥

*　　*　　*

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্গুণময়ং তদ্ভক্তবর্গাননু।
জীবেনৈব ময়া সমাপিতামিদং কৃষ্ণাতুপাদার্পিতম্॥

জীব গোস্বামীর 'জীব' এই নামে পরিচয় দেওয়ার রীতি অন্যান্য গ্রন্থেও দেখা যায়। লঘুতোষণীর উপসংহারে আছে,—

'যা সংক্ষিপ্তা ময়া ক্ষুদ্র জীবেনাপি তদাজ্ঞয়া'।

গোপালচম্পূর পূর্বচম্পূর উপসংহারে বলিতেছেন,—

বৃন্দাকাননমাশ্রিতেন লঘুনা জীবেন কেনাপি তদ্ ।
বৃন্দাকাননমেব সম্ভৃতিকলাং ধত্তাং সমন্তাদিহ ॥

হরিনামামৃতের উপসংহারে আছে, 'বৃন্দাবনস্থ জীবস্য কৃতিরেষাতুগৃহ্যতাম্'। এই পরিচয় দেওয়ার ভঙ্গী হইতে মনে হয় যে বৈষ্ণববন্দনা জীবেরই রচিত। প্রশ্ন উঠিতে পারে জীব যৌবনে বৃন্দাবনে চলিয়া আসেন, তাঁহার পক্ষে গৌড়-উৎকলের এত ভক্তদের নাম জানা কি করিয়া সম্ভব? ভক্তিরত্নাকরের কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে জীব নিত্যানন্দের কৃপা লাভ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন (১ম তরঙ্গ)। নিত্যানন্দের সঙ্গে অবস্থান করিবার কালে তিনি তাঁহার ভক্তদের সহিত পরিচিত হইয়া থাকিতে পারেন। বৈষ্ণববন্দনায় যে সমস্ত পুরী, ভারতী, সরস্বতী উপাধিধারী ব্যক্তির উল্লেখ আছে তাঁহাদের কথা জীব নীলাচলে দীর্ঘকাল বসবাসকারী রঘুনাথ দাসের নিকট হইতেও জানিয়া থাকিতে পারেন। এই বৈষ্ণববন্দনায় আছে যে অচ্যুত ভিন্ন অদ্বৈতের অন্যান্য পুত্ররা বৈষ্ণবগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। বীরচন্দ্র বা বীরভদ্রকে নিত্যানন্দের পুত্র না বলিয়া কেবলমাত্র জাহ্নবার সেবক বলা হইয়াছে। এমন হইতে পারে যে নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতবংশের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কেহ বৈষ্ণববন্দনা রচনা করিয়া তাঁহাদের নাম বাদ দিয়া জীবের নামে আরোপ করিয়াছেন। ইহা প্রকৃতই জীবের রচনা কিনা তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। ইহা জীবের হইলেও হইতে পারে। ইহাতে যে ছন্দ ও ব্যাকরণের কিছু কিছু ভ্রম প্রমাদ দেখা যায় তাহা অনুলিপিকর্তাদের অজ্ঞতাবশে ঘটা অসম্ভব নহে।

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বহরমপুর হইতে ১২৮৭ সালে একটি সটীক দানকেলি-কৌমুদী প্রকাশ করেন। তিনি টীকাটিকে জীব রচিত বলিয়াছেন। ডঃ সুশীল-কুমার দেও ইহা জীব রচিত মনে করেন।[১] কিন্তু ইহা যে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক লিখিত হইবার সম্ভাবনা বেশী তাহা পূর্বে দেখাইয়াছি।

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ললিতমাধবের একটি সটীক সংস্করণ প্রকাশ করেন। টীকাকারের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এই টীকার প্রারম্ভে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কৃপাধরৈঃ শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণৈর্মদেকশরণৈঃ' পাঠ দেখিয়া ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ইহাকে জীব রচিত মনে করিয়াছেন।[২] ইহা সম্ভব বলিয়াই মনে হয়। রূপের উজ্জ্বলনীলমণিতে ধৃত ললিতমাধবের শ্লোকসমূহের জীবকৃত টীকার সহিত

১ *Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal*, 2nd. ed., p. 124

২ চৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃঃ ১৫৯

এই ললিতমাধবের টীকাকারের টীকার বেশ সামঞ্জস্য দেখা যায়। জীব যেরূপ সংক্ষিপ্ত বাক্যে, কোথাও একটি কি দুটি মাত্র শব্দে শ্লোকবিশেষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এই ললিতমাধবেরও সেরূপ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেখা যায়। কয়েকটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখান হইতেছে।

উজ্জ্বলনীলমণিতে ধৃত ঃ জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং

সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং সখি তিরঃ সঞ্চারি নেত্রাঞ্চলং।
বংশীং কুটমলিতে দধানমধরে লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাং
রিঙ্গদভ্রূভ্রমরং বরাঙ্গি পরমানন্দং পুরঃ স্বীকুরু ॥

লোচনরোচনী টীকা—জঙ্ঘাধস্তটেতি। দাম্পত্যেন শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্ত্যুপায়সময়ে তদভেদেন শ্রীরাধায়াঃ প্রতীতায়াঃ প্রতিমায়া বর্ণনং।

ললিতমাধবটীকা—ললিতেতি। হে বরাঙ্গি। পুরো মূর্তিমন্তং পরমানন্দং স্বীকুরু। মূর্তিমত্ত্বে জঙ্ঘাধ ইত্যাদি বিশেষণং।

স্মরকেলিনাট্যনান্দীং শব্দব্রহ্মশ্রিয়ং মুহুর্দুহতী।
বহতি মুদং মম মহতীমিহ মহিতা শ্যামলা মহতী ॥

লোচনরোচনী টীকা—স্মরকেলি ইত্যপি মধুরিমেত্যাদি সহোদরং। শব্দ ব্রহ্মশ্রিয়ং শব্দরূপং ব্রহ্মবেদাখ্যং তস্য সম্পত্তিরূপতয়া বিতর্ক্যমানায়াস্তাদৃশীং স্মরকেলি নাট্য-নান্দীং আরম্ভত এক মঙ্গলপাঠং দুহন্তী প্রপূরয়ন্তী। মহতী বিপঞ্চীনামা বীণাভেদঃ।

ললিতমাধবটীকা—স্মরকেলি ইত্যাদি। শ্যামলয়া মহতী বীণা মম মহতী মুদং বহতী মহিতা শ্রেষ্ঠা। শব্দাত্মক ব্রহ্মণঃ শ্রিয়ং শোভাং প্রপূরয়তী। কীদৃশীং স্মরকেলিরূপস্য নাট্যস্য নান্দী মঙ্গলপাঠস্তাং।

দুকূলেঽস্মিন্ কার্তস্বরমহসিবিস্তারিতদৃশো
বপুঃ কিন্তে ফুল্লৈর্বহতি তুলনাং নীপকুসুমৈঃ।
ত্রুটন্তীভিঃ কিম্বা স্ফটিকমণিমালাভিরুপমাং
লভন্তেঽমী ক্ষামোদরি নয়নয়োস্তোয়পৃষতাঃ ॥

লোচনরোচনী—ললিতমাধবস্থ নববৃন্দাবনীয়কথায়ামপরিচীয়মানং শ্রীরাধাং চন্দ্রাবলী পৃচ্ছতি দুকূলে তোয়পৃষতা জলবিন্দবঃ।

ললিতমাধবটীকা—নববৃন্দেতি। কার্তস্বরং সুবর্ণং তোয়পৃষতাঃ জলবিন্দবঃ।

উত্তাম্যন্তী বিরমতি তমস্তোমসম্পৎ প্রপঞ্চে
ন্যঞ্চন্মূর্ধা সরভসমসৌ স্রস্তবেণীর্বৃতাংশা।
মন্দস্পন্দং দিশি দিশি দৃশোর্দ্বন্দ্বমল্পং ক্ষিপন্তীং
কুঞ্জাদ্ গোষ্ঠং বিশতি চকিতা বর্ত্মাবৃত্যপালী ॥

লোচনরোচনী টীকা—চকিতা ভীতা।

ললিতমাধবটীকা—উত্তাম্যন্তী দুঃক্ষিতা সতী। তমস্তোম এব সম্পৎ সুখদায়কত্বাৎ। তস্যা বিস্তারে, চকিতা ভীতা সতি পচি বিস্তারে।

ধন্যে কজ্জলমুক্ত বামনয়না পদ্মে পাদোত্থাঙ্গদা
সারঙ্গি ধ্বনদেকনূপুরধরা পালি স্খলন্মেখলা।
গণ্ডোদ্যত্তিলকা লবঙ্গি কমলে নেত্রার্পিতালক্তকা
মা ধাবোত্তরলং ত্বমত্র মুরলীদূরে কলং কূজতি॥

লোচনরোচনী টীকা—মা ধাবেতি প্রত্যেকমন্বিতঞ্চ।

ললিতমাধব টীকা—ধন্য ইত্যাদি সর্বত্র সম্বোধনং। এবং ভূতা সতী মাধবেতি সর্বত্রান্বয়ঃ।

Madras Govt. Oriental Mss. Library-র (Vol. IV, pp. 4411-72) পুঁথির তালিকায় জাহ্নবাষ্টক নামে একটি স্তোত্র জীবের রচিত বলিয়া উল্লেখ আছে। এই স্তোত্রে আটটি শ্লোকে নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবার স্তুতি করা হইয়াছে।

আরম্ভ এইরূপঃ অনঙ্গমঞ্জরী খ্যাতে ব্রজে শ্রীরাধিকানুজে।
সূর্য্যাদাসসুতে দেবী জাহ্নবে ত্বং প্রসীদ মে॥

উপসংহারঃ পঠেচ্ছ্রীজাহ্নব্যাদেব্যা অষ্টকং যৌ জনঃ সদা।
শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজমধুপঃ স্যাৎ স বৈ কৃতী।

পুষ্পিকাঃ ইতি শ্রীজীবগোস্বামি বিরচিতং শ্রীজাহ্নবাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

জীবের সহিত জাহ্নবার সাক্ষাৎকারের একটি কিংবদন্তী নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকরে ও নরোত্তমবিলাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা সত্য হইয়া থাকিলে জীবের পক্ষে জাহ্নবাদেবীর স্তুতিমূলক এই অষ্টক লেখা অসম্ভব নহে।

কৃষ্ণদাসবাবাজী মথুরা হইতে গ্রন্থরত্ন ষট্কং নামে একটি গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহাতে জীব রচিত বলিয়া যুগলাষ্টকম্ নামে একটি স্তোত্র ধৃত হইয়াছে (গ্রন্থরত্নষট্কম্ পৃঃ ১০)।

আরম্ভ এইরূপঃ কৃষ্ণপ্রেমময়ী রাধা রাধাপ্রেমময়ো হরিঃ।
জীবনে নিধনে নিত্যং রাধাকৃষ্ণৌ গতি র্মম।
কৃষ্ণস্য দ্রবিণং রাধা রাধায়া দ্রবিণং হরিঃ।
জীবনে নিধনে নিত্যং রাধাকৃষ্ণৌ গতির্মম॥

উপসংহারঃ বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা কৃষ্ণো বৃন্দাবনেশ্বরঃ।
জীবনে নিধনে নিত্যং রাধাকৃষ্ণৌ গতি র্মম॥

পুষ্পিকাঃ ইতি শ্রীজীবগোস্বামিনা বিরচিতং শ্রীযুগলাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

রচনার দৈন্য দেখিয়া মনে হয় যে ইহা জীব রচিত নহে। বরাহনগর

গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত পুঁথিমধ্যে জীবকৃত বলিয়া একটি 'বৃন্দাবনপদ্ধতি' নামের গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় (স্মৃতি ১৭৭ নং)।

আরম্ভ এইরূপ ঃ শ্রীকৃষ্ণকায় নমঃ সনাতনসমো যস্য জ্যায়ান্ শ্রীবল্লভানুজঃ

অথ শ্রীবৃন্দাবনপদ্ধতি—

সবিকো ব্রহ্মে মুহূর্তিচোত্থায় রাত্রিবাস্যঞ্জাচস্যগুরুকুলঞ্চৈনরো। শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্নামোচ্চারণপূর্বকং শৌচং গণোশৌচং বিধায় জলমৃত্তিকয়া॥

অথ দন্তধাবনমন্ত্রাদি—

আয়ুর্বিদ্যাযশোরুচঃ প্রজাপসুরসুনিচ।
ধর্মপ্রজ্ঞাঞ্চমেধাঞ্চৈবং নোদেহি বনস্পতে॥

অন্ত্য ঃ ন মানং ন চ মাশ্চর্যং নাহংকাস ন সা এ
ন বিধিদনেসগুজ্যং নাধিক্যং বাসমণ্ডলে।,

পুষ্পিকা ঃ ইতি জীবগোস্বামী বিলিখিত শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনপদ্ধতিসমাপ্তশ্চায়ং।

দন্তধাবন প্রভৃতি আচার বিচার সম্পর্কে জীব কোন স্মৃতিগ্রন্থ এরূপ নিকৃষ্ট ভঙ্গীতে রচনা করিয়াছিলেন মনে হয় না।

'নিতাই সুন্দর' নামে একটি পত্রিকায় 'শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকোক্ত নান্দীশ্লোকস্য অনর্পিতচরিতমিত্যস্য শ্রীজীবগোস্বামীকৃত ব্যাখ্যা' নামে একটি লেখা মুদ্রিত হইয়াছে (১৩৪৩, চৈত্র, পৃঃ ৩৭১-৩৭৩)।

আরম্ভ এইরূপ ঃ ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায়।

অত্যন্তাগতিকগতিদানায় নিজপ্রেমরত্নরক্ষণযত্নোদ্গতস্বকার্পণ্যদোষ দূরীকরণায় তদ্দানে তদাস্বাদনমিতি তত্ত্বপ্রকাশনায় প্রেমসীমমহাভাবস্বরূপ শ্রীরাধিকাতত্ত্বজ্ঞাপনায় ইত্যাদি।

অন্ত্য ঃ ইত্যত্র দ্বীবাপ্য প্রকাশনায় শ্রীনবদ্বীপ ইতি নাম এতেন শ্রীবৃন্দাবনরূপ প্রকাশ-প্রেমঘূর্ণা প্রকারাদিকমপি অধুনৈব প্রকাশিতমিতি জ্ঞেয়ম্।

এই 'অনর্পিতচরিতমিতি' শ্লোকের ব্যাখ্যার একটি পুঁথি বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরে রহিয়াছে (পুঁথি নং বিবিধ ১)। পুষ্পিকায় কিংবা অন্যত্র কোথাও ইহা জীবের রচিত বলিয়া লেখা নাই। অথচ ঐ পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া উক্ত গ্রন্থমন্দির হইতে প্রকাশিত নিতাইসুন্দর পত্রিকায় এই ব্যাখ্যাটি জীবের নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ নিতাইসুন্দর পত্রিকায় (১৩৪৩, ভাদ্র-আশ্বিন, পৃঃ ১৫৪) জীব বিরচিত বলিয়া একটি 'শ্রীরূপদশকম্' মুদ্রিত হইয়াছে।

আরম্ভ এইরূপ ঃ রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলরসপরিপাকরূপস্বরূপ-
স্তৎ পাদাব্জপ্রণয়ঘটিত স্বান্তসর্বেন্দ্রিয়ো যঃ।
তন্নর্মোদ্যদ্বিহরণকলাকল্পিতস্বান্তবৃত্তিঃ
সঃ শ্রীরূপঃ পুনরপি কদা দৃক্পথং মে সমেতি॥

অন্ত্য ঃ বৃন্দারণ্যে সতত বিলসৎ শ্রীল রাধেকবন্ধোঃ
প্রাদুর্ভূতঃ প্রিয়পরিজনোহপ্যত্র রূপাভিধেয়ঃ।
তস্যৈবেতৎ প্রিয়জনধনং তদ্‌গুণাব্ধেঃ কণাঢ্যং
যঃ শ্রদ্ধাবান্ পঠতি দশকং তৎপদাব্জং স যাতি ॥

ইহার একটি পুঁথি বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত আছে। পুষ্পিকাতে আছে, 'ইতি শ্রীজীবগোস্বামিবিরচিতং শ্রীরূপগোস্বামিগুণলেশসূচকদশকম্'।

রচনাভঙ্গী, ভাব ও ভাষা দেখিয়া ইহা জীবের রচনা হইলেও হইতে পারে, মনে হয়। ভাবের ভিতর কোন সিদ্ধান্তবিরোধ নাই।

কৃষ্ণমাচারিয়ার তাঁহার History of Classical Skt. Literature গ্রন্থে (p. 1027) জীবকৃত বলিয়া 'ভৃঙ্গসন্দেশ' নামে একটি গ্রন্থের কথা বলিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের কোনরূপ বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে 'শ্রীরূপচিন্তামণি' নামে একটি স্তবের রচয়িতা হিসাবে রূপের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে এবং জীব ইহার টীকা লিখিয়াছেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। পুষ্পিকায় আছে, 'ইতি শ্রীজীববিরচিতা শ্রীরূপচিন্তামণি ব্যাখ্যা সমাপ্তা' (পুঁথি নং ১৪৭৫)। 'শ্রীরূপচিন্তামণি' নামক গ্রন্থটি যে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর লেখা তাহা পূর্বে দেখাইয়াছি। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত স্তবের টীকা জীবের পক্ষে করা সম্ভব নহে।

জীব গোস্বামীর দৃষ্টিতে স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং পরকীয়াভাবের উপাসনার আদি উপদেষ্টা। তিনি রামকেলিতে যখন নিভৃতে রূপসনাতনের সহিত প্রথম মিলিত হন তখন তাঁহাদিগকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে পরপুরুষে আসক্তা নারী গৃহকর্মে ব্যাপৃতা থাকিয়াও উপপতির সঙ্গজনিত সুখেরই আস্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং ঐরূপ মানসিক বৃত্তি লইয়া কৃষ্ণের ভজন করিতে হইবে (চৈ. চ. ২।১।১৯৬-১৯৮)।

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলে গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপপতি সম্বন্ধ বলিয়াই সাধারণ পাঠকের ধারণা জন্মে। রাসলীলা বর্ণনার পর পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান এবং তিনি ধর্মসেতুর (ধর্মমর্যাদার) বক্তা, কর্তা ও অভিরক্ষিতা হইয়াও কেন পরদারাভিমর্ষণ করিলেন (১০।৩৩।২৭)। গোপীরা যদি শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া অর্থাৎ বিবাহিতা পত্নী হইতেন তাহা হইলে পরীক্ষিৎ নিশ্চয়ই এরূপ প্রশ্ন করিতেন না। শুকদেব ঐ প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় প্রথমে লীলার দিক হইতে বলিলেন—'তেজয়ীসাং ন দোষায়' (১০।৩৩।২৯)—সর্বভুক্ অগ্নি যেমন অপবিত্র বস্তু গ্রাস করিলেও অপবিত্র হন না, তেমনি তেজস্বী ঈশ্বরদের ধর্ম-

ব্যতিক্রম তাঁহাদের পক্ষে দোষাবহ হয় না। তারপর তত্ত্বের দিক হইতে বুঝাইলেন যে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের, তাঁহাদের পতিগণের এবং সকল দেহধারীরই অন্তরে অন্তর্যামীরূপে বিচরণ করেন এবং তিনি অধ্যক্ষ বা বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী ; তিনি শুধু ক্রীড়া বা লীলা করিবার জন্য দেহ প্রকটিত করিয়াছেন (১০।৩৩।৩৫)। জীব গোস্বামী লঘুবৈষ্ণবতোষণীতে ঐ শ্লোকের টীকা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরদারত্ব দোষের নহে, কিন্তু পরদার হইলে গোপীরা যে কুলটা বলিয়া ধিক্কৃত হইবেন ইহা শুকদেব গোস্বামী সহ্য করিতে পারেন নাই বলিয়া বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা, সুতরাং তাঁহার কেহ পর হইতে পারে না এবং তাঁহার কাছে কেহ পরদার নহেন। তত্ত্বের দিক হইতে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া সন্দেহ নাই, কিন্তু রাসলীলায় পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগকে পরকীয়া বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা, (১) 'তা বার্য্যমানাঃ পতিভিঃ' (২৯।৮) তাঁহারা পতিদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও, (২) 'পুত্র ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ' (২৯।২০) তোমাদের ভ্রাতা ও পতিরা তোমাদিগকে খুঁজিতেছে। (৩) গোপীরা জবাব দিলেন—'এবং যৎ পত্যপত্য-সুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ' (২৯।৩২) পতি, পুত্র ও বন্ধুদের সেবা করাই স্ত্রীলোকের ধর্ম। তুমি যে এই উপদেশ দিলে তাহাই আমরা করিব। এখানে গোপীরা অবশ্য লীলার ব্যাপারে তত্ত্বের কথা তুলিয়া বলিয়াছেন, 'তোমাকে সেবা করিলেই আমাদের পতি-পুত্রাদির সেবা করা হইবে, কেননা, তুমি শরীরীদের আত্মা, প্রিয়তম বন্ধু ও নিত্যপ্রিয়'। (৪) শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে গোপীরা তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে গান করিয়া বলিয়াছেন, —'পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্' (৩১।১৬) তোমার উচ্চ গীতে মোহিত হইয়া পতি, পুত্র, জ্ঞাতি, ভ্রাতা ও বান্ধবদিগকে উপেক্ষা করিয়া আমরা তোমার নিকট আসিয়াছি।

গোপীদের পুত্রের স্পষ্ট উল্লেখ বহু স্থানে দেখা গেলেও গোস্বামীরা বলেন যে ঐ পুত্র তাঁহাদের নিজের পুত্র নহেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশীর অস্ফুট ধ্বনি করিয়া গোপীদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন কোন কোন গোপী 'পায়য়ন্ত্য শিশূন্ পয়ঃ' (২৯।৬) অর্থাৎ শিশুদিগকে দুধ খাওয়ানো ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট বনে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। এই শ্লোকাংশের অর্থ করিতে যাইয়া শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বল্লভাচার্য লিখিয়াছেন, 'অতি বালকানাং পুত্রাণাং স্তনদানঞ্চ' অর্থাৎ অতিশয় শিশুপুত্র-দিগকে স্তন্যপান করানো ছাড়াইয়া তাঁহারা অভিসারে গেলেন। সনাতন গোস্বামী বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীতে বলিলেন যে ঐ ছেলেরা নিজের ছেলে নহে, 'শিশূন্ ভগিনীপুত্রাদীন্ হিত্বা' অর্থাৎ উহারা তাঁহাদের ভগিনীপুত্র প্রভৃতি। জীব বলিলেন, 'যাতৃপুত্রাদীন্ ; ঐ শব্দটি কোন কোন স্থলে 'ভ্রাতৃপুত্রাদীন্' রূপে পাওয়া যায়। ২৯।২২ শ্লোকের ব্যাখ্যায় জীব উভয় শব্দই ব্যবহার করিয়া 'যাতৃভ্রাতৃপ্রভৃতি পুত্রান্ যান্ পালয়ন্তি ত্বা এব পুত্রা ইত্যুচ্যন্তে' বলিয়াছেন। জায়ের ছেলে হইলে গোপীরা শ্বশুরবাড়িতে

ছিলেন বোঝা যায়, কিন্তু ভাই বা ভগিনীর পুত্র হইলে তাঁহারা বাপের বাড়ীতেই বাস করিতেন বলিতে হয়। জীব তর্ক উঠাইয়াছেন যে শুকদেব গোস্বামী যদি গোপীদের নিজের ছেলের কথাই বলিতে চাহিতেন তাহা হইলে তিনি তো স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিতেন, 'পায়য়ন্ত্যঃ সুতান্ স্তনম্'। তাহা যখন তিনি বলেন নাই তখন ওখানে পয়ঃ মানে গোরুর দুধ খাওয়াইতেছিলেন বুঝিতে হইবে। জীব আরও বলেন যে গোপীদের নিজের গর্ভজপুত্রের কথা বলা হইলে রসাভাসের উৎপত্তি হইত। ২৯।২০ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে ঘরে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন, 'কেননা তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও স্বামী সকলেই তোমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া অন্বেষণ করিতেছেন'। এখানে যদি গোপীদের গর্ভজাত পুত্রের কথা বলা হয় তাহা হইলে যে পুত্রদের গভীর রাত্রিতে মায়ের খোঁজ করিতে বাহিরে যাইবার মতন বয়স হয় তাহারা যুবা এবং তাহাদের মায়েরা তাহা হইল জীবের মতে 'অর্ধজরতী'। এরূপ নারীদের সহিত রাসনৃত্য হইলে সেই ব্রজসুন্দরীদের বিরূপতাহেতু রাসনৃত্যের ও আদিরসেরও বৈরূপ্য ঘটিত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় নাই, কেননা বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন যে সেই কালজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর বয়সের অনুসরণ পূর্বক রাত্রিতে যুবতী গোপকন্যাদিগকে একত্র সমবেত করিয়া তাঁহাদের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। শুকদেবও গোপীদের রূপবর্ণনাপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে 'তারামণ্ডলী', (৩৩।৪৩), 'স্বর্ণময়মণি' (৩৩।৬) এবং 'বিদ্যুৎ'-এর (৩৩।৭) সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। সুতরাং জীবের সিদ্ধান্ত এই যে শ্রীকৃষ্ণ ঠাট্টা করিয়া গোপীদিগকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহাদের পুত্রেরা তাঁহাদিগকে খোঁজ করিতেছে। গোপীরা কৃষ্ণের একনিষ্ঠা প্রেমিকা, তাঁহাদের নিজপুত্র কল্পনা করিতে হইলে অনুমান করা প্রয়োজন যে পতিদের সঙ্গে তাঁহাদের দৈহিক সম্বন্ধ হইয়াছিল। এরূপ অনুমানে রসাভাস ঘটে। সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও জীব গোস্বামী বহুস্থলে প্রত্যক্ষভাবে ও আভাসে বলিয়াছেন যে গোপীদের সত্য সত্য বিবাহ হয় নাই। যোগমায়া বা পৌর্ণমাসী দেবী মায়াবলে লোকের মনে ভ্রম বা প্রতীতিমাত্র জন্মাইয়াছিলেন যে বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু যোগমায়াই এমন ঘটনা পরম্পরা সৃষ্টি করিয়াছিলেন যাহাতে গোপীদের সহিত পতিম্মন্য ঐসব ব্যক্তির সহবাস না ঘটিতে পারে।

গোস্বামীদের মতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গলাভের সেই ভাগ্য যাঁহাদের হইবে তাঁহারা হয় কুমারী হইবেন, নয়তো লৌকিক রীতিতে বিবাহিতা হইলেও তাঁহারা পতিম্মন্য ব্যক্তির দ্বারা অনুপভুক্ত হইবেন। রূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে পরকীয়ার সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন,—

রাগেনৈবার্পিতাত্মানো লোক-যুগ্মানপেক্ষিণা।
ধর্মেনাস্বীকৃতাযাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ ॥

যে সকল নায়িকা ঐহিক ও পারলৌকিক ধর্মকে গ্রাহ্য না করিয়া কেবলমাত্র আসক্তিবশতঃ পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করেন অথচ যাঁহাদিগকে বিবাহধর্ম অনুসারে স্বীকার করা হয় নাই, তাঁহাদিগকে পরকীয়া বলে।

ইহাতে কুমারী ও বিবাহিতা উভয়প্রকার নায়িকাকেই পরকীয়া বলা হইয়াছে। রূপ উপপতির সংজ্ঞাতেও এই দুই শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য লিখিয়াছেন,—যিনি পরকীয়া নায়িকার প্রয়োজনমূলক রাগে (আসক্তিতে) ধর্ম উল্লঙ্ঘন করেন এবং পরকীয়া অবলাগণের প্রেমের আশ্রয় হন, তিনিই উপপতি (১।১১)। সনাতন গোস্বামী ১০।৩৩।১৯ শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—গোপযোষিতো গোপ্য ইত্যর্থঃ, ততশ্চ কাশ্চিদ্‌বিবাহিতাঃ কাশ্চিৎ কন্যাশ্চেতি। যদ্বা, গোপানাং যোষিতো ভার্যাঃ, ততশ্চ কাশ্চিত্তেষাং পত্ন্য এব, কাশ্চিচ্চ কৃতকাত্যায়নীব্রতা ভগবদেকনিষ্ঠা অজাতবিবাহা অপি কথঞ্চিদ্ভগবন্মায়াদিনা সর্বৈ বিবাহমননাদ্ভার্যাত্বেন প্রতীতা ইতি জ্ঞেয়ম্'। রাসলীলায় যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা বিবাহিতা ছিলেন, কেহ বা কুমারী। এই কথা বলিয়া সনাতন গোস্বামী আবার একটি বৈকল্পিক ব্যাখ্যা দিতেছেন যে, কেহ কেহ গোপদের ভার্যাই ছিলেন কিন্তু কেহ কেহ কাত্যায়নীব্রতের সময় নন্দনন্দন আমাদের পতি হউন এই প্রার্থনা করায় ও তাঁহাদের ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা থাকায় তাঁহাদের সত্যকারের বিবাহ হয় নাই। ভগবানের মায়াপ্রভাবে সকলের নিকট বিবাহিতা ভার্যা বলিয়া তাঁহারা প্রতীত হইতেন মাত্র। সনাতন গোস্বামী ভাগবতের ১০।২৯।৩৯ শ্লোকের ব্যাখ্যায় গোপীরা কৃষ্ণের দাসী হইয়া সেবা করিবেন বাক্যের অর্থ করিয়াছেন,—'দাস্য এব ভবাম ঔপপত্যেনৈব ত্বাং ভজাম ইত্যর্থঃ'। বৃহদ্ভাগবতামৃতে তিনি পরকীয়াভাবের কথাই বলিয়াছেন, 'এইরূপ নিজ নিজ পতির পরাধীনত্বাদি দ্বারা নিভৃত-জারত্ব সিদ্ধ হইল। যেহেতু জারভাবে শ্রীকৃষ্ণভজনই তাঁহাদের পরম প্রেমসম্পত্তির চরমসীমা সম্পাদনকারী' (২।৭।১১৬)।

বৃহদ্ভাগবতামৃত হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় না যে শ্রীরাধিকার নিজ ভবন বলিতে শ্বশুরবাড়ী কি বাপের বাড়ী বোঝাইতেছে। শ্রীরূপ গোস্বামী বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটকে শ্রীরাধাকে তাঁহার শাশুড়ী জটিলার অধীনে অভিমন্যুর গৃহে বাস করার কথা লিখিয়াছেন। বিদগ্ধমাধবে আছে যে, রূপ জটিলার মুখ দিয়া বিশাখাকে ভর্ৎসনা করাইতেছেন,—বিশাখে তুমিই অতিশয় চঞ্চলা, তুমিই আমার ছেলের ঘর ভাঙ্গিলে, তুমি কেন যৌবনান্ধা গোপীদের মধ্যে আমার বধূটিকে লইয়া যাও' (ষষ্ঠ অঙ্ক)। রূপ জটিলাকে শ্রীকৃষ্ণের মাতৃমাতুলানী রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন (বিদগ্ধমাধব ২।৭৯)। রূপের গ্রন্থে কুটিলার নাম নাই, তবে জটিলার ভগিনীপুত্রী সারঙ্গীর চরিত্র আছে। সে বলিতেছে, আলো রাধে, আমার ভাই

অভিমন্যু চৈতন্যবৃক্ষের মূলে তোমাকে খুঁজিতেছে, কি জন্য তুমি সেখানে যাও নাই (৫ম অঙ্ক)। ললিতমাধবের প্রথমাঙ্কে রূপ গার্গীর মুখ দিয়া পৌর্ণমাসীকে বলাইয়াছেন,—'আর্যে! আপনিই অভিমন্যুর সহিত শ্রীরাধার উদ্বাহ করাইয়াছেন, তবে কেন চোর শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধার মিলন অভিলাষ করিতেছেন? ইহার উত্তরে পৌর্ণমাসী বলিলেন,—'পুত্রি! সে কেবল মায়ার বিবর্তমাত্র। তাহা না হইলে রাধা কি প্রকারে পৃথকজনের পাণিগ্রহণ করিতে পারেন? রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদ রাধিকাষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্রে (১২) রাধাকে 'জটিলাদৃষ্টিভীষিতা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতেও রাধা শ্বশুর বাড়ীতে বাস করিতেন।

রূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে লিখিয়াছেন যে প্রকৃত নায়কের পক্ষেই ঔপপত্য-ভাব ঘৃণিত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে উহা প্রযোজ্য নহে, কেননা মধুর রস আস্বাদনের জন্যই তাঁহার অবতার (১।১৬)। তিনি ভরতমুনির বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যে রতির জন্য ধর্ম ও সমাজের বহু নিবারণ, যে রতিতে প্রচ্ছন্ন কামুকতা এবং পরস্পরের দর্শন-স্পর্শন ও সম্ভাষণাদিতে দুর্লভতা থাকে তাহাকেই মন্মথ-সম্বন্ধীয় পরমা রতি কহে। এই ভাব লইয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন,—

ধর্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
এই সব রস নির্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সর্বভক্তেরে প্রসাদ॥ —চৈ. চ. ১।৪।২৮-২৯

নিজের স্ত্রীর সহিত মিলনে কোন প্রকার বাধা নাই, অনিশ্চয়তা নাই, কিন্তু পরকীয়ার সহিত মিলনে শতসহস্র বাধা। ধর্মের বাধা ছাড়িয়া দিলেও লোকসমাজের বাধা আছে। বাধার দরুণ মিলনের ইচ্ছা তীব্রতর হয় এবং যখন দৈববলে পরস্পরের মিলন ঘটে তখন যে আনন্দ হয় তাহা অতুলনীয়।

জীব গোস্বামী কিন্তু উজ্জ্বলনীলমণির ঐ শ্লোকের (১।১৬) টীকা লিখিতে যাইয়া স্বকীয়াবাদ স্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে নিত্যলীলায় পরকীয়াভাব হইতেই পারে না। প্রকটলীলায় রসবিশেষের পরিপোষণের জন্য ঔপপত্যের একটা প্রতীতিমাত্র হয়। তিনি অমরকোষ হইতে শৃঙ্গার শব্দের শুচি অর্থ গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন যে যেহেতু জারকে ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানে পাপপতি বলা হইয়াছে সেই হেতু অধর্মজনক ঔপপত্য শুচি ও উজ্জ্বলরসের অঙ্গস্বরূপ হইতে পারে না। রাস-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ঔপপত্যকে জুগুপ্সিত (২৯।২৬) বলিয়াছেন। পরীক্ষিৎ ঠিক এই শব্দটিই ব্যবহার করিয়াছেন (৩৩।২৮)। গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-দাম্পত্যের

সম্বন্ধ। এই কথার প্রমাণ উল্লেখ করিতে যাইয়া ব্রহ্মসংহিতার 'আনন্দ চিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভিঃ' ; গৌতমীয়তন্ত্রের 'অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা', রাস-পঞ্চাধ্যায়ের 'গোপীনাং তৎপতীনাধা সর্বেষাঞ্চৈব দেহিনাং' ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার মতে পাণ্ডব বলিতে যেমন কৌরবকেও বোঝায়, তেমনি লক্ষ্মী বলিতে গোপীও বোঝায় এবং লক্ষ্মীর যখন পরকীয়া সম্বন্ধ সম্ভব নহে তখন গোপীদেরও উহা সম্ভব নহে। প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণকে উপপতিবৎ প্রতীয়মান হয় বলিয়া উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে তাঁহাকে উপপতিবৎ বর্ণনা করা হইয়াছে।

জীবের মতে বহুবারণতা, প্রচ্ছন্ন কামুকতা ও পরস্পরসঙ্গমদুর্লভতা ইত্যাদি যে রতির উৎকর্ষতাজনক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহা কেবলমাত্র লৌকিক রসশাস্ত্র সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। জীব ললিতমাধব নাটক হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে রূপও স্বকীয়াবাদী। গার্গী পৌর্ণমাসীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা হইলে গোবর্ধনাদি গোপগণের সহিত চন্দ্রাবলী প্রভৃতির বিবাহও মায়াই নির্বাহ করিয়াছেন। পৌর্ণমাসী উত্তর দিলেন, 'তা নয়ত কি, পতিম্মন্য গোপদের গোপীদের প্রতি মমতা (আমার স্ত্রী এই বুদ্ধি) মাত্রই হইয়াছিল, অন্য কিছু নহে, কেননা তাঁহাদের দর্শন পাওয়াও ইঁহাদের পক্ষে দুর্ঘট ছিল'। এই সব যুক্তিপ্রমাণ দিবার পর শেষে জীব লিখিতেছেন,—

স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্রপরেচ্ছয়া।
যৎপূর্বাপরসম্বন্ধ তৎপূর্বমপরং পরম্ ॥

এই বিচার কিছুটা নিজের ইচ্ছায় কিছু বা পরের ইচ্ছায় লিখিত হইল। পূর্বাপর-সম্বন্ধযুক্ত অংশই নিজের ইচ্ছায় এবং এইরূপ সম্বন্ধশূন্য অংশ পরের ইচ্ছায় লিখিত হইল বুঝিতে হইবে। এই শ্লোকটি সকল পুঁথিতে পাওয়া যায় না বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে ইহা প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু বিশ্বনাথ চক্রবর্তী উজ্জ্বলনীলমণির আনন্দ-চন্দ্রিকা টীকায় জীবের উক্তমত খণ্ডন করিবার সময় ঐ শ্লোকটি জীবেরই রচনা বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী জীবের তিরোভাবের ৬০।৭০ বৎসরের মধ্যে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত (১৬৭৯ খৃষ্টাব্দ) রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং এত অল্পদিনের মধ্যে কেহ উহা লিখিয়া জীবের টীকার মধ্যে সন্নিবেশ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। পরকীয়াবাদীরা বলেন যে জীব ঐ শ্লোকে ইঙ্গিতে বলিয়াছেন যে তাঁহার স্বকীয়াপক্ষের যুক্তি পরের ইচ্ছায় লিখিত। কিন্তু একথা সত্য হইলে জীব গোপালচম্পুর পঞ্চদশ পূরণে একে একে নয়টি যুক্তি প্রমাণ দিয়া স্বকীয়াবাদের সমর্থন করিতেন না। তিনি বলেন (১) গোপালতাপনীতে দুর্বাসা বলিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তোমাদের স্বামী হইবেন (ভবতীতি)। (২) ভাগবতের ত্রিংশ অধ্যায়ে গোপীরা কৃষ্ণকে খুঁজিবার সময় নিজদিগকে কৃষ্ণবধূ,

কৃষ্ণের বধূ বলিয়াছেন (১০।৩০।২৬)। (৩) ভাগবতে গোপীরা কৃষ্ণকে স্বামীভাবে আর্যপুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন এখনও কি আর্যপুত্র মধুপুরীতে বিদ্যমান আছেন। (৪) গৌতমীয় তন্ত্রে 'গোপীজনবল্লভ' শব্দ আছে (বল্লভ মানে স্বামী)। (৫) কাশীখণ্ডে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে, 'গোপীপতে'। 'যদুপতে'। 'বাসুদেবসুনো'।। (৬) সঙ্গীতশাস্ত্রে 'গোপীপতিরনন্তোঽপি বংশধ্বনি-মশংসতি' বাক্য থাকায় কৃষ্ণ গোপীদের পতি। কিন্তু এখানে কোন্ সঙ্গীতশাস্ত্রের কথা জীব বলিতেছেন তাহা জানা যায় না। (৭) গীতগোবিন্দে 'পত্যুর্মনঃকীলিত' পতির মন শঙ্কাযুক্ত হইয়াছিল, এইরূপ লিখিত আছে। উহাতে আরও আছে, 'গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ'। (৮) শঙ্করাচার্যকৃত যমুনাস্তোত্রে আছে যে 'বিধেহি তস্য রাধিকাধবাঙ্ঘ্রিপঙ্কজে রতিং', সেই রাধিকাপতির পাদপদ্মে তুমি অনুরাগ বিধান কর। (৯) ললিতমাধব নাটকে রূপ স্ফুট করিয়া রাধিকাদির সহিত কৃষ্ণের বিবাহ বর্ণনা করিয়াছেন।

শেষোক্ত যুক্তিটির একটু বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ললিতমাধব নাটকে রাধাকে সত্যভামা ও চন্দ্রাবলীকে রুকিমণীরূপে দেখান হইয়াছে। নাটকের শেষে দশমাঙ্কে নন্দ, যশোদা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতির সমক্ষে নববৃন্দাবনে রাধার সহিত কৃষ্ণের বিবাহ দেওয়া হইয়াছে।

> বিনীতে রাধায়াঃ পরিণয়বিধানানুমতিভিঃ
> স্বয়ং দেব্যা তস্মিন্ পিতুরিহ নিবন্ধে মুদিতয়া।
> কুমারীণাং তাসাময়মুপনয়ন্ ষোড়শ কৃতী
> সহস্রানি স্মেরঃ প্রবিশতি শতাঢ্যানি গরুড়ঃ ॥—১০।৩১

চন্দ্রাবলী সানন্দে শ্রীরাধার বিবাহে অনুমতি দিয়া তাঁহার পিতা ভীষ্মকের পণ খণ্ডন করিলে কার্যকুশল গরুড় হাস্যবদনে ষোল হাজার একশত কুমারীগণ সঙ্গে লইয়া পর্বতবেদীতে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সমগ্র নাটকের শেষে বিন্ধ্যবাসিনী দেবী রাধাকে বলিলেন যে তোমরা সকলেই গোকুলেই ছিলে, কৃষ্ণও গোকুলেই আছেন, আমি কালযাপনের জন্য অন্যপ্রকার প্রপঞ্চিত করিয়াছি, ইহা নিশ্চয় জানিও। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত বিবাহাদি সমস্ত ব্যাপারই স্বপ্নের মত অলীক। এইজন্য ললিতমাধবের প্রমাণে রাধার স্বকীয়াত্ব স্থাপনের চেষ্টা সফল হয় নাই বলিতে হয়।

জীব গোপালচম্পূর উত্তর চম্পূর ৩৫ পূরণে দন্তবক্রবধের পর শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার পূর্বে ৩৩ পূরণের চতুর্থ শ্লোকে জীব লিখিয়াছেন যে একসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এককোটি গোপীর বিবাহ হইয়াছিল। ৩৩ হইতে ৩৫ পূরণ পর্যন্ত জীব অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে রাধামাধবের বিবাহ ও তাহার আনুষঙ্গিক

ব্যাপার প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে যেহেতু ৩৫।১৫০ শ্লোকে জীব বলিয়াছেন যে 'এই গ্রন্থে কেবল যে কার্যনির্বাহের মঙ্গলার্থে রাধামাধবের বিবাহ নিহিত হইয়াছে তাহা নহে, ইহাতে অনুরাগ নির্বাহও করিবে। সেই হেতু ইহার গূঢ় অর্থ হইতেছে যে বিবাহ অনুরাগের আকাঙ্ক্ষার পূরক নহে, সেইজন্য জীবের স্বকীয়াভাবের বর্ণনা 'খামখেয়ালী খেলা মাত্র' (সোনার গৌরাঙ্গ, ১৩৩৫, আশ্বিন, পৃঃ ১৫২)।

হরিদাস বাবাজীও গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে বলিয়াছেন যে বিবাহিত জীবনে রসের পরিপূর্ণতার অভাব প্রতিপাদনের জন্য জীব শেষে শ্রীরাধার দ্বারা সুপ্রসিদ্ধ 'যঃ কৌমারহরঃ' শ্লোক আবৃত্তি করাইয়াছেন ও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা উহাতে 'রেবারোধসি' স্থানে 'কৃষ্ণারোধসি' শব্দ বসাইয়াছেন। কিন্তু জীবের ন্যায় পণ্ডিত ও সাধক মনের ভাব একরকম (অর্থাৎ পরকীয়া) থাকিতে লোকের খাতিরে তাহা অন্য (অর্থাৎ স্বকীয়া) আকারে প্রকাশ করিবেন ইহা সম্ভব মনে হয় না।

জীব যেমন উগ্র স্বকীয়াবাদী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তেমনি উগ্র পরকীয়াবাদী। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর অনুমতিক্রমে স্বকীয়া ও পরকীয়া-বাদীদের মধ্যে এক বিরাট সভা বসিয়াছিল। পরকীয়াবাদীদের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুর। স্বকীয়াবাদীরা তর্কে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে যে জয়পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহা সংরক্ষিত আছে (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৬, চতুর্থ সংখ্যা)।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে জীব স্বকীয়াবাদের প্রমাণ খুঁজিবার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলেও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের কথা উল্লেখ করেন নাই। আজকাল যে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রচলিত আছে তাহার শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে একদিন নন্দ কৃষ্ণকে কোলে করিয়া ভাণ্ডীরবনে গোচারণ করিতেছিলেন এমন সময়ে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি ও বজ্রপাতের শব্দ হইতে লাগিল। নন্দ গরু সামলাইবেন কি ছেলেকে নিরাপদ করিবেন ভাবিয়া যখন আকুল হইতেছেন, সেই সময় সেখানে সহসা যুবতী রাধা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নন্দ কৃষ্ণকে রাধার কোলে দিয়া বলিলেন,—দেবী, গর্গমুখে শুনিয়াছি আপনি লক্ষ্মী হইতেও হরির অধিক প্রিয়া এবং এই শিশু মহাবিষ্ণু হইতেও শ্রেষ্ঠ। আপনি আপনার প্রাণনাথকে গ্রহণ করুন এবং মনোরথ পূর্ণ করিয়া আমার পুত্র আমাকে ফিরাইয়া দিবেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে কোলে করিয়া চুম্বন করিবার সময় রাসমণ্ডল স্মরণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় রাসমণ্ডলী সৃষ্ট হইল। শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে তাঁহারা উভয়ে একই। সেই সময় ব্রহ্মা আসিয়া হোমাগ্নি জ্বালিয়া বেদোক্ত মন্ত্রপাঠপূর্বক বিবাহবিধি অনুসারে কৃষ্ণের হাতে রাধিকাকে সম্প্রদান করিলেন। জীব গোপাল-

চম্পূতে লিখিয়াছেন যে রাধা কৃষ্ণের চেয়ে বয়সে এক বছরের ছোট (১৫।২০)। উহার সহিত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের বর্ণনার অবশ্য মিল নাই। কিন্তু জীবের সময়ে উক্ত পুরাণের ঐ অংশের যদি অস্তিত্ব থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি উহার উল্লেখ করিতেন। আমাদের সন্দেহ হয় যে কেহ জীবের পরবর্তীকালে ঐ অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই অনুমান সত্য হইলে বলিতে হয় যে গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের (মেঘৈর্মেদুরম্বরং ইত্যাদি) উপলক্ষিত ঘটনা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ হইতে লওয়া হয় নাই, বরং গীতগোবিন্দ দেখিয়াই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ঐ ঘটনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তবে জয়দেবের পূর্বে ঐ ধরনের একটি কাহিনী প্রচলিত ছিল, তাহা না হইলে তিনি এমন করিয়া উহার উল্লেখ করিতেন না।

পঞ্চম অধ্যায়

গোপাল ভট্ট গোস্বামী

ছয় গোস্বামীর মধ্যে গোপাল ভট্টের প্রকৃত পরিচয় নির্ণয় সবচেয়ে দুরূহ ব্যাপার। তাঁহার সম্পর্কে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রায় সম্পূর্ণ নীরব। এই নীরবতার বিষয়ে পরবর্তীকালে নরহরি চক্রবর্তী কিংবদন্তী সংগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন যে গোপাল ভট্ট কৃষ্ণদাস কবিরাজকে তাঁহার সম্পর্কে গ্রন্থমধ্যে কিছু লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাহৃষ্ট হইয়া।
বর্ণিলেন গ্রন্থ অনেকের আজ্ঞা লইয়া॥
শ্রীগোপাল ভট্ট হৃষ্ট হইয়া আজ্ঞা দিল।
গ্রন্থে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিল॥ —ভ. র. ১।২২১-২২২

যবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীরে।
আজ্ঞা মাগিলেন গ্রন্থ বর্ণিবার তরে॥
গোস্বামী হইয়া হৃষ্ট তাঁরে আজ্ঞা দিলা।
তাহে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিলা॥

—নরোত্তমবিলাস, ১ম বিলাস

ইহা প্রকৃতই সত্য কিনা তাহা বলা কঠিন। তবে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতের কয়েকস্থানে গোপাল ভট্টের কেবল নামোল্লেখ করা ছাড়া তাঁহার সম্পর্কে আর কিছু জানান নাই (চৈ. চ. ১।১।১৮, ১।৯।৩১, ১০, ১০৩, ২।১৮।৪)। গোবিন্দলীলামৃত কাব্যেও অন্য গোস্বামীদের বন্দনা করিলেও গোপাল ভট্টকে বন্দনা জানান নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছয় গোস্বামীর নিকট সান্নিধ্যে ছিলেন। গোপাল ভট্টের বিশদ পরিচয় দেওয়া একমাত্র তাঁহার পক্ষেই সম্ভব ছিল। কিন্তু তিনি প্রায় কিছুই না বলায় গোপাল ভট্টের যথার্থ পরিচয় আবিষ্কার করা সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

মুরারি গুপ্তের কড়চা হইতেই সর্বপ্রথম গোপাল ভট্ট সম্পর্কে সামান্য কিছু জানিতে পারা যায়। মুরারি গুপ্ত গোপাল ভট্টকে ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্র বলিয়াছেন এবং দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্যের ত্রিমল্ল ভট্টের গৃহে অবস্থান ও বালক গোপাল ভট্টকে কৃপাবিতরণের কথা বলিয়াছেন।

সুখাসীনঃ জগন্নাথং ত্রিমল্লাখ্যো দ্বিজোত্তমঃ।
স্ত্রীপুত্রস্বজনৈঃ সার্ধং সিষেবে প্রেমনির্ভরঃ ॥
গোপালনামা বালোঽস্য প্রভোঃ পার্শ্বেস্থিতস্তদা।
তং দৃষ্ট্বা তস্য শিরসি পাদপদ্মং দয়ার্দ্রধীঃ ॥
দত্ত্বা বদ হরিং চেতি সোঽপি হর্ষসমন্বিতঃ।
বাল্যক্রীড়াং পরিত্যজ্য কৃষ্ণং গায়ন্ ননর্ত চ ॥

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে কর্ণপুর এই অধ্যায় চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে অনুসরণ করেন নাই সুতরাং ইহা কতটা প্রামাণিক তাহা বলা দুষ্কর।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায় নবম পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে শ্রীচৈতন্যের বেঙ্কট ভট্ট নামক জনৈক শ্রীরঙ্গবাসী ব্রাহ্মণের গৃহে আতিথ্য গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে কিন্তু গোপাল ভট্টের কোন প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয় নাই। মধ্যলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সূত্রাকারে বলিবার সময় কিন্তু তিনি ত্রিমল্ল ভট্টের গৃহে শ্রীচৈতন্যের অবস্থানের কথা বলিয়াছেন। ইহার ফলে ত্রিমল্ল ভট্ট ও বেঙ্কট ভট্টের কে যে প্রকৃতই শ্রীচৈতন্যকে আতিথ্যদান করিয়াছিলেন তাহা জানা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এখানেও গোপাল ভট্ট সম্পর্কে কোন প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয় নাই। বৃন্দাবন দাস, লোচন, জয়ানন্দ প্রভৃতি অন্যান্য শ্রীচৈতন্যচরিতকারেরা কেহই গোপাল ভট্টের নাম করেন নাই। কবি কর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় গোপাল ভট্টের নাম করিয়াছেন বটে কিন্তু নাটকে ও মহাকাব্যে কিছুই বলেন নাই।

পরবর্তীকালে নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকরে, মনোহর দাসের অনুরাগবল্লীতে যদুনন্দন দাসের কর্ণানন্দে এবং নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাসে গোপাল ভট্টের স্বল্প কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রেমবিলাস ও যদুনন্দন দাসের কর্ণানন্দ প্রক্ষেপে পূর্ণ হওয়ায় উহাদের উক্তিতে নির্ভর করা চলে না। যদুনন্দন দাসের কর্ণানন্দের সংশিষ্ট এই অংশ যে অনুরাগবল্লী হইতে হুবহু নকল করা তাহা দেখান হইতেছে। অনুরাগবল্লীকার যে চুরি করেন নাই তাহা তাঁহার বর্ণনার ক্রমরক্ষা এবং প্রমাণ বাক্যাদি উদ্ধারে স্পষ্ট বোঝা যায়।

অনুরাগবল্লী—

মধ্যখণ্ডে দেখিহ নবম পরিচ্ছেদে।
দক্ষিণের তীর্থযাত্রা করিহ আস্বাদে ॥
সেই তীর্থে বৈসে তৈলঙ্গ বিপ্ররাজ।
শ্রীত্রিমল্ল ভট্ট নাম ব্রাহ্মণ সমাজ ॥

মধ্যাহ্ন স্নান করি প্রভু তার ঘরে আইলা।
গোষ্ঠীর সহিত দেখা প্রেমাবিষ্ট হইলা ॥

* * *

সেখানে সুখের সীমা পাইয়া রহিলা।
এই মতে চাতুর্ম্মাস্য ব্যতীত করিলা ॥
ত্রিমল্লের বালক গোপাল ভট্ট নাম।
নিষ্কপট হইয়া সেবা কৈল গৌরধাম ॥
তার পিতা সুচরিত্র তাঁহার জানিঞা।
পরিচর্যায় নিযুক্ত করিল তুষ্ট হঞা ॥
চারিমাস সেবা কৈল অশেষ প্রকার।
কহিল না হয় অতি তাহার বিস্তার ॥
গৌরকান্তি পাণ্ডিত্য বচন সুমধুর।
সর্বাঙ্গে সুন্দর বহে লাবণ্যের পুর ॥
মহাপ্রভুর মনোরথ জানিঞা জানিঞা।
না বুঝিতে করে কার্য আনন্দিত হঞা ॥
সেবার বৈদগ্ধী দেখি তুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে।
সগোষ্ঠী করিল কৃপা দাসদাসী সনে ॥ —১ম মঞ্জরী

কর্ণানন্দ—

মধ্যখণ্ডে দেখিহ নবম পরিচ্ছেদে।
দক্ষিণের তীর্থযাত্রা করিহ আস্বাদে ॥
সেই তীর্থে বৈসে তৈলঙ্গ বিপ্ররাজ।
শ্রীত্রিমল্লভট্ট নাম ব্রাহ্মণ সমাজ ॥
মধ্যাহ্ন স্নান করি প্রভু তার ঘরে আইলা।
গোষ্ঠীর সহিত দেখি প্রেমাবিষ্ট হইলা ॥

* * *

সেইখানে সুখের সীমা পাইয়া রহিলা।
এইমতে চাতুর্ম্মাস্য ব্যতীত হইলা ॥
বেঙ্কটের বালক শ্রীগোপাল ভট্ট নাম।
নিষ্কপট হৈয়া সেবা কৈল গৌরধাম ॥
তার পিতা সুচরিত্র তাহারে জানিয়া।
পরিচর্যায় নিযুক্ত কৈলা হৃষ্ট হইয়া ॥

চারিমাস সেবা কৈল অশেষ প্রকারে।
কহিলাম হয় অতি তাহার বিস্তারে ॥
গৌরকান্তি সুপাণ্ডিত্য বচন মধুর।
সর্বাঙ্গে সুন্দর বহে লাবণ্যের পুর ॥

* * *

মহাপ্রভুর মনোরথ মনেত জানিঞা।
না বলিতে করে কার্য আনন্দিত হইয়া ॥
সেবার বৈদগ্ধী দেখি প্রভু তুষ্ট মনে।
মোর মনের কার্য ইহ জানিল কেমনে ॥ —৫ম নির্যাস

দুই একটি শব্দের ভিন্নতা ছাড়া হুবহুই এক। অনুরাগবল্লীর 'ত্রিমল্লের বালক' স্থানে কর্ণানন্দে 'বেঙ্কটের বালক' লেখা হইয়াছে দেখা যাইতেছে।

নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকরে 'তথাপি প্রাচীনৈরুক্তং' বলিয়া একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন,—

বন্দে শ্রীভট্টগোপালং দ্বিজেন্দ্রং বেঙ্কটাত্মজং।
শ্রীচৈতন্যপ্রভোঃ সেবানিযুক্তঞ্চ নিজালয়ে ॥ —ভ. র. ১।৯৮

ইহা হইতে গোপাল ভট্ট বেঙ্কট ভট্টের পুত্র ছিল জানা যায়। নরহরি চক্রবর্তীও গোপাল ভট্টকে বেঙ্কটাত্মজ বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্বেঙ্কটভট্ট নন্দন মহাসদ্ভক্তিভূষাঢ্য হে।
সংসারময়মর্দন প্রণত হৃল্মোদপ্রদ ত্রাহি মাম্ ॥

মনোহর দাস অনুরাগবল্লীতে গোপাল ভট্টকে ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্র বলিয়াছেন।

ত্রিমল্লের বালক গোপাল ভট্ট নাম।
নিষ্কপট হৈয়া সেবা কৈল গৌরধাম ॥ —১ম মঞ্জরী

তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজের বক্তব্যের ত্রুটি সম্পর্কেও নির্দেশ করিয়াছেন।

মধ্যখণ্ডে মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে।
মধ্যলীলা সূত্রগণ বর্ণনা করিতে ॥
তার মধ্যে দক্ষিণ ভ্রমণ প্রকরণ।
তাহাতে প্রভুর রঙ্গক্ষেত্রকে গমন ॥
সেখানে ত্রিমল্ল ভট্টের ঘরে ভিক্ষা লইলা।
ভট্টের প্রার্থনামতে চাতুর্মাস্য কৈলা ॥
নবম পরিচ্ছেদে সেই সূত্র বিস্তারিল।
তাহে তার ছোট ভাই বেঙ্কট লিখিল ॥

ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্রাদি আত্মসাৎ পরিপাটি।
রহি গেল তেকারণে লিখনের ত্রুটি ॥—১ম মঞ্জরী

মুরারি গুপ্তের কড়চা এবং মনোহর দাসের অনুরাগবল্লী হইতে গোপালভট্ট ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্র ছিলেন, জানা যাইতেছে। এই দুই গ্রন্থ ভক্তিরত্নাকর অপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য বলিয়া গোপাল ভট্ট ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্র ছিলেন এই সিদ্ধান্ত লওয়া হইল।

জগদ্বন্ধু ভদ্র গৌরপদতরঙ্গিণীতে (পৃঃ ২৭) ভট্টমারি নামক গ্রামে গোপাল ভট্ট জন্মগ্রহণ করেন, এইরূপ বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ নিম্নোক্ত পদটী হইতে জগদ্বন্ধু ভদ্র এই ধারণা করেন।

দক্ষিণ দেশেতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
গৌরাঙ্গ যখন গেলা।
ভট্টমারি গ্রামে শ্রীগোপাল নামে
বেঙ্কটের পুত্র ছিলা ॥

* * *

শ্রীরাধারমণ করিলা স্থাপন
পুজা প্রকাশিলা তার।
এ বল্লভ দাস করি বড় আশ
দিয়াছে তোমারে ভার ॥

—গৌরগণ সংক্ষিপ্ত চরিতরত্নাবলী, পৃঃ ৭৯

তাঁহার এইরূপ মতকে পরবর্তীকালে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন প্রমুখ পণ্ডিতেরা অনুসরণ করিয়াছেন।[১] ভট্টমারি গ্রামের উল্লেখ কোনও বৈষ্ণবগ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভট্টমারি নামক একদল ভণ্ড সাধুসম্প্রদায়ের কথা বলিয়াছেন, তিনি ইহা গ্রাম বলিয়া উল্লেখ করেন নাই (চৈ. চ. ২।১।১০৩, ২।৯।২০৭-২১৬)।

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন তৎসম্পাদিত হরিভক্তিবিলাসের ভূমিকায় (পৃঃ ২) কাবেরী নদীর তীরস্থ বেলগুণ্ডি গ্রাম গোপাল ভট্টের জন্মস্থান বলিয়াছেন। তিনি বেদান্ত পরিভাষার রচয়িতা এবং ধর্মধ্বজাধারীর গুরু বেঙ্কট ভট্ট গোপাল ভট্টের পিতা ছিলেন, এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। অফ্রেত তাঁহার Catalogus

১ *Chaitanya and his Companions*, p. 111
The Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal, p. 57
বৃহৎ বৈষ্ণবচরিত অভিধান, পৃঃ ১২০

Catalogorum (Vol. I, p. 231)-এ পাঁচ ছয় জন বেঙ্কট ভট্টের পরিচয় দিয়াছেন। বেঙ্কট ভট্ট নামসাদৃশ্যে বেদান্ত পরিভাষার রচয়িতা বেঙ্কট ভট্টকে গোপাল ভট্টের পিতা বলা প্রমাণ ও যুক্তিহীন অনুমান মাত্র। ইহা গ্রহণ করা যায় না।

রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ শ্রীকৃষ্ণমাধুরী গ্রন্থে (পৃঃ ৩৩৬) বেঙ্কট নামক স্থানে গোপাল ভট্ট আবির্ভূত হন, এইরূপ বলিয়াছেন। তিনি কোন প্রমাণবলে ইহা বলিলেন তাহার কোন উল্লেখ নাই।

ত্রিমল্ল ভট্টের গৃহে থাকিয়া শ্রীচৈতন্য প্রতিদিন রঙ্গনাথের সেবা দেখিতেন (চৈ. চ. ২।৯)। ইহা দ্বারা অনুমান করা যায় যে ত্রিমল্ল ভট্ট রঙ্গনাথের মন্দিরের কাছাকাছি স্থানে বাস করিতেন। রঙ্গনাথের মন্দির শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে অবস্থিত। সুতরাং শ্রীরঙ্গক্ষেত্রেরই নিকটবর্তী কোন একটি স্থানে গোপাল ভট্ট আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন।

আবির্ভাব

গোপাল ভট্টের আবির্ভাব তারিখ বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়। হরিদাস দাস গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে (৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২০৮) এবং অচ্যুতকিরণ চৌধুরী শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামীর জীবনচরিত গ্রন্থে (পৃঃ ২) ১৫০০ খৃষ্টাব্দ, সতীশচন্দ্র মিত্র সপ্ত গোস্বামীতে (পৃঃ ২৬৪) ১৫০০ খৃষ্টাব্দ, শিবরতন মিত্র বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক গ্রন্থে (পৃঃ ১৭৩) ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দ, মধুসূদন তত্ত্ব-বাচস্পতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাসে (পৃঃ ১৬৯) ১৫০৩ খৃষ্টাব্দ, অমূল্যধন রায় ভট্ট বৃহৎ বৈষ্ণবচরিত অভিধানে (পৃঃ ১২০) ১৫০৩ খৃষ্টাব্দ গোপাল ভট্টের আবির্ভাবকাল ধরিয়াছেন। মোটামুটি ইঁহাদের প্রায় সকলেই আবির্ভাবকাল ১৫০০-১৫০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ধরিয়াছেন। মুরারি গুপ্তের কড়চা হইতে জানিতে পারা যায় শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে গোপাল ভট্ট বালক ছিলেন। উক্ত সময়ে গোপাল ভট্টের বয়স চৌদ্দ-ষোলোর বেশী ছিল না অনুমান করা যায়। কারণ চৌদ্দ-ষোল বৎসরের বেশী বয়সের বালকের ক্রীড়াকে 'বাল্যক্রীড়া' বলা সঙ্গত হয় না। শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্যে ১৫১০-১৫১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। উক্ত সময়ে গোপালভট্টের বয়স চৌদ্দ-ষোল বৎসর ছিল অনুমান করিলে তাঁহার আবির্ভাব ১৪৯৪-১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে হইলেও হইতে পারে কিন্তু ইহার খুব বেশী নিম্নে মুরারি গুপ্তের কড়চা অনুসারে হইতে পারে না।

বৃন্দাবনে গমন

শ্রীচৈতন্য বালক গোপাল ভট্টকে কৃপা করেন এবং পিতামাতার সেবাপরায়ণ থাকিয়া তাঁহাদের বিয়োগের পর বৃন্দাবনে যাইতে আদেশ করেন। পিতামাতার মৃত্যুর পর গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে গমন করেন।

গোপালের মাতাপিতা মহাভাগ্যবান।
শ্রীচৈতন্যপদে সঁপিল যে মনপ্রাণ ॥
বৃন্দাবন যাইতে পুত্ররে আজ্ঞা দিয়া।
দোঁহে সঙ্গোপন হৈলা প্রভু সঙরিয়া ॥
কতদিনে গোপাল গেলেন বৃন্দাবন।
রূপসনাতন সঙ্গে হইল মিলন ॥

—ভ. র. ১।১৬৩-১৬৫

শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের বেশ কিছুদিন পরে গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে গমন করেন এবং রূপ সনাতন তাঁহাকে অভ্যর্থিত করেন। তাহা ভক্তিরত্নাকর এবং অনুরাগ-বল্লী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জানা যাইতেছে।

আসিয়া পাইলা রূপ সনাতন সঙ্গ।
দুই রঘুনাথ সহ প্রেমার তরঙ্গ ॥

—অনুরাগবল্লী, ১ম মঞ্জরী

১৫১৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রূপ সনাতন বৃন্দাবনে স্থায়ী বসবাস করেন নাই, পূর্বে দেখাইয়াছি। সুতরাং গোপাল ভট্টকে রূপসনাতন অভ্যর্থনা করিয়া থাকিলে অন্ততঃ ১৫১৮ খৃষ্টাব্দের পরে গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন মনে করা যায়। গোপাল ভট্টের আগমনের কথা রূপসনাতন পত্রে শ্রীচৈতন্যকে জানান এবং শ্রীচৈতন্য গোপালের নিকট স্বীয় ডোর কৌপীন বহির্বাস ইত্যাদি পাঠান, এইরূপ কিংবদন্তীর কথা ভক্তিরত্নাকরে বলা হইয়াছে (প্রথম তরঙ্গ)। ইহা সত্য হইলে গোপাল ভট্ট ১৫১৮-১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে কোন এক সময়ে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন মনে করিতে হয়। কিন্তু অনুরাগবল্লীতে গোপাল ভট্ট যখন বৃন্দাবন গমন করেন তখন দুই রঘুনাথের সহিত সাক্ষাতের কথা বলা হইয়াছে। এই দুইজন রঘুনাথ নিশ্চয়ই রঘুনাথ দাস ও রঘুনাথ ভট্টকে উদ্দিষ্ট করিতেছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে জানা যায় যে শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পর রঘুনাথ দাস বৃন্দাবন গিয়াছিলেন। সুতরাং গোপাল ভট্টের সহিত শ্রীচৈতন্যের প্রকটাবস্থায় রঘুনাথ দাসের বৃন্দাবনে সাক্ষাৎ সম্ভব নহে। অনুরাগবল্লীর বিবরণ সত্য মনে করিলে ভক্তিরত্নাকরের কিংবদন্তীর মূল্য থাকে না। তাহা হইলে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের পরে গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন মনে করিতে হয়।

প্রবোধানন্দ ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী

গোপাল ভট্টের পিতৃব্য বলিয়া কথিত প্রবোধানন্দের পরিচয় আবিষ্কার করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তাহার উপর কেহ কেহ কাশীর মায়াবাদী পণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতীকেই প্রবোধানন্দ বলায় আরো জটিলতা বাড়িয়া গিয়াছে।[১]

হরিভক্তিবিলাসের মঙ্গলাচরণে গোপাল ভট্ট নিজেকে একজন প্রবোধানন্দের শিষ্য বলিয়াছেন।

> ভক্তেবিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধা-
> নন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
> গোপাল ভট্টো রঘুনাথ দাসং
> সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ ॥

সনাতন গোস্বামী ইহার টীকায় 'ভগবৎপ্রিয়স্য' শব্দের বহুব্রীহি ও তৎপুরুষ সমাস ধরিয়া ভগবান প্রিয় যাঁর এবং ভগবানের প্রিয় অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের প্রিয় এই দুই প্রকার অর্থের ইঙ্গিত দিয়াছেন।

এই প্রবোধানন্দ কে ছিলেন তাহা নির্ণয় করা এক দুরূহ ব্যাপার। মনোহর দাস অনুরাগবল্লীতে এবং নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকরে ইহাকে গোপাল ভট্টের পিতৃব্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

> বেঙ্কটের কনিষ্ঠ প্রবোধানন্দ নাম।
> গোপালচন্দ্রের পূর্বে গুরু সে প্রমাণ ॥
> অধ্যয়ন উপনয়ন যোগ্য আচরণে।
> পূর্বেতে সকল শিক্ষা পিতৃব্যের স্থানে ॥
>
> —অনুরাগবল্লী, ১ম মঞ্জরী

> কেহ কহে শ্রীপ্রবোধানন্দ যত্ন কৈল।
> অল্পকাল হইতে অধ্যয়ন করাইল ॥
> পিতৃব্যকৃপায় সর্বশাস্ত্রে হৈল জ্ঞান।
> গোপালের সম এথা নাই বিদ্যাবান্ ॥
>
> —ভ. র. ১।১৪৫-১৪৬

রাধাকৃষ্ণ দাস সাধনদীপিকাতে 'প্রাচীনৈঃ' বলিয়া যে একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন তাহাতেও গোপাল ভট্টকে প্রবোধানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র বলা হইয়াছে।

[১] অমিয় নিমাইচরিত (৫ম খণ্ড) পৃঃ ১১৪; প্রবোধানন্দ ও গোপাল ভট্ট, পৃঃ ৩; সাহিত্য প্রকাশিকা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৮; বৃন্দাবন কথা, পৃঃ ৭৬; সপ্তগোস্বামী, পৃঃ ৯৯

শ্রীমৎ প্রবোধানন্দস্য ভ্রাতুষ্পুত্রং কৃপালয়ম্।
শ্রীমদ্ গোপাল ভট্টং তনৌমি শ্রীব্রজবাসিনম্ ॥ —৮ম কক্ষা

কর্ণপূর কবিরাজকৃত একটি গোপাল ভট্টের অষ্টকে গোপাল ভট্টের নৃত্যগীতে পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

জিতবর গতির্ভঙ্গীনাট্যসঙ্গীতরঙ্গী।
তনুভৃত-জনু চিন্তানন্দবর্ধিসুধীশঃ ॥ —বরাহনগর পুঁথি নং ৩০

ইহা পিতৃব্যেরই শিক্ষার ফল হইতে পারে। ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায় যে প্রবোধানন্দও 'গীতবাদ্যনৃত্যে' অনুপম ছিলেন (প্রথম তরঙ্গ)। এখন চৈতন্য-চন্দ্রামৃত, বৃন্দাবনমহিমামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা একজন প্রবোধানন্দ সরস্বতীর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি চৈতন্যের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজ পুঁথিশালায় একটি গোপালতাপনী উপনিষদের টীকার পুঁথি আছে (পুঁথি নং ১৩২)। এই পুঁথির পুষ্পিকাতে আছে—ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রকাশিতায়াং গোপালতাপনীয়োপনিষদ টীকায়াং উত্তরভাগ-টীকা সমাপ্তা। জীব তাঁহার গোপালতাপনী টীকাতে প্রবোধ যতিকৃত একটি গোপাল-তাপনী টীকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কবি কর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকা হইতে এই পুঁথির টীকাকার প্রবোধানন্দ সরস্বতী ও জীব-উক্ত প্রবোধ যতি একই ব্যক্তি মনে হয়।

তুঙ্গবিদ্যা ব্রজে যাসীৎ সর্বশাস্ত্রবিশারদ।
সা প্রবোধানন্দ যতি র্গৌরোদ্গানসরস্বতী॥—গৌরগণোদ্দেশদীপিকা

প্রবোধানন্দ যতি ও সরস্বতী এই উভয় আখ্যায় ভূষিত ছিলেন মনে হয়। এখন এই টীকাকার প্রবোধানন্দ সরস্বতী ও চৈতন্যচন্দ্রামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে রচয়িতা প্রবোধা-নন্দ সরস্বতী একই ব্যক্তি কিনা এবং এই দুইজন একই হইলে গোপাল ভট্টের পিতৃব্য প্রবোধানন্দ হইতে পৃথক কিনা এরূপ প্রশ্ন জাগে।

'গৌরোদ্গান' শব্দে বিশেষিত করায় চৈতন্যচন্দ্রামৃত রচয়িতা প্রবোধানন্দ সরস্বতীকেই যে কবি কর্ণপুর উদ্দিষ্ট করিতেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। এবং ইনি যতিরূপে আখ্যাত থাকায় তাপনীটীকাকার প্রবোধানন্দের সহিত ইঁহাকে অভিন্ন মনে করা যায়। চৈতন্যচন্দ্রামৃত পাঠে জানা যায় যে প্রবোধানন্দ পূর্বে মায়াবাদী ছিলেন, পরে গৌরচন্দ্রের কৃপা পাইয়া গৌরপ্রেমসিন্ধুতে নিমজ্জিত হন।

তাবদ্‌ব্রহ্মকথা বিমুক্তিপদবীতাবন্নতিক্তীভবে-
ত্তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে নো লোকবেদস্থিতিঃ।
তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো নানা বহির্বর্ত্মসু
শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজপ্রিয়জনো যাবন্ন দৃগ্‌গোচরঃ ॥

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বলিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাওয়ার পরে তিনি সরস্বতী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী হইবেন ইহা কল্পনা করা কঠিন।[1] ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ হইতে মনে হয় 'সরস্বতী' এখানে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়বিশেষকে ইঙ্গিত করিতেছে না। নরহরি চক্রবর্তী বলিতেছেন,—

কেহ কহে প্রবোধানন্দের গুণ অতি।
সর্বত্র হইল যার খ্যাতি সরস্বতী ॥ —ভ. র. ১।১৪৯

পাণ্ডিত্য ও কবিত্বাদির জন্য তিনি সরস্বতী হিসাবে খ্যাত হইয়া থাকিবেন। দেবকী-নন্দনও তাঁহার বৈষ্ণববন্দনায় প্রবোধানন্দ সরস্বতীকে বন্দনা করিতে গিয়া সরস্বতী তাঁহার খ্যাতিসূচক উপাধি, বিশেষ এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন, মনে হয়।[2]

পরিবার পরিজনসহ ত্রিমল্ল ভট্টকে শ্রীচৈতন্য কৃপা করেন। প্রবোধানন্দ ত্রিমল্ল ভট্টের ভ্রাতা ছিলেন বলা হইয়াছে (অনুরাগবল্লী, ভক্তিরত্নাকর)। এই সময়ে তিনিও শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইয়া থাকিতে পারেন এবং তাঁহার পক্ষে শ্রীচৈতন্যের প্রতি অনুরক্ত হওয়া সম্ভবও বটে। হয়তো শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাতের পূর্বে তিনি মায়াবাদী ছিলেন। পরে একান্তে গৌরভক্ত হন। সুতরাং চৈতন্যচন্দ্রামৃতের প্রবোধা-নন্দ সরস্বতী গোপাল ভট্টের পিতৃব্য এই প্রবোধানন্দ হইতে অভিন্ন হইলেও হইতে পারেন। জীবের নামে যে বৈষ্ণববন্দনা পাওয়া যায় তাহাতে চৈতন্যচন্দ্রামৃত রচয়িতা প্রবোধানন্দ সরস্বতী ও গোপাল ভট্টের পিতৃব্য প্রবোধানন্দকে এক বলা হইয়াছে।

প্রবোধানন্দ সরস্বতীং বন্দে বিমলা যয়া মুদা।
চন্দ্রামৃতং রচিতং যৎ শিষ্যো গোপাল ভট্টঃ ॥

ইহা হইতেও মনে হয় যে ইঁহারা একই ব্যক্তি।

সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দকে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যকৃপায় প্রবোধানন্দ সরস্বতী হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বোধ হয় বাংলা ভক্তমালের উপর ভিত্তি করিয়া ইহা বলিয়াছেন।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী নাম তাঁর ছিল।
প্রভুই প্রবোধানন্দ বলিয়া রাখিল ॥ —ভক্তমাল, ২২শ মালা

ইঁহারা বলেন যে গোপাল ভট্টের পিতৃব্য এই প্রকাশানন্দ সরস্বতীই ছিলেন। তিনিই পরে গৌরকৃপায় প্রবোধানন্দ হন।

চৈতন্যচরিত গ্রন্থসমূহের উক্তিতে বিশ্বাস করিলে দেখা যাইবে যে গোপাল

১ চৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃঃ ১৭৪
২ দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনা ও বৈষ্ণবাভিধান, পৃঃ ৯

ভট্টের পিতৃব্য প্রবোধানন্দ ও কাশীর মায়াবাদী পণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতী কখনও এক হইতে পারেন না।

চৈতন্য ভাগবত মধ্যখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে আছে,—

এইরূপে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভক্তিসুখে ভাসে লই সর্ব অনুচর ॥

* * *

কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥

শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের কাল ১৫১০ খৃস্টাব্দ হইতে ১৫১২ খৃস্টাব্দ হয়। ইহার পূর্ব হইতেই নবদ্বীপে থাকিতে তিনি প্রকাশানন্দ সম্পর্কে পরিচিত ছিলেন দেখা যাইতেছে। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তিন ভ্রাতার সহিত সাক্ষাতের কথা ভক্তিরত্নাকর, অনুরাগবল্লীতে বর্ণিত হইয়াছে। প্রকাশানন্দ মায়াবাদী ছিলেন, পরে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গিয়া শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হইলেন মনে করিলে পুনরায় কাশীতে শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎকালে তাঁহাকে মায়াবাদী দেখিতে পাওয়া কখনই সম্ভব নহে এবং শ্রীচৈতন্যকে উপহাস করিতেছেন তাহাও ভাবা যায় না।

শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবক।
কেশবভারতী শিষ্য লোক প্রতারক ॥
চৈতন্য নাম তার ভাবকগণ লৈয়া।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া॥ —চৈ. চ. ২।৭।১১২-১১৩

কাশীতে শ্রীচৈতন্যের সহিত প্রকাশানন্দের যখন সাক্ষাৎ হয় তখন উভয়ে পরস্পরের নিকট যে অপরিচিত ছিলেন তাহা চৈতন্যচরিতামৃত হইতে প্রতিভাত হয়।

আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া।
বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া ॥
পুছিল তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কেশবভারতীর শিষ্য তাহে তুমি ধন্য ॥ —চৈ. চ. ১।৭।৬৩-৬৪

এই প্রকাশানন্দের সহিত শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকিলে তিনি দুই বছরের মধ্যে শ্রীচৈতন্যকে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন ইহা বিশ্বাস করা যায় না।

গোপাল ভট্ট ও রাধারমণ

শালগ্রাম মূর্তিকে বস্ত্রাদি ও আভরণাদিদ্বারা সজ্জিত করিতে পারেন না এই মনঃক্ষোভ গোপাল ভট্ট প্রকাশ করিলে শিলাবিগ্রহ স্বয়ং হস্তপদধারী বিগ্রহে পরিণত হন

এবং গোপাল ভট্ট তখন ইঁহার রাধারমণ নাম রাখেন, এইরূপ বিবরণ বাংলা ভক্তমাল গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। আর নরহরি চক্রবর্তী ও মনোহর দাস বলিয়াছেন যে রূপ গোবিন্দের স্বপ্নাদেশে রাধারমণের মূর্তি নির্মাণ করিয়া গোপাল ভট্টের উপর সেবাভার অর্পণ করেন।

শ্রীবিগ্রহের সেবা গোপালের ইচ্ছা হৈল।
শ্রীগোবিন্দ শ্রীরূপেরে স্বপ্নে আদেশিল॥
শ্রীরূপ গোস্বামী ভট্টে প্রাণসম জানে।
শ্রীরাধারমণ সেবা করাইলা তানে॥ —ভ. র. ১।১৯৯-২০০
নিজায়ত্ত সেবা করিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল।
বুঝি গোসাঞি গৌড় হইতে বস্ত আনাইল॥
এক কারিগর মাত্র উপলক্ষ্য করি।
মনের আকুতি মনে বিচার আচরি॥
গোপাল ভট্ট গোসাঞির জানি অভিলাষ।
স্বহস্তে শ্রীরূপ গোসাঞি করিল প্রকাশ॥
সগণ উৎসব করি অভিষেক কৈল।
শ্রীরাধারমণ নাম প্রকট করিল॥ —অনুরাগবল্লী, ১ম মঞ্জরী

রাধাকৃষ্ণ দাসও তাঁহার সাধনদীপিকাগ্রন্থে রূপ কর্তৃক বিগ্রহ নির্মাণের কথা বলিয়াছেন,—

গোবিন্দ পাদসর্বস্বং বন্দে গোপাল ভট্টকম্।
শ্রীমদ্‌রূপাজ্ঞয়া যেন পৃথক্ সেবা প্রকাশিতা॥
শ্রীরাধারমণো দেবঃ সেবায়া বিষয়ো মতঃ।
কৃতিনা শ্রীলরূপেণ সোঽয়ং যোঽসৌ বিনির্মিতঃ॥ —অষ্টম কক্ষা

সনাতন বৃহদ্ভাগবতামৃতের দিগ্‌দর্শিনী টীকার মঙ্গলাচরণে রাধারমণকে বন্দনা জানাইয়াছেন,—

ভক্তির্যা নিখিলার্থবর্গজননী যা ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতে-
রানন্দাতিশয়প্রদা বিষয়জাৎ সৌখ্যাৎ বিমুক্তি র্যয়া।
শ্রীরাধারমণং পদাম্বুজযুগং যস্যা মহানাশ্রয়ো
যা কার্যা ব্রজলোকবদ্‌গুরুতর প্রেম্নৈব তস্যৈ নমঃ॥

বৃহদ্ভাগবতামৃত ও দিগ্‌দর্শিনী টীকা শ্রীচৈতন্যের প্রকটাবস্থায় রচিত, পূর্বেই দেখাইয়াছি। যদি ঐ গ্রন্থে রাধারমণ শব্দ সাধারণ অর্থে প্রযুক্ত না হইয়া গোপাল ভট্ট প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহকে লক্ষ্য করিয়া থাকে তাহা হইলে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীরাধারমণ বিগ্রহ প্রকট হইয়াছিলেন মনে করা যায়।

তিরোভাব

বিভিন্ন লেখকের প্রদত্ত তারিখগুলি বিশ্লেষণ করিলে গোপাল ভট্টের তিরোভাবকাল সম্পর্কে প্রধানতঃ দুইটি মত পাওয়া যায়।[১] একটি ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দ ও অপরটি ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দ।[২] সতীশচন্দ্র মিত্র সপ্ত গোস্বামী গ্রন্থে (পৃঃ ২৫৮) ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দ তিরোভাব কাল ধরিয়াছেন।

ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ হইতে জানা যায় শ্রীনিবাস যখন দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গমন করেন, তখন গোপাল ভট্টের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীভূগর্ভ, লোকনাথ।
শ্রীজীব গোস্বামী আদি প্রিয়বর্গ সাথ॥
অকস্মাৎ শ্রীনিবাস দেখিয়া সকলে।
স্নেহাবেশে ধরি করিলেন সব কোলে॥—ভ. র. ৯।৮৩-৮৪

শ্রীনিবাসের এই দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গমনকালে ও অবস্থানের সময় জীব তাঁহাকে গোপালচম্পূ গ্রন্থ আরম্ভ শোনান, এইরূপ কিংবদন্তী ভক্তিরত্নাকরে প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থারম্ভ শুনাইলা।
আর যে যে গ্রন্থ কৈল তাহা দেখাইলা॥
আচার্যের হইল অতি আনন্দ অন্তর।
গোস্বামীর গ্রন্থচর্চা করে নিরন্তর॥—ভ. র. ৯।১০৭-১০৮

এই গ্রন্থারম্ভ শোনা সত্য বলিয়াই মনে হয়। জীব শ্রীনিবাসকে যে দুইটি পত্র দেন তাহাতে গোপালচম্পূর প্রসঙ্গ বর্ণনা হইতে মনে হয় শ্রীনিবাস গোপালচম্পূর আরম্ভ কালে বৃন্দাবনে উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব গোপালচম্পূ ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। আরম্ভ ইহার দুই এক বৎসর পূর্বে হইয়া থাকিবে। ঐ সময়ে শ্রীনিবাসের সহিত গোপাল ভট্টও জীবিত ছিলেন অনুমান করা যায়।

গোপাল ভট্টের রচিত গ্রন্থাবলী

হরিভক্তিবিলাস—হরিভক্তিবিলাস সনাতনের লেখা বলিয়া জীব ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিলেও ইহা যে গোপাল ভট্টের লেখা হইতে পারে তাহা পূর্বে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যদি হরিভক্তিবিলাস গোপাল ভট্টের রচনা না হয় তাহা হইলে গোপাল ভট্টের অবিসংবাদিত রচনা লুপ্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু কর্ণপূর

১ বৃহৎ বৈষ্ণবচরিত অভিধান, পৃঃ ১২০; গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ২৭; সজ্জনতোষণী, ২য় বর্ষ, পৃঃ ২৫

২ বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শিনী, পৃঃ ১১২, গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২০৮

কবিরাজ লিখিতেছেন যে শ্রীনিবাস বৃন্দাবন হইতে গ্রন্থরাজি আনিবার সময় রূপসনাতন, জীব, রঘুনাথ দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং গোপাল ভট্টের গ্রন্থ আনিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয় শ্রীনিবাসের শিষ্য গোপাল ভট্টের গ্রন্থ বলিতে হরিভক্তিবিলাসকেই বুঝিয়াছেন। খুব সম্ভব হরিভক্তিবিলাসের প্রধান প্রধান কথা সনাতন গোস্বামী লিপিবদ্ধ করিয়া গোপাল ভট্টকে তাহা বিস্তার করিবার ভার দিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকর্ণামৃত টীকা—হরিভক্তিবিলাস ছাড়া 'কৃষ্ণবল্লভা' নামে কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের একটি টীকা গোপাল ভট্টের রচিত বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়।

করিলেন কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্পনী।
বৈষ্ণবের পরমানন্দ যাহা শুনি ॥ —ভ. র ১।২২৮

'শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীপাদানাং শ্রীভাগবতসন্দর্ভ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত টীকাদি' (সাধন-দীপিকা, অষ্টম কক্ষা)।

মনোহর দাস অনুরাগবল্লীতে বিস্তৃত বিবরণসহকারে এবং উক্ত টীকা হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া ইহা গোপাল ভট্টের লেখা জানাইয়াছেন।

শ্রীভট্ট গোসাঞি কর্ণামৃতের টীকা কৈল।
অশেষ বিশেষ ব্যাখ্যা তাহাতে লিখিল॥
যাহার দর্শনে ভক্ত পণ্ডিতে চমৎকার।
রস পরিপাটি যাতে সিদ্ধান্তের সার॥

তথাহি শ্লোকৌ—

চূড়াচুম্বিতচারুচন্দ্রকচমৎকার ব্রজভাজিতং
দীব্যন্মঞ্জুমরন্দ পঙ্কজমুখভ্রূনৃত্যদিন্দিবরম্।
রজ্যদ্বেণু সুমুন্নরোকবিলসদ্রবিম্বাধরোষ্ঠং মহঃ।
শ্রীবৃন্দাবনকুঞ্জকেলিললিতং রাধাপ্রিয়ং প্রীণয়ে॥
কৃষ্ণকর্ণামৃতস্যৈতাং টীকাং শ্রীকৃষ্ণবল্লভাম্।
গোপাল ভট্টঃ কুরুতে দ্রাবিড়াবনিনির্জরঃ॥

প্রথম শ্লোকটি কৃষ্ণবন্দনা। দ্বিতীয় শ্লোক গ্রন্থকারের পরিচয়। প্রাপ্ত কৃষ্ণবল্লভার সমস্ত পুঁথিতে এই দুইটি শ্লোক অবিকল পাওয়া যায়।[১]

[১] *Catalogue of Skt. Mss. in the Benares Sanskrit College Library*, p. 319, No. 42
Catalogue of Printed Book and Mss. in the Oriental Library (*Asiatic Society*) by K. V. Kavyatirtha III. C. 107, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুঁথি নং ২৮০

ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্টও দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ছিলেন। মনোহর দাসের বিবৃতির সহিত সম্পূর্ণ মিলও দেখা গিয়াছিল কিন্তু প্রদত্ত আত্মপরিচয় এবং পুষ্পিকা হইতে জটিলতা দেখা দিয়াছে। আত্মপরিচয় ও পুষ্পিকা নিম্নোক্তরূপ।

আত্মপরিচয়—

শ্রীমদ্দ্রাবিড়নীরদম্বুধিবিধুঃ শ্রীমান্নৃসিংহোঽভবদ্
ভট্টঃ শ্রীহরিবংশ উত্তমগুণগ্রামৈকভূস্তৎসুতঃ।
তৎপুত্রস্য কৃতিস্ত্বিয়ং বিতনুতাং গোপালনাম্নোমুদং
গোপীনাথপদারবিন্দমকরন্দানন্দিচেতোঽলিনঃ ॥

পুষ্পিকা ঃ ইতি শ্রীদ্রাবিড়হরিবংশভট্টৈকচরণশরণ-গোপাল-ভট্টবিরচিতা শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত টীকা শ্রীকৃষ্ণবল্লভা সমাপ্তা।

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে কৃষ্ণবল্লভা টীকাকার দ্রাবিড়বাসী হরিবংশ ভট্টের পুত্র ও নৃসিংহ ভট্টের প্রপৌত্র। এই বিষয়ে ডঃ সুশীলকুমার দে সর্বপ্রথম বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

হরিভক্তিবিলাসকার গোপাল ভট্টের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। মুরারি গুপ্তের কড়চা ও অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থে তাঁহাকে রঙ্গক্ষেত্র নিবাসী ত্রিমল্ল ভট্টের কিংবা বেঙ্কট ভট্টের পুত্র বলা হইয়াছে। মনোহর দাস ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্র গোপাল ভট্টের নামে এই গ্রন্থারোপ করিয়া জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছেন। মনে হয়, মনোহর দাস পুঁথির আদিস্থিত প্রথম দুইটি শ্লোক দেখিয়া ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। পুঁথির অন্ত্যে প্রদত্ত আত্মপরিচয় ও পুষ্পিকাদি তিনি বোধ হয় লক্ষ্য করেন নাই। তাই গোপাল ভট্ট নাম ও দ্রাবিড় নিবাসী দেখিয়া তিনি ইঁহাকে ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্ট ভাবিয়াছেন।

এই টীকাতে শ্রীচৈতন্যদেবের নমস্ক্রিয়া নাই। তবে দাক্ষিণাত্য পাঠের পরিবর্তে বঙ্গীয় পাঠ গৃহীত হইয়াছে এবং শ্রীমদ্ভাগবত, ভাবার্থদীপিকা, উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পদ্যাবলী, জগন্নাথবল্লভ নাটক প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের গ্রন্থ হইতে নামোল্লেখপূর্বক প্রমাণবচনাদি উদ্ধৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃষ্ণকর্ণামৃতের একটি সারঙ্গরঙ্গদা টীকা লিখিয়াছেন। ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্ট কৃষ্ণবল্লভা টীকা লিখিয়া থাকিলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহার উল্লেখ করিতেন।

গোপাল ভট্টের শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্যের কন্যার শিষ্য যদুনন্দন দাস কৃষ্ণকর্ণামৃতের অনুবাদ করেন। তিনি কেবলমাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজের টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। গোপালভট্টের টীকা থাকিলে তিনি ইহার উল্লেখ করিতেন বলিয়া মনে হয়।

ডঃ সুশীলকুমার দে কৃষ্ণকর্ণামৃতের আরও একটি টীকাকারের পরিচয়

দিয়াছেন।[১] ইঁহারও নাম গোপাল ভট্ট, তবে তিনি পূর্বোক্ত দুই গোপাল ভট্ট হইতে পৃথক ব্যক্তি। টীকার নাম শ্রবণাহ্লাদিনী। হরিবংশ ভট্টের পুত্র ও কৃষ্ণবল্লভা টীকা রচয়িতা গোপাল ভট্টের নামে আরও কয়েকটি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়। ভানু দত্তের রসমঞ্জরী গ্রন্থের 'রসিকরঞ্জনী' নামে একটি টীকা ইনি করেন। এই টীকার দ্বিতীয় শ্লোকের পরিচয়ে তিনি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলা হইয়াছে। পুষ্পিকা কৃষ্ণবল্লভার পুষ্পিকার অনুরূপ—ইতি শ্রীহরিবংশ ভট্টৈকচরণশরণ গোপালভট্টকৃতা রসমঞ্জরী টীকা রসিকরঞ্জনী সমাপ্তা।[২] রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই হরিবংশের পুত্র গোপাল ভট্টের নামে একটি সময়কৌমুদী বা কালকৌমুদী গ্রন্থের বিবরণ দিয়াছেন।[৩] ইহার প্রারম্ভ শ্লোক কৃষ্ণবল্লভা ও রসিকরঞ্জনীর দ্বিতীয় শ্লোকের অনুরূপ এবং পুষ্পিকাও একই। সংস্কৃত গদ্যে ও পদ্যে লিখিত এই গ্রন্থে নিত্যনৈমিত্তিক সদাচার, দীক্ষা, জন্মাষ্টমী ব্রত প্রভৃতি এবং শ্রীমূর্তি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার শুভকাল নির্ধারিত রহিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে মনে হয়, হরিবংশ ভট্টের পুত্র গোপাল ভট্ট ও ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্ট দুইজনে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি। এই দুইজন যদি একই ব্যক্তি হইতেন তাহা হইলে কোনও না কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে তাঁহার এতগুলি রচিত গ্রন্থাদির একটি তালিকা পাওয়া যাইত।

ষট্ সন্দর্ভের কারিকা—গোপাল ভট্ট রূপসনাতনের মুখে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের বিচারাদি শ্রবণ করিয়া তাহা একটি সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এই কথা জীবকৃত ষট্ সন্দর্ভের উপক্রম হইতে পাওয়া যায়। জীব প্রতিটি সন্দর্ভের উপক্রমে বলিয়াছেন,—

তৌ সন্তোষয়তা সন্তৌ শ্রীলরূপসনাতনৌ।
দাক্ষিণাত্যেন ভট্টেন পুনরেতদ্বিবিচ্যতে॥
তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্তব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতম্।
পর্যালোচ্যার্থ পর্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ॥

তত্ত্বসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণের চতুর্থ শ্লোকে গোপাল ভট্টের নামের সহিত মাধবাচার্য-পাদের নামও ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

কোঽপিতদ্বান্ধবো ভট্টো দক্ষিণদ্বিজবংশজঃ।
বিবিচ্য ব্যলিখদ্ গ্রন্থং লিখিতাদ্-বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ॥

[১] নানা নিবন্ধ, পৃঃ ৮৫
[২] Mitra—*Notices of Skt. Mss.* Vol. IV, p. 294, No. 1712
[৩] Do—*Notices of Skt. Mss.* Vol. VII, p. 254, No. 2501

বলদেব বিদ্যাভূষণ তত্ত্বসন্দর্ভের টীকায় লিখিয়াছেন,—

তয়োঃ রূপসনাতনয়োর্বন্ধুঃ গোপালভট্টঃ ইত্যর্থঃ।
বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ শ্রীমধ্বাদিভির্লিখিতাদ্ গ্রন্থাৎ॥

পদ্যাবলীতে শ্রীরূপ ভট্টপাদানাং নামে একটি শ্লোক ধৃত করিয়াছেন,—

ভাণ্ডীরেশ শিখণ্ডমণ্ডনবরশ্রীখণ্ড লিপ্তাঙ্গ হে
বৃন্দারণ্যপুরন্দর স্ফুরদমন্দেন্দীবরশ্যামল।
কালিন্দীপ্রিয় নন্দনন্দন পরানন্দারবিন্দেক্ষণ
শ্রীগোবিন্দ মুকুন্দসন্দরতনো মাং দীনমানন্দয়॥

শ্লোক নং ৩৮, ডঃ সুশীল কুমার দে সং

বহরমপুর সংস্করণে টীকাকার বীরচন্দ্র গোস্বামী ইহা গোপাল ভট্টের বলিতেছেন। শ্রীগোপাল ভট্টানাং পদ্যেন ব্রজবাসিজনপ্রিয়নামানি নির্দিশন্নাহ ভাণ্ডীরেশেতি। ইহা গোপাল ভট্টের হইলেও হইতে পারে।

গোপাল ভট্টের নামে আরোপিত গ্রন্থ ও স্তবাদি

সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা—সৎক্রিয়াসারদীপিকা গ্রন্থখানি গোপাল ভট্টের নামে সজ্জনতোষণী পত্রিকার ১৫-১৭শ খণ্ডে মুদ্রিত হয়। কথিত আছে, সজ্জন-তোষণী সম্পাদক কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ বৃন্দাবন হইতে সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকার প্রাচীন পুঁথির অনুলিপি আনেন এবং তাহা অবলম্বনে সৎক্রিয়াসারদীপিকা মুদ্রিত করেন। সংস্কারদীপিকা তিনি মুদ্রিত করেন নাই। পরে সংস্কারদীপিকা সমেত সৎক্রিয়াসারদীপিকা গৌড়ীয় মাধ্ব মঠ হইতে ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়।

প্রথম পুস্তকের পুঁথির বিবরণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর Notices of Skt. Mss. (2nd Series, Vol. I No. 397, Vol. II pp. 209-10)-এ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পুস্তকের কোনরূপ পুঁথি এখনও পাওয়া যায় নাই।

গ্রন্থটির প্রথমটিতে হরিভক্তিবিলাসে অপ্রদত্ত বিবাহাদি চতুর্দশ সংস্কারের বিবরণ আছে এবং দ্বিতীয়টিতে 'বেশাশ্রয়বিধির' কথা আছে।

আরম্ভ এইরূপ ঃ প্রণম্য সচ্চিদানন্দ জগতাং সেব্যমীশ্বরং
শ্রীকৃষ্ণং পরমানন্দমনন্যাভীষ্টদায়কং॥
ব্যক্তিগৃহী দ্বিজাদীনামনন্যানাং বিশেষতঃ।
পদ্ধতিং তাং বিবাহাদেঃ সৎক্রিয়াসারদীপিকাং॥
শ্রীমদ্‌গোপালভট্টোজয়ং সাধনামাক্তয়াভৃশং
ভগবদ্ধর্মরক্ষার্থং ভক্তানাং বৈদিকী তু যা॥

অন্ত্য ঃ সংস্কারদীপিকানাম্নী সন্ন্যাসার্থং সতাং মতা।
নির্মিতা গৌরদাসানামেকান্তধর্মসিদ্ধয়ে॥

পুষ্পিকা ঃ ইতি শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীকৃতা সৎক্রিয়াসারদীপিকান্তর্গতা সংস্কার-দীপিকা সমাপ্তা।

গোপাল ভট্টের পক্ষে নিজেকে কখনও 'গৌরদাস' বলা সম্ভব নহে। তদুপরি জয়পুর এবং বৃন্দাবনে রক্ষিত চার-পাঁচখানি পুঁথিতে গোপাল ভট্টের বন্দনা রহিয়াছে।

শ্রীলসনাতনরূপৌ শ্রীভট্টরঘুনাথকং।
ভট্টগোপালসংজ্ঞং শ্রীজীবাখ্যং রঘুনাথকং॥

গোপালভট্ট নিজকৃত গ্রন্থে কখনও নিজেকে বন্দনা করিতে পারেন না। এই গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে অর্বাচীনকালে কেহ রচনা করিয়া গোপালভট্ট গোস্বামীর নামে চালাইয়া দিয়াছেন। India Office Cat. (Vol. VII, p. 1470, No. 3897-99)-এ নামহীন একটি গ্রন্থ গোপাল ভট্টের নামে আরোপিত হইয়াছে। ইহা গদ্য ও পদ্যে লিখিত এবং চারিটি অধ্যায়যুক্ত। (১) বসনচৌরকেলি, (২) ভারখণ্ড, (৩) পার-খণ্ড ও (৪) দানখণ্ড এই চারিটি ভাগে ইহাতে কৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে 'দানখণ্ড' নামে একটি পুঁথি গোপাল ভট্টে আরোপিত দেখা যায়। (পুঁথি নং ৪২৭)।

আরম্ভ এইরূপ ঃ যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুত স্তন্বতি দিব্যৈস্তরেবেদৈ
সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তীয়ং সামগা।
ধ্যানাস্থিততদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাদেবায় তস্মৈ নমঃ॥

অন্ত্য এইরূপ ঃ ততস্তত্র গণেসখিভিঃ সুরতমথভূয়নিজভবনং জগাম। রাধা সখিভিঃ সহ মথুরাণাং গতবতী। ইতি গোপাল ভট্ট বিরচিতদানখণ্ডঃ সমাপ্তঃ।

কেবলমাত্র দানখণ্ড বলা হইলেও ইহাতে বস্ত্রহরণ খণ্ড, নৌকাখণ্ড এবং ভার খণ্ড আরও এই তিনটি খণ্ড রহিয়াছে।

পদকল্পতরুতে দুইটি পদ গোপাল ভট্টের নামে পাওয়া যায। (পদসংখ্যা ১০৮৮ ও ২৮৩৩)।

১

দেখরি সখি কণ্ডল নয়ন
কুঞ্জমে বিরাজ হেঁ॥
বামেতে কিশোরি গোরি।
আলস অঙ্গ অতি বিজোরি॥

হেরি শ্যামবয়ন চন্দ।
মন্দ মন্দ হাঁস হেঁ॥

* * *

শ্রীগোপালভট্ট আশ
বৃন্দাবন কুঞ্জে বাস।
শয়ন স্বপন নয়ন হেরি
ভুলল মন আপ হেঁ।

—পদকল্পতরু, ২য় খণ্ড

২

বৃষভানু নন্দিনিতে মন-মোহন
কেমন লাগি বসি।
পান খাওত পিক গীমতে ঢরকত
ঝলক যেও যাবক সিসি॥

* * *

শাঙর চীত উনতে লাগিও
পলকন নারে আঁখি।
যূথযূথ মনমথ ঝুলত
গোপাল ভট্ট ইথে সাখি।—পদকল্পতরু, ৪র্থ খণ্ড

পূর্বাশ্রমে দাক্ষিণাত্যবাসী পরে বৃন্দাবনবাসী গোপাল ভট্ট বাঙ্গালা ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন।

হরিভক্তিবিলাস ও বাংলার বৈষ্ণব সমাজ

হরিভক্তিবিলাস বৈষ্ণবস্মৃতির নিবন্ধ গ্রন্থ। ইহাতে বৈষ্ণবদিগের নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ, মন্দির সংস্কার, মূর্তিগঠন, মূর্তিপ্রতিষ্ঠা, ব্রতপার্বণ প্রভৃতি ধর্মাধর্মের বিধিনিষেধ আলোচিত হইয়াছে। সংকলক গোপাল ভট্ট প্রত্যেক বিধিনিষেধের প্রমাণস্বরূপ বহুসংখ্যক স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রশাস্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি হরিভক্তিবিলাস রচনাকালে যে সমস্ত স্মৃতিগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে অধিকাংশই প্রাচীন স্মৃতি গ্রন্থ (অত্রি স্মৃতি, কাত্যায়ন স্মৃতি, নারদ স্মৃতি, মনু স্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ইত্যাদি)। বিভিন্ন মুনিঋষিদের নামে প্রচলিত এই স্মৃতিগ্রন্থগুলি কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহা বলা দুষ্কর। অর্বাচীনকালে লিখিত একমাত্র শ্রীধর রচিত স্মৃত্যর্থসার গ্রন্থের উল্লেখ হরিভক্তিবিলাসে (১১৯৫, ৬১৪৬, ৯১২৪৩) পাওয়া যায়। শ্রীধর দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ

ছিলেন।[১] গোপাল ভট্ট হেমাদ্রির 'চতুর্বর্গচিন্তামণি'-র সহিতও পরিচিত ছিলেন মনে হয়। হেমাদ্রি চতুর্বর্গচিন্তামণিতে তিলস্নান, তৈলস্নান, দন্তধাবন প্রভৃতি আচার অনুষ্ঠানে যে সব গ্রন্থের যে যে স্থান হইতে প্রমাণবচন উদ্ধার করিয়াছেন, গোপাল ভট্টও অনুরূপভাবে ঐ সব বিষয়ে প্রমাণবচন উদ্ধার করিয়াছেন। বৃন্দাবনের এই গোস্বামীদের মধ্যে যে উক্ত গ্রন্থ পরিচিত ছিল তাহা জীব গোস্বামীর সন্দর্ভে উল্লেখ হইতে বোঝা যাইতেছে। (তত্ত্বসন্দর্ভ পৃঃ ৪৩, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং, ক্রমসন্দর্ভ ১১।২।১৫)।

গোপাল ভট্টের হরিভক্তিবিলাস রচনার পূর্বে অনেকগুলি স্মৃতিনিবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে লক্ষ্মীধরের কৃত্যকল্পতরু (দ্বাদশ শতাব্দী), জীমূতবাহনের কালবিবেক (দ্বাদশ শতাব্দী), হেমাদ্রির চতুর্বর্গচিন্তামণি (ত্রয়োদশ শতাব্দী), চণ্ডেশ্বরের কৃত্যরত্নাকর (চতুর্দশ শতাব্দী), শূলপাণির স্মৃতিবিবেক (পঞ্চদশ শতাব্দী), রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের স্মৃতিতত্ত্ব (ষোড়শ শতাব্দী) উল্লেখযোগ্য। রঘুনন্দন-এর স্মৃতিতত্ত্ব হরিভক্তিবিলাসের পূর্বে লিখিত কিনা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। এই উল্লেখযোগ্য স্মৃতিকারদের মধ্যে লক্ষ্মীধর কনৌজরাজ গোবিন্দচন্দ্রের মন্ত্রী, হেমাদ্রি দেবগিরির যাদববংশীয় মহাদেবের মন্ত্রী, চন্দ্রেশ্বর ত্রিহুতরাজের মন্ত্রী ও বাকী তিনজন বাঙ্গালী ছিলেন।[২] গোপাল ভট্ট দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। শ্রীধরের স্মৃত্যর্থসার গ্রন্থের উল্লেখ হইতে ধারণা হয় যে সম্ভবতঃ তিনি দাক্ষিণাত্যের স্মৃতিকারদের সহিত পরিচিত ছিলেন কিন্তু পূর্ব ও উত্তর ভারতীয় স্মৃতিকারদের স্মৃতিগ্রন্থের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পান নাই।

হরিভক্তিবিলাসের সহিত ইঁহাদের প্রণীত গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনা করিলে কিছু কিছু বিষয়ের যেরূপ সাদৃশ্য, তেমনি বৈসাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়।

লক্ষ্মীধর ফাল্গুনী কৃষ্ণাচতুর্দশীতে লিঙ্গপূজার কথা বলিয়াছেন। ত্রয়োদশীর রাত্রে—

ভুক্ত্বা রাত্রৌ ততঃ কুর্য্যান্নৃত্যগীতৈঃ প্রজাগরঃ।
শ্রোতব্যাঃ শিবধর্মাশ্চ প্রাদুর্ভাবাশ্চ শাঙ্করাঃ॥
অহিংসা লক্ষণং ধর্মং সমাশ্রিতার্থ শঙ্করঃ।
রম্যৈঃ পিষ্টময়ৈঃ পূজ্যাঃ পশুভিশ্চ সালংকৃতৈঃ॥

কিন্তু শিবরাত্রি ব্রতের কোন উল্লেখ নাই। হরিভক্তিবিলাসে ফাল্গুনে কৃষ্ণাচতুর্দশীতে শিবরাত্রি ব্রত করার জন্য নির্দেশ রহিয়াছে।

[১] P. V. Kane—*History of Dharmasastra*, Vol. I, p. 357
[২] Do—Vol. I, pp. 326-420

শিবরাত্রি ব্রতং কৃষ্ণচতুর্দশ্যান্তু ফাল্গুনে।
বৈষ্ণবৈরপি তৎকার্যং শ্রীকৃষ্ণপ্রীতয়ে সদা॥

হেমাদ্রি শিবরাত্রিব্রতের কথা ও তাহার মাহাত্ম্যের কথা স্কন্দ পরাণ হইতে বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন।

মাঘ ফাল্গুনয়োর্মধ্যে অসিতা যা চতুর্দশী।
তস্যা রাত্রিঃ সমাখ্যাতা শিবরাত্রি সমুদ্ভবা॥

জীমূতবাহন কালবিবেকে ফাল্গুনী কৃষ্ণাচতুর্দশীতে শিবরাত্রিব্রতের কোন উল্লেখ করেন নাই। চণ্ডেশ্বর কৃত্যরত্নাকরে ও ফাল্গুনে কৃষ্ণাচতুর্দশীতে শিবপূজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু কোনরূপ ব্রত উদ্‌যাপনের কথা বলেন নাই। রঘুনন্দন ফাল্গুনের কৃষ্ণাচতুর্দশীতে শিবরাত্রি ব্রতের কথা বলিয়াছেন।

লক্ষ্মীধর এবং গোপাল ভট্ট উভয়েই ব্রহ্মপুরাণ হইতে প্রমাণবাক্য উদ্ধার করিয়া জন্মাষ্টমী ব্রত পালনের ব্যবস্থা দিয়াছেন কিন্তু লক্ষ্মীধর আকর গ্রন্থের নাম করেন নাই। গোপাল ভট্ট উহা করিয়াছেন।

অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌ যুগে।
অষ্টাবিংশতি মে জাতঃ কৃষ্ণোঽসৌ দেবকীসুতঃ॥
ভারাবতারণার্থায় ক্ষত্রিয়াণাং ক্ষয়ায় চ।
তস্মাৎ স তত্র সংপূজ্যো যশোদা দেবকী তথা॥
গন্ধৈর্মাল্যৈস্তথা ধূপৈর্যবগোধূমসম্ভবৈঃ।
সগোরসৈর্ভক্ষ্য ভোজ্যৈঃ ফলৈশ্চ বিবিধৈরপি॥
রাত্রৌ প্রজাগরঃ কার্যোনৃত্যগীতসমাকুলঃ॥—হরিভক্তিবিলাস, ১৫৷২১৯;
কৃত্যরত্নাকর, পৃঃ ২৫৭, কৃত্যকল্পতরু, পৃঃ ৩৫৬

হরিভক্তিবিলাসে এই পর্যন্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। লক্ষ্মীধর ইহার পরেও নবমীতে স্ত্রীগণ রক্তবস্ত্রপরিহিত ও পুষ্পমাল্যে অলংকৃতা হইয়া নানা ঐশ্বর্যযুক্ত বিষ্ণু, দেবকী ও যশোদার প্রতিমূর্তি ইত্যাদি আনাইবার কথা বলিয়াছেন। জীমূতবাহন কালবিবেকে জন্মাষ্টমী ব্রতের কথা উল্লেখ করেন নাই। হেমাদ্রি ও রঘুনন্দন ভাদ্রকৃত্যে জন্মাষ্টমী ব্রতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

লক্ষ্মীধর বলিয়াছেন,—

বিজয়া দ্বাদশীং প্রাপ্য পূজয়েত্তু জনার্দনম্।
মাসি ভাদ্রপদে শুক্লাদ্বাদশীশ্রবণে বুধঃ॥

কৃত্যরত্নাকরেও এই কথা বলা হইয়াছে। গোপাল ভট্টও এই ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে অচ্যুতকে পূজা করিলে মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এইরূপ বলিয়াছেন।

মাসি ভাদ্রপদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।
মহতী দ্বাদশী জ্ঞেয়া উপবাসে মহাফলা ॥
অর্চয়িত্বাঽচ্যুতং ভক্ত্যা লভেৎ পণ্যং দশাব্দিকং।

বুধবার ও শ্রবণযোগে ইহা যে বিজয়া দ্বাদশী কথিত হয়, তাহাও বলিয়াছেন। হেমাদ্রিও এই দ্বাদশীর কথা বলিয়াছেন,—

মাসি ভাদ্রপদে শুক্লপক্ষে যদি হরেদিনে।
বুধশ্রবণসংযোগঃ প্রাপ্যতে তত্র পূজিতঃ ॥
প্রযচ্ছতি শুভান্ কামান্ বামনোমনষ্থি স্থিতান্
বিজয়ানাম সা প্রোক্তা তিথিঃ প্রীতিকরী হরে।—২য় খণ্ড

লক্ষ্মীধর ব্রহ্মপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া কার্তিকের শুক্লা একাদশীতে কেশবকে জাগাইবার ও দ্বাদশীতে স্নান ইত্যাদি করাইবার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কার্তিক মাসে রথযাত্রার কথা বলেন নাই।

একাদশ্যাং তু শুক্লায়াং কার্তিকে মাসি কেশবম্।
প্রসুপ্তং বোধয়েদ্রাত্রৌ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ ॥

গোপাল ভট্ট ব্রহ্মপুরাণ হইতে এই শ্লোকগুলি উদ্ধার করিয়াছেন। ব্রহ্মপুরাণ হইতে এই উদ্ধৃতির শেষে তিনি লিখিয়াছেন, 'এবমেব প্রায়ঃ পাদ্মে। চ তথা স্কান্দে চ'। পাদ্মে—

পৌষ্ণ শেষপদে নাহ্নি মৈত্রাদ্যমপি নো নিশি।
দ্বাদশ্যামপি তৎ কুর্যাদুত্থানং শয়নং হরেঃ ॥

অর্থাৎ রেবতীর শেষ ভাগ যদি দিনমধ্যে না পায় এবং অনুরাধার ভাগ যদি রাত্রিতে না পায়, তাহা হইলে কেবল দ্বাদশীতে হরির উত্থান ও শয়ন করাইবে।

গোপাল ভট্ট প্রথমে ভবিষ্য এবং পরে পদ্ম, স্কন্দ, বরাহ প্রভৃতি পুরাণ হইতে শুক্লা দ্বাদশীতে উত্থানের বিধিমূলক শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা গ্রহণ করিলে রথযাত্রা শুক্লা দ্বাদশীর পর হইবার কথা কিন্তু ব্রহ্মপুরাণের বাক্য উদ্ধার করায় শুক্লা একাদশীকেও সমর্থন করিয়াছেন বলিতে হয়। হেমাদ্রি ভবিষ্যপুরাণ হইতে রথযাত্রোৎসবের কথা উদ্ধার করিয়া মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমীতে ইহার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দিয়াছেন। জীমূতবাহন রথযাত্রার কোন উল্লেখ করেন নাই।

আষাঢ় মাসে পুরীতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার সহিত ছয় গোস্বামী পরিচিত ছিলেন। কিন্তু গোপাল ভট্ট ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। চৈত্রকৃত্যে দোলযাত্রা প্রসঙ্গে গোপাল ভট্ট বলিয়াছেন—

যৎ ফাল্গুনস্য রাকাদাবুত্তরা ফল্গুনী যদা।
তদা দোলোৎসবঃ কার্য্যস্তচ্চ শ্রীপুরুষোত্তমে ॥

কিন্ত্বীদৃগ্ভক্তিসন্দর্শি জগন্নাথানুসারতঃ।
দোলাচন্দনকীলালরথযাত্রাশ্চ কারয়েৎ ॥ —১৪।৩২৬-৩২৭

সনাতনগোস্বামী ইহার টীকাতে বলিয়াছেন—'শ্রীজগন্নাথদেবস্য অনুসারতঃ, যস্মিন্ দিনে যথা তৎক্ষেত্রে ভবেত্তদ্দিনেঽপি তথা দোলযাত্রাং চন্দনযাত্রাং জলযাত্রাং রথযাত্রাঞ্চ কুর্যাদেবেত্যর্থঃ'।

মূর্তিগঠন ও নির্মাণ ব্যাপারে হেমাদ্রি কেবল সিদ্ধার্থসংহিতা হইতে চতুর্বিংশতি মূর্তির লক্ষণ দিয়াছেন আর ভট্ট প্রথমে হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রোক্তমতে লক্ষণগুলি বলিয়া পরে সিদ্ধার্থসংহিতানুসারে লক্ষণগুলি বলিয়াছেন। হেমাদ্রি বিশ্বকর্মাশাস্ত্র হইতে লক্ষ্মীনারায়ণের যে মূর্তি লক্ষণ দিয়াছেন, ভট্টও সেই শ্লোকগুলি ধরিয়াছেন। কিন্তু হেমাদ্রিতে যেখানে আছে, 'যোগস্বামী সবিজ্ঞেয়ঃ পুজ্যোমোক্ষার্থযোগিভিঃ' সেখানে ভট্টে পাঠ আছে 'যোগস্বামী সবিজ্ঞেয়ঃ পুজ্যোমোদার্থযোগিভিঃ'। বিষ্ণুধর্মোত্তর হইতে হেমাদ্রি মহাবিষ্ণু, লোকপালবিষ্ণু, বসুদেব, সংকর্ষণ, অনিরুদ্ধ, নৃবরাহ, বামন, ত্রিবিক্রম, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বলভদ্র প্রভৃতির লক্ষণস্বরূপ যাহা উদ্ধার করিয়াছেন, ভট্টও তাহা উদ্ধার করিয়াছেন।

হেমাদ্রি 'কালোত্তর' হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন, শরৎ ও বসন্তকাল দীক্ষা বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহা অসম্ভব হইলে বর্ষা। গোপাল ভট্ট বলেন 'সর্বত্রশুভমাশ্বিনে' এবং ফাল্গুনে 'সর্ববৈশ্যত্বম্'। হেমাদ্রি দীক্ষা সম্পর্কে কালোত্তর, ক্রিয়াকাণ্ডশেখর, রত্নাবলী, ক্রতুপঞ্চরাত্র, মহাপঞ্চরাত্র, চৌর্যপঞ্চরাত্র প্রভৃতি হইতে বচন উদ্ধার করিয়াছেন এবং খুব বিস্তৃত করিয়া দীক্ষার বিধি বলিয়াছেন। গেপাল ভট্ট খুব বিস্তৃত করিয়া দীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেন নাই। একাদশীর বিচারে নারদীয় পুরাণ হইতে 'রটন্তীহ পুরাণানি', স্কন্দপুরাণের 'মাতৃহা পিতৃহা' ইত্যাদি ও ব্রহ্মবৈবর্তের 'সকেবলমর্থং ভুঙ্‌ক্তে' ইত্যাদি হেমাদ্রি ও গোপাল ভট্ট উভয়েই ধরিয়াছেন। উভয়ের একাদশী বিচারে যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। গরুড় পুরাণ ও শিবরহস্য উভয় গ্রন্থ হইতেই 'উদয়াৎ প্রাক্‌যদাবিপ্রমুহূর্তদ্বয় সংযুতা' ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া হেমাদ্রি ও গোপাল ভট্ট সূর্যোদয়ের পূর্বে একাদশী থাকিলে উহাকে সম্পূর্ণা একাদশী বলিয়াছেন এবং গৃহীদিগকে ঐ একাদশীতে উপবাস করিতে বলিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণ হইতে 'আদিত্যোদয়বেলায়াঃ' ইত্যাদি উদ্ধৃত করিয়া উভয়েই সূর্যোদয়ের পূর্বে যদি একাদশী দুই মুহূর্ত থাকে তাহাকেই সম্পূর্ণ একাদশী বলিয়াছেন। দুই মুহূর্তের কম হইলে ইহা দশমীবিদ্ধা একাদশী হইবে, এইরূপ বলিয়াছেন। গোপাল ভট্ট উক্ত শ্লোকের পর ভবিষ্যপুরাণ হইতে আর একটি শ্লোক—

অতএব পরিত্যাজ্যা সময়ে চারুণোদয়ে।
দশম্যৈকাদশী বিদ্ধা বৈষ্ণবেণ বিশেষতঃ ॥

ইত্যাদি উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণবদিগকে বিশেষভাবে এই দশমীবিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। জীমূতবাহনও কালবিবেকে দশমীযুক্তা একাদশীতে উপবাস নিষেধ করিয়াছেন।

দশম্যেকাদশীবিদ্ধা গান্ধারী তামুপোষিতা।
তস্যাঃ পুত্রশতং নষ্টং তস্মাত্তাং পরিবর্জয়েৎ ॥—স্কন্দপুরাণ

কূর্মপুরাণ, নারদপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ প্রভৃতি হইতেও বাক্য উদ্ধার করিয়া ইহা নিষেধ করিয়াছেন।

রঘুনন্দন ও জীমূতবাহন, হেমাদ্রি প্রভৃতির মত দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস নিষেধ করিয়াছেন।

দ্বাদশী বিচারে গোপালভট্ট গোস্বামী—

মাসি ভাদ্রপদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।
মহতী দ্বাদশীজ্ঞেয়া উপবাসে মহাফলা ॥—

এইরূপ লিখিয়াছেন। তিনি ইহা 'ভবিষ্যোত্তরাৎ' হইতে লইয়াছেন। হেমাদ্রিও এইরূপ 'ভবিষ্যোত্তরাৎ' লিখিয়া শ্লোকটি কিঞ্চিৎ পাঠান্তরসহ ধরিয়াছেন।

মাসি ভাদ্রপদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।
সর্বকামপ্রদপুণ্যা উপবাসে মহাফলা ॥

জীমূতবাহনও দ্বাদশী বিচারে 'ভবিষ্যোত্তরাৎ' বলিয়া গোপাল ভট্টেরই প্রদত্ত পাঠ ধরিয়াছেন।

দুর্গাপূজা একটি সর্বভারতীয় উৎসব বলা চলে। বিভিন্নস্থানে বিভিন্নরূপে ইহা প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু গোপাল ভট্ট ইহার কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই। চণ্ডেশ্বর, জীমূতবাহন, রঘুনন্দন দুর্গোৎসবের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু লক্ষ্মীধর দুর্গাপূজার কোন উল্লেখ করেন নাই।

আশ্বিনে পূর্ণিমায় কোজাগরীকৃত্য জীমূতবাহন ও রঘুনন্দনে দেখা যায় কিন্তু হরিভক্তিবিলাসে ইহার কোন উল্লেখ নাই। বাংলা দেশের প্রচলিত উৎসব-অনুষ্ঠানাদির মধ্যে হরিভক্তিবিলাসে অক্ষয়তৃতীয়া ব্রত ও যমদ্বিতীয়া বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উল্লেখ দেখা যায়। সরস্বতী পূজা, গঙ্গা পূজা, মনসা পূজা, অম্বুবাচী প্রভৃতির উল্লেখ ইহাতে পাওয়া যায় না।

হরিভক্তিবিলাস বৈষ্ণবদের করণীয় আচারবিচার সম্পর্কে নির্দেশমূলক গ্রন্থ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাহা মানিয়া চলিবেন ইহা মনে করা যায়। কিন্তু অধুনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে যে কোন কোন আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে তাহা হরি-ভক্তিবিলাসের সহিত মিলে না।

হরিভক্তিবিলাস স্ত্রী শূদ্র সকলেরই শালগ্রাম পূজার অধিকার দিয়াছিলেন।

এবং শ্রীভগবান্ সর্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥ —৫।৪৫০

অর্থাৎ দীক্ষাগ্রহণান্তে কি দ্বিজ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কি শূদ্র, কি স্ত্রী সকলেই নিরত হইয়া শালগ্রাম শিলারূপী ভগবানের পূজা করিবেন। সনাতন গোস্বামী ঐ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন 'যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎপূজাপরৈঃ সদ্ভিরিত্যর্থঃ'। কিন্তু বাংলাদেশে স্ত্রী ও শূদ্রের মধ্যে শালগ্রাম পূজার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় না। গোপাল ভট্ট অষ্টাদশ বিলাসে গোপাল, মহাবরাহ, লোকপালবিষ্ণু, নৃসিংহ, হয়গ্রীব প্রভৃতি মূর্তিগঠনের রীতির কথাপ্রসঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণ ও কৃষ্ণ-রুক্মিণীর মূর্তির কথা বলিয়াছেন কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আরাধ্য রাধাকৃষ্ণের মূর্তির কথা কিছু বলেন নাই। শ্রীরাধার পূজার কথা একমাত্র ষোড়শ বিলাসেই আছে।

ততঃ প্রিয়তমা বিষ্ণোরাধিকা গোপিকাসু চ।
কার্তিকে পূজনীয়া চ শ্রীদামোদরসন্নিধৌ॥

অর্থাৎ গোপিকাদের মধ্যে শ্রীরাধা বিষ্ণুর প্রিয়তমা, অতএব কার্তিক মাসে শ্রীদামোদরের সহিত শ্রীরাধার পূজা করিবে। স্কন্দপুরাণের কার্তিকমাহাত্ম্য হইতে একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলা হইয়াছে,—

কার্তিকেঽহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দন।
প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ॥ —১৬।১৭২

টীকায় সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন 'মা লক্ষ্মীঃ শ্রীরাধারূপা, তয়া সহিতস্য তব প্রীত্যর্থং'। টীকাতে কোনপ্রকারে টানিয়া বুনিয়া রাধাকে আনা হইয়াছে।[১] পঞ্চম-বিলাসে গোপাল ভট্ট শ্রীনন্দনন্দনবর্ণনা প্রসঙ্গে গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু স্বতন্ত্র করিয়া শ্রীরাধার ধ্যান লিখেন নাই।

কার্তিক মাসের ব্রতাদির কথা বর্ণনা করিতে যাইয়া গোপাল ভট্ট কার্তিকী পূর্ণিমায় রাসের কথা বলেন নাই। অথচ রাসযাত্রা আধুনিক বৈষ্ণবদের এক অন্যতম প্রধান উৎসব। শ্রাবণকৃত্য প্রসঙ্গে ঝুলনেরও কোন উল্লেখ করেন নাই। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রঘুনন্দনও রাস কিংবা ঝুলনের কোনরূপ উল্লেখ তাঁহার গ্রন্থে করেন নাই।

হরিভক্তিবিলাসে নৃসিংহপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে যে জপ তিন প্রকার—বাচিক, উপাংশু ও মানস। ইহাদের মধ্যে আবার মানসই শ্রেষ্ঠ।

[১] রঘুনন্দনও তাঁহার কৃত্যতত্ত্বে এই শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। 'ময়া'র টীকায় তিনি 'লক্ষ্ম্যাই' করিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্য মত উদ্ধৃত করিয়া এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, উপাংশু জপ বাচিক জপ হইতে শতগুণ এবং উপাংশু জপ হইতে মানস জপ সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ, যেহেতু মানস জপ ধ্যানের তুল্য। 'মন্ত্রার্ণব' হইতে এই সিদ্ধান্তের সমর্থনও এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

জপকর্তা হইতে উচ্চ সংকীর্তনকারী।
শতগুণ অধিক সে পুরাণেতে ধরি ॥—চৈ. চ. ৩।৩।৭৫

সনাতন গোস্বামী বৃহদ্ভাগবতামৃতে বলিয়াছেন যে (২।৩।১৪৭-১৪৮) মহাপ্রভুর মতে চঞ্চলস্বভাব মনের ধর্ম স্মরণ হইতে কীর্তনই শ্রেষ্ঠ কারণ কীর্তনের দ্বারা একাধারে কীর্তন, শ্রবণ ও স্মরণ হয় এবং অপর শ্রোতৃবৃন্দ উপকার লাভ করে। হরিভক্তি-বিলাসের টীকাতেও সনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন যে স্মরণ অপেক্ষা নামসংকীর্তনই শ্রেষ্ঠ (১১।৪৫৩)।

হরিভক্তিবিলাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী বিশদভাবে বর্ণিত হইলেও শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমায় কোন ব্রত পালনের বিধান দেওয়া হয় নাই। মনে হয়, ব্রজমণ্ডলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন পর্যন্ত গৌড়মণ্ডলের ন্যায় উপেয়রূপে গৃহীত হন নাই, তাই এই অনুল্লেখ। চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন,—

চৈতন্যে জন্মযাত্রা ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা আদি এই তিথির করে আরাধনা ॥
নিত্যানন্দ জন্ম মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী।
সর্বযাত্রা অমঙ্গল এ দুই পুণ্য তিথি।
সর্বশুভলগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি ॥
প্রত্যেকে দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণে ভক্তি হয় খণ্ডে অবিদ্যা বন্ধন ॥

সম্ভবতঃ চৈতন্যভাগবত রচনার পূর্বেই হরিভক্তিবিলাস লিখিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের আট বৎসরকালের মধ্যে হয়তো তাঁহার জন্মতিথি উদ্‌যাপনের বিধি বৈষ্ণবসমাজে প্রবর্তিত হয় নাই বলিয়াই হরিভক্তিবিলাসে উহা বর্ণিত হয় নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী

শ্রীচৈতন্যের ভাবময় জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া ধনৈশ্বর্য গৃহদারাদি পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা নিষ্কিঞ্চন দীনাতিদীন জীবনযাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রঘুনাথ দাস অন্যতম। রঘুনাথ দাসের বৈরাগ্যসাধন ও কৃচ্ছ্রসাধনার তুলনা ইতিহাসে দুর্লভ। তদ্‌শিষ্য ও বন্ধু কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহার একটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। হিরণ্যদাস ও গোবর্ধনদাস নামে দুই ভ্রাতা সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। সে কালে সপ্তগ্রাম পূর্বভারতের একটি শ্রেষ্ঠ বন্দর এবং বাংলার প্রাচীন রাজধানীও ছিল। ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে গঙ্গা সরিয়া যাইতে থাকার ফলে ইহার অবনতি ঘটিতে আরম্ভ করে। এই সপ্তগ্রামের জমিদারী হইতে ইঁহাদের বার্ষিক আয় প্রায় আট লক্ষ টাকার মত হইত। হিরণ্যদাস বড় ও গোবর্ধনদাস কনিষ্ঠ ছিলেন। এই কনিষ্ঠ গোবর্ধনদাসেরই পুত্র রঘুনাথ দাস। এই সপ্তগ্রামের মাটিতেই একদিন শুভলগ্নে রঘুনাথ দাস আবির্ভূত হন।

আবির্ভাব

রঘুনাথ দাসের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। হরিদাস দাস তাঁহার গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান গ্রন্থে (৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩২৫) রঘুনাথ দাস ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত বলিয়াছেন। অচ্যুত চৌধুরী তাঁহার শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত গ্রন্থে (পৃঃ ২) রঘুনাথ দাসের আবির্ভাব ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল, এইরূপ বলিয়াছেন। জগদ্বন্ধু ভদ্র তাঁহার গৌরপদতরঙ্গিণীতে (পৃঃ ৩৮) রঘুনাথের আবির্ভাবকাল ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দ ধরিয়াছেন। সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ তাঁহার শ্রীচৈতন্যদেব গ্রন্থে (পৃঃ ৩১০) ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথ দাসের আবির্ভাব হইয়াছিল, এইরূপ লিখিয়াছেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন Chaitanya and his Companions গ্রন্থে (p. 121) ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথ দাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এইরূপ মনে করেন।

শ্রীচৈতন্যের সহিত রঘুনাথ দাসের প্রথম শান্তিপুরে সাক্ষাৎ হয়। শ্রীচৈতন্যকে দেখিবার পর হইতে তাঁহার গৃহ ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবার অদম্য বাসনা জাগে।

> প্রভু তারে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচলে।
> তিঁহো ঘরে আসি হৈলা প্রেমেতে পাগল॥

বারবার পলায় তিঁহো নীলাদ্রি যাইতে।
পিতা তাঁরে বান্ধি রাখে আনি পথ হৈতে॥

—চৈ. চ. ২।১৬।২২৫-২২৬

অন্ততঃ পক্ষে রঘুনাথ দাসের বয়স কমপক্ষে তের-চৌদ্দ না হইলে একা একা নীলাচলে যাইবার সাহস ও সামর্থ্য হয় না। শ্রীচৈতন্য ১৫১০ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাসের পরে শান্তিপুরে যান। ঐ সময়ে রঘুনাথ দাস বালক ছিলেন বলা হইয়াছে। কুড়ি বা তদূর্ধ্ব বয়সের ছেলেকে বালক বলা চলে না। আবার তের-চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের ছেলের একা একা গৃহত্যাগ করিয়া যাওয়া খুব সম্ভব মনে হয় না। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে রঘুনাথের সাক্ষাতের কালে তাঁহার বয়স তের-চৌদ্দ হইতে আঠার-উনিশ বৎসরের মধ্যে ছিল ধরিয়া এবং শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ ১৫১০ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল ধরিয়া বিচার করিলে রঘুনাথ দাসের আবির্ভাব সর্বোচ্চ ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ এবং সর্বনিম্ন ১৪৯১ খৃষ্টাব্দ হয়। এই উভয়কালের মধ্যে রঘুনাথ দাসের আবির্ভূত হইবার সম্ভাবনা বেশী।

এইচ. উইলসন বলিয়াছেন রঘুনাথ দাস ব্রাহ্মণ ছিলেন।[১] ঐ গ্রন্থকে অনুসরণ করিয়া অক্ষয়কুমার দত্তও রঘুনাথ দাস গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, এইরূপ বলিয়াছেন।[২] অক্ষয়কুমার দত্ত ও উইলসন বৈষ্ণবগ্রন্থগুলির সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত না থাকার জন্য এইরূপ ভ্রান্তি করিয়াছেন, মনে হয়। হরিভক্তিবিলাসের দিগদর্শিনী টীকাতে রঘুনাথ দাস যে কায়স্থ ছিলেন তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। টীকায় রঘুনাথ দাসের পরিচয় দেওয়া আছে, 'শ্রীরঘুনাথ দাসো নাম গৌড়কায়স্থকুলভাস্করঃ পরম-ভাগবতঃ শ্রীমথুরাশ্রিতস্তদাদীন্ নিজসঙ্গিনঃ সন্তোষয়িতুমিত্যর্থঃ।'

শান্তিপুরে শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ

বাল্যকাল হইতেই রঘুনাথ দাস বিষয়সম্পত্তি সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। 'বাল্যকাল হইতে তিঁহো বিষয়ে উদাস'। রঘুনাথ দাস যখন বাল্যকালে পড়াশুনায় রত ছিলেন, সেই সময়ে শ্রীচৈতন্যের প্রিয় পার্ষদ হরিদাসের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহারই সংস্পর্শে আসিয়া রঘুনাথ দাসের শ্রীচৈতন্যকে দেখিবার আকুল আগ্রহ জন্মে এবং সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য শান্তিপুরে আসিলে তিনি তাঁহাকে দেখিবার জন্য শান্তিপুরে যান। ইহা ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাস হইবে। অদ্বৈতের অনুগ্রহে রঘুনাথ তাঁহার গৃহে থাকিয়া 'প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ সাত'। শ্রীচৈতন্য রঘনাথকে

১ *The Religious Sects of the Hindus*, 2nd. ed., p. 90
২ ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৫৭

গৃহে যাইতে বলিলেন। শ্রীচৈতন্যের আদেশে রঘুনাথ গৃহে ফিরিলেন। কিন্তু ঘরে তাঁহার মন বসিতেছিল না। নীলাচলে চলিয়া যাইবার জন্য বহুবার উদ্যম করিলেন কিন্তু পিতা গোবর্ধনের সতর্ক দৃষ্টি থাকায় পথ হইতে বন্দী হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। পিতা তাঁহাকে সর্বক্ষণ নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন।

পঞ্চপাইক তাঁরে রাখে রাত্রিদিনে।
চারি সেবক দুই ব্রাহ্মণ রহে তাঁর সনে॥
একাদশ জন তারে রাখে নিরন্তর।
নীলাচল যাইতে না পায় দুঃখিত অন্তর॥

—চৈ. চ. ২।১৬।২২৭-২২৮

পাঁচজন পাইকের প্রহরাধীনে রঘুনাথ দাসের যখন প্রায় বন্দী অবস্থায় কাল কাটিতেছিল সেই সময় নীলাচল হইতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ে আসেন। শান্তিপুরে তাঁহার অবস্থানের কথা জানিতে পারিয়া রঘুনাথ তাঁহাকে দেখিবার জন্য পিতার অনুমতি লইয়া শান্তিপুরে গমন করেন। দ্বিতীয়বার শ্রীচৈতন্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিল। ইহা ১৫১৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর-নবেম্বর মাস হইবে কারণ ১৫১৪ খৃষ্টাব্দের বিজয়াদশমীর পর শ্রীচৈতন্য গৌড়ে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন, পূর্বে দেখাইয়াছি।

রঘুনাথ সাতদিন অদ্বৈতগৃহে মহাপ্রভুর নিকটে অবস্থান করিলেন। তাঁহার মনে সর্বদা এই চিন্তা কাজ করিতে লাগিল,

রক্ষকের হাতে মুক্রি কেমনে ছুটিব।
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব॥ —চৈ. চ. ২।১৬।২৩৩

শ্রীচৈতন্য অন্তরে তাঁহার মনোভাব জানিয়া বলিলেন,—

স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥

—চৈ. চ. ২।১৬।২৩৫-২৩৬

শ্রীচৈতন্যের এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া রঘুনাথ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া স্বাভাবিক ভাবে কাজে কর্মে মন দিলেন। পিতামাতাও পুত্রের মতিগতির পরিবর্তন দেখিয়া আনন্দিত হইলেন।

কিছুকাল কাটিয়া যাইবার পর মথুরা হইতে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে ফিরিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া রঘুনাথ সেখানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় একটি বিপদ ঘটিয়া গেল। রঘুনাথ দাসের পিতৃব্য হিরণ্যদাস চৌধুরী হইবার পূর্বে যে মুসলমান শাসনকর্তা এই কাজ করিত তাহার স্বভাবতঃই হিংসা হইয়াছিল।

হিরণ্যদাস বিশ লক্ষ টাকা আদায় করিয়া রাজাকে বার লক্ষ টাকা দেয়। তাহার লাভ থাকে আট লক্ষ টাকা। সেই মুসলমান ভাবিয়াছিল হিরণ্য ও গোবর্ধন তাহাকেও কিছু অংশ দিবে। কিন্তু তাহা না পাইয়া সে তাহাদের নামে মিথ্যা অভিযোগ করিল। উজির তদন্ত করিতে আসিলে দুই ভাই পলাইয়া গেল। তখন রঘুনাথ দাসকেই বন্দী করা হইল। তাঁহাকে ভয় দেখানো হইল বাপজেঠার সন্ধান না দিলে শাস্তি দেওয়া হইবে। রঘুনাথ সেই মুসলমান শাসনকর্তাকে বুঝাইলেন—আমার বাপ জেঠা ও তুমি ভাইয়ের মতই কাল কাটাইতে। ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি আজ আছে, কাল থাকিবে না। তুমি আমার বাপজেঠার মত। আমাকে শাস্তি দেওয়া তোমার পক্ষে উচিত হইবে না। এই কথাতে মুসলমান শাসনকর্তার মন গলিয়া গেল। উজিরকে বলিয়া রঘুনাথকে মুক্ত করিয়া দিল। রঘুনাথ মুক্ত হইয়া বাপজেঠার সহিত সেই মুসলমান শাসনকর্তার সব গোলমাল মিটাইয়া ফেলিলেন।

এমনি করিয়া এক বৎসর অতিবাহিত হইল। দ্বিতীয় বৎসর রঘুনাথ বারবার পালাইবার চেষ্টা করেন আর পিতা তাঁহাকে ধরিয়া আনেন। মা বলিলেন 'পুত্র যে বাতুল হৈল রাখহ বান্ধিয়া'। পিতা গোবর্ধন দুঃখিত অন্তরে বলিলেন,—

ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য, স্ত্রী অপ্সরা সম।
এসব বান্ধিতে নারিলেক যার মন॥
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিব কেমতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ ঘুচাইতে॥
—চৈ. চ. ৩।৬।৩৮-৩৯

তাহাছাড়া, শ্রীচৈতন্য ইঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছেন, 'চৈতন্যপ্রভুর বাতুল কে রাখিবে ঘরে'।

নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ ও গৃহত্যাগ

নিত্যানন্দ পাণিহাটিতে আসিয়াছেন শুনিয়া রঘুনাথ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। দূর হইতে দণ্ডবৎ করিলে সেবক জানাইল রঘুনাথ প্রণাম করিতেছেন। আনন্দিত হইয়া নিত্যানন্দ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন,—

নিকটে না আইস মোর ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছোঁ দণ্ডিমু তোমারে॥
দধিচিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।—চৈ. চ. ৩।৬।৪৯-৫০

রঘুনাথ তৎক্ষণাৎ চারিদিকে নিজ লোকজন পাঠাইয়া প্রভুর চিঁড়া, দধি, দুগ্ধ, সন্দেশ আর চিনি কলা আনিলেন। মহোৎসবের খবর পাইয়া প্রভুর লোকজন জমায়ৎ হইল। নিত্যানন্দ, বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ, ব্রাহ্মণসজ্জন, সাধারণ লোকজন

১৫

সবাই ভোজনে বসিয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিলেন। আহারান্তে সকলকে মালাচন্দন দেওয়া হইল। নিত্যানন্দ হৃষ্ট হইয়া রঘুনাথকে আশীর্বাদ করিলেন,—

নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন ভবনে।
অচিরে নির্বিঘ্নে পাবে চৈতন্যচরণে ॥ —চৈ. চ. ৩।৬।১৪১

নিত্যানন্দের আদেশে রঘুনাথ গৃহে ফিরিলেন।

পূর্বেই দেখাইয়াছি যে ১৫১৬ খৃষ্টাব্দের মে-জুন মাসে শ্রীচৈতন্য মথুরা হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিবার চেষ্টা করেন এবং রঘুনাথও ঐ সময়ে গৃহত্যাগের ইচ্ছা করেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার পিতা ও জেঠা রাজরোষে পড়ায় ঐ সময়ে তিনি গৃহত্যাগ করিতে সক্ষম হইলেন না। ইহার পর রঘুনাথ এক বৎসর গৃহে অবস্থান করিয়া পর বৎসর অর্থাৎ ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের মে-জুনের পর নীলাচল যাইতে সক্ষম হন। অনুমান হয়, এই সময়ে গৃহত্যাগের কিছু পূর্বে পাণিহাটিতে নিত্যানন্দের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পাণিহাটিতে যে চিড়াদধি মহোৎসব বা রঘুনাথ দাসের দণ্ড মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহা জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে হইয়া থাকে। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের মে-জুনে নিত্যানন্দের সঙ্গে রঘুনাথ দাসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রঘুনাথ দাস শ্রীচৈতন্য-সাহচর্যে ষোল বৎসর কাটাইয়াছিলেন (চৈ. চ. ১।১০।৯১)। শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটকাল ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং এই দিক দিয়াও প্রমাণিত হয় যে রঘুনাথ দাস ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের জুন-জুলাইতে নীলাচলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রঘুনাথ যখন নীলাচলে যাত্রা করেন, তখন রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়ীয়েরাও নীলাচল যাত্রা করেন ইহা চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যাইতেছে। সুতরাং এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রঘুনাথ দাস গোস্বামী স্তবাবলীতে স্বরূপ, গোবিন্দাদির নাম করিলেও নিত্যানন্দের নাম কোন প্রসঙ্গে একবারও করেন নাই। তাঁহার মুক্তা-চরিতেও তিনি জীব এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম করিয়াছেন কিন্তু নিত্যানন্দের নাম করেন নাই। দানকেলিচিন্তামণিতেও নিত্যানন্দের নাম উল্লিখিত নাই। ইহা আশ্চর্যের বিষয়। যাহাই হউক, গৃহে ফিরিয়া রঘুনাথ আর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন না। বাহিরে দুর্গামণ্ডপে শয়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেখানেও রক্ষীরা সতর্ক দৃষ্টি রাখিল, 'তাঁহা জাগি রহে সব রক্ষকের গণ'। রঘুনাথের মনে তখন একটিমাত্র চিন্তা কি করিয়া রক্ষকদের হাত এড়াইয়া পলায়ন করিবেন। শোনা গেল, গৌড় হইতে ভক্তবৃন্দ নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। রঘুনাথের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু রঘুনাথ তাঁহাদের সহিত যাইতে সাহসী হইলেন না, 'প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গে তবহি ধরা পড়ে'। এইরূপে পলাইবার নানা চিন্তা করিতে

করিতে একদিন সুযোগ মিলিল। একদিন দেবীমণ্ডপে শয়ন করিয়া আছেন। গুরুদেব যদুনন্দন আচার্য শেষ রাত্রিতে আসিয়া বলিলেন—তাঁহার এক শিষ্য ঠাকুর-সেবা ছাড়িয়াছে। যদি রঘুনাথ বলিয়া কহিয়া দেয়, তবে হয়তো সেই শিষ্যটি সেবা করিতে পারে। রঘুনাথ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া গুরু যদুনন্দন আচার্যের সহিত বাহির হইলেন। রক্ষকেরা রাত্রির শেষভাগে নিদ্রায় শ্রান্ত—তদুপরি গুরু যদুনন্দন সঙ্গে আছেন জানিয়া খুব একটা সতর্কতা লইল না। রঘুনাথ বুঝিলেন—এই সুযোগ। কিছুদূর গিয়া যদুনন্দনকে বলিলেন—আপনি গৃহে যান। আমি সেই বিপ্রকে বলিয়া কহিয়া পাঠাইয়া দিতেছি। গুরুদেব সরল বিশ্বাসে তাহা মানিয়া লইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। সঙ্গে কেহই নাই। রঘুনাথ সুবর্ণ সুযোগটিকে হারাইলেন না। ঊর্ধ্বশ্বাসে পথ চলিলেন। পরিচিত পথে গেলে ধরা পড়িতে পারেন এই আশঙ্কায় অন্য পথে ছুটিলেন।

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চরণ চিন্তিয়া।
পথ ছাড়ি উপপথে যায়েন ধাইয়া॥
গ্রামের পথ ছাড়ি যায় বনে বনে।
পঞ্চদশ ক্রোশ চলি গেলা একদিনে॥ —চৈ. চ. ৩।৬।১৭০-১৭২

রাত্রিতে এক গোপগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। এদিকে রক্ষকেরা রঘুনাথকে ফিরিতে না দেখিয়া গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, 'রঘুনাথ আজ্ঞা মাগি গেলা নিজ ঘর'। রঘুনাথ পলাইয়াছেন জানিয়া পিতা গোবর্ধন সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠাইলেন। লোকেরা বহু দূর গিয়াও কোন সন্ধান পাইল না। তাহারা ফিরিয়া আসিল। এদিকে রঘুনাথ পরদিন পথ হাঁটিয়া নীলাচলে পৌঁছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাহৃষ্ট হইয়া রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিলেন।

রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহে কৃপা-আর্দ্র চিত্ত হঞা॥
এই রঘুনাথে আমি সোঁপিল তোমারে।
পুত্র-ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥ —চৈ. চ. ৩।৬।১৯৯-২০০

শ্রীচৈতন্য এই বলিয়া স্বরূপের হস্তে রঘুনাথকে সমর্পণ করিলেন। তাহার পর গোবিন্দকে বলিলেন,—

পথে ইহোঁ করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন।
কথোদিন কর ইঁহার ভাল সন্তর্পণ॥ —চৈ. চ. ৩।৬।২০৫

রঘুনাথকে সমুদ্রে স্নান করিয়া আসিয়া জগন্নাথদর্শনান্তে প্রসাদ গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে দুই চারিদিন প্রসাদের অবশিষ্ট গ্রহণ করার পর জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে অযাচিত ভিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

জগন্নাথের সেবক যত বিষয়ীর গণ।
সেবা সারি রাত্র্যে করে গৃহেরে গমন॥
সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণব দেখিয়া।
পসারির ঠাঁঞি অন্ন দেওয়ায় কৃপা করিয়া॥
এই মত সর্বকাল আছে ব্যবহারে।
নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া রহে সিংহদ্বারে॥

—চৈ. চ. ৩।৬।২১৩-২১৫

এই কথা গোবিন্দ শ্রীচৈতন্যকে জানাইলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—

ভাল কৈল বৈরাগীর ধর্ম আচরিলা।

—চৈ. চ. ৩।৬।২২০

স্বরূপ দামোদরের দ্বারা শ্রীচৈতন্যের নিকট রঘুনাথ তাঁহার কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন—স্বরূপকে তোমার উপদেষ্টা করিয়া দিয়াছি। ইহার কাছে সমূহ শিক্ষা কর। আমার অপেক্ষা স্বরূপ অনেক কিছুই বেশী জানে। তথাপি যদি কিছু আমার নিকট হইতে জানিতে ইচ্ছা কর তবে ইহাই পালন করিও,—

গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানস করিবে॥

—চৈ. চ. ৩।৬।২৩৪-২৩৫

শ্রীচৈতন্যের নির্দেশ স্বীকার করিয়া লইয়া রঘুনাথ স্বরূপের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে গৌড়ের ভক্তেরা নীলাচলে আসিল এবং চারি মাস রহিয়া প্রত্যাবর্তন করিল। তাহাদের কাছে রঘুনাথের সংবাদ পাইয়া পিতামাতা এক ব্রাহ্মণ, দুই চাকর ও চারিশত মুদ্রা পাঠাইলেন। রঘুনাথ সব ফিরাইয়া দিয়া টাকা রাখিলেন। তাহাতে শ্রীচৈতন্যকে দুই বৎসর নিমন্ত্রণ করা চলিল। শেষে একসময়ে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ করাও ছাড়িয়া দিলেন। শ্রীচৈতন্য স্বরূপের কাছে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে রঘুনাথ বুঝিয়াছে, নিতান্ত উপরোধেই প্রভু এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। আসলে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণে তাঁহার কোনরূপ ইচ্ছা নাই।

উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ।
না মানিলে দুঃখী হৈবে এই মূঢ়জন॥ —চৈ. চ. ৩।৬।২৭১

ইহা শুনিয়া শ্রীচৈতন্য সন্তুষ্ট হইলেন।

ইহার পর রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িয়া ছত্রে গিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীচৈতন্য বলিলেন,—

…ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার॥ —চৈ. চ. ৩।৬।২৭৯

শ্রীচৈতন্য রঘুনাথের এই কৃচ্ছ্রসাধনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজের দুইটী প্রিয় বস্তু দান করিলেন—গোবর্ধন শিলা আর গুঞ্জামালা। রঘুনাথ পরম যত্নে সেই শিলার পূজা করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ অত্যন্ত কঠোর নিয়মের মধ্যে চলিতে লাগিলেন। ছত্রে গিয়া ভিক্ষাও ছাড়িয়া দিলেন। শরীর পোষণের জন্য রঘুনাথ যাহা করিতে লাগিলেন তাহা অভূতপূর্ব ব্যাপার।

প্রসাদভাত পসারীর যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈলে ভাত সড়ি যায়॥
সিংহদ্বারে গাভী আগে সেই ভাত ডারে।
সড়াগন্ধে তৈলঙ্গী গাই খাইতে না পারে॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্র্যে ঘরে আনি।
ভাত পাখালিয়া ফেলে দিয়া বহু পানি॥
ভিতরেতে দড় যেই মাজি ভাত পায়।
লোন দিয়া মাখি সেই সব ভাত খায়॥ —চৈ. চ. ৩।৬।৩০৮-৩১১

গোবিন্দের নিকট ইহার সন্ধান পাইয়া একদিন শ্রীচৈতন্য আসিয়া এই অন্ন একগ্রাস খাইয়া বলিলেন—অনেক প্রকার প্রসাদ খাইয়াছি কিন্তু এই রকম স্বাদযুক্ত প্রসাদ কখনো খাই নাই।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রঘুনাথ এই কঠোর বৈরাগ্য আচরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন,—

অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় যাঁহার স্মরণে।
আহার-নিদ্রা চারিদণ্ড সেহো নহে কোনদিনে॥

—চৈ. চ. ৩।৬।৩০৩-৩০৪

বৃন্দাবনে আগমন ও বসবাস

রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যের সাহচর্যে দীর্ঘ ষোল বৎসরকাল নীলাচলে কাটাইয়াছিলেন। তাহার পর শ্রীচৈতন্যের ও স্বরূপের তিরোধানের পর সনাতন ও রূপকে প্রণাম করিয়া গোবর্ধন হইতে পড়িয়া দেহত্যাগ করিবেন এইরূপ সংকল্প করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া।
গোবর্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া ॥
এই ত নিশ্চয় করি আইলা বৃন্দাবনে।
আসি রূপ সনাতনের বন্দিলা চরণে ॥ —চৈ. চ. ১৷১০৷৯২-৯৩

সনাতন, রূপ তাঁহাকে এই আত্মহত্যার সংকল্প হইতে বিরত করিয়া 'নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল'। এই দুই ভাই তাঁহার নিকট হইতে শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সর্বপ্রকার লীলাসাধনার গল্প শুনিতেন এবং সেই ভক্তিরসতত্ত্বও আলোচনা করিতেন। রঘুনাথ বৃন্দাবনে সকলের মিত্র বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। জীব লঘুতোষণীতে তাহাই বলিয়াছেন। কিছুকাল বৃন্দাবনে থাকিবার পর রঘুনাথ গোবর্ধনে আসিলেন। সেখানে রাধাকুণ্ডতীরে তিনি আশ্রয় লইলেন। রাধাকুণ্ডের সংস্কার সাধন করিলেন (ভ. র. ৫ম তরঙ্গ)। রঘুনাথ বৃক্ষতলেই দিনরাত্রি যাপন করেন। একদিন সনাতন বৃন্দাবন হইতে আসিয়া মানস পাবনঘাটে স্নান করিতে গিয়া 'দেখে—এক ব্যাঘ্র জল পিয়ে সেইখানে।'

রঘুনাথ ধ্যানাবেশে আছেন বসিয়া।
ব্যাঘ্র বনে গেলা তাঁর নিকট হৈয়া ॥
কতক্ষণে রঘুনাথ চাহে চারিপানে।
দেখেন শ্রীসনাতন আইসেন স্নানে ॥
ভূমেতে পড়িয়া সনাতনে প্রণমিল।
সনাতন স্নেহবশে আলিঙ্গন কৈল ॥
রঘুনাথ প্রতি স্নেহে কহে ধীরে ধীরে।
বৃক্ষতল হৈতে এবে রহিবে কুটীরে ॥
জানাইয়া বিশেষ গোসাঞি গেলা স্নানে।
কুটীরের আরম্ভ হৈল সেই দিনে ॥
অন্য হিত হেতু রঘুনাথ সেই হৈতে।
রহিলেন কুটীরে গোসাঞির আজ্ঞামতে ॥ —ভ. র. ৫৷৫৫৭-৫৬২

রাধাকুণ্ডতীরে রঘুনাথের নিত্যকৃত্য ছিল এই,—

অন্নজল ত্যাগ কৈল অন্য কথন।
পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করেন লয়ে লক্ষ নাম।
সহস্র বৈষ্ণবে করে নিত্য পরণাম ॥
রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন ॥

তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন মান ॥
সার্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা সেহো নহে কোন দিনে ॥

—চৈ. চ. ১।১০।৯৬-১০০

এইভাবে দিন যাপন করিতে করিতে একদিন অন্তিমদশা উপস্থিত হইল। রাধাকুণ্ড তটে রাধাকৃষ্ণ নাম জপ করিতে করিতে শ্রীরাধাচরণে তিনি স্থান লাভ করিলেন। বৃন্দাবনে আর একবার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

তিরোভাব

অন্যান্য গোস্বামীদের তিরোধানকাল সম্পর্কে যেরূপ নানা সন তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে, সেইরূপ রঘুনাথ দাসের তিরোধান সম্পর্কেও নানা মত প্রচলিত দেখা যায়। বিভিন্ন বৈষ্ণবগ্রন্থে যে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত রহিয়াছে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন	Chaitanya and his Companions	p. 144	১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ
সতীশচন্দ্র মিত্র	সপ্ত গোস্বামী	পৃঃ ৩৫৪	১৫৮৩ „
পুলিনবিহারী দাস	বৃন্দাবন কথা	পৃঃ ১০৯	১৫৮১ „
হরিলাল চট্টোপাধ্যায়	বৈষ্ণব ইতিহাস	পৃঃ ৬৮	১৫৭৪ „
মুরারিলাল অধিকারী	বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শিনী	পৃঃ ১১২	১৫৮৭ „
জগদ্বন্ধু ভদ্র	গৌরপদতরঙ্গিণী	পৃঃ ৩৮	১৫৮২ „
মধুসূদন বাচস্পতি	গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাস	পৃঃ ১৬৩	১৫৮৬ „

ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ বলিয়াছেন যে, ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে সনাতন ও রূপের দেহত্যাগের পরও রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট ইত্যাদি জীবিত ছিলেন।[১] পূর্বেই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, রূপসনাতন খুব সম্ভবতঃ ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিরোহিত হন। রঘুনাথ দাস ইঁহাদের বেশ কিছু পরে তিরোহিত হন, ধারণা। প্রাপ্ত রাধাকুণ্ডের জমি কেনা দলিল হইতে জানা যায় যে, তিনি অন্ততঃপক্ষে ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।[২]

১ *The Cultural Heritage of India*, Vol. IV, 2nd. ed., p. 189
২ পরিশিষ্টে দলিলের ইংরাজী অনুবাদ দ্রষ্টব্য

রঘুনাথ দাসের রচিত গ্রন্থাবলী

লঘুতোষণীর উপসংহারে জীব কেবলমাত্র রঘুনাথ দাস রূপসনাতনের মিত্র ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি সম্পর্কে কিছু বলেন নাই। রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ভুল করিয়াই লিখিয়াছেন, 'গোস্বামিগ্রন্থের পরিচয়ে জীব আরও লিখিয়াছেন,—

রঘুনাথাভিধেয়স্য তয়োর্মিত্রত্বমীয়ুষঃ।
স্তবমালা দানমুক্তাচরিতঃ কৃতিমুদিতম্॥'[১]

মূলতঃ ইহা জীবশিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারীর উক্তি যাহা নরহরি চক্রবর্তী তাঁহার ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

নরহরি চক্রবর্তী কৃষ্ণদাস অধিকারীর অনুসরণে লিখিয়াছেন,—

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গ্রন্থত্রয়।
স্তবমালা নাম স্তবাবলী যারে কয়॥
শ্রীদানচরিত মুক্তাচরিত মধুর।
যাহার শ্রবণে মহাদুঃখ হয় দূর॥ —ভ. র ১।৮৩০-৮৩২

দানচরিত গ্রন্থটি দানকেলিচিন্তামণিকেই উদ্দিষ্ট করিতেছে। ছন্দানুরোধে এবং মুক্তাচরিতের সহিত সাদৃশ্যবিধানের জন্যই সম্ভবতঃ দানচরিত বলা হইয়াছে।

দানকেলিচিন্তামণি—রাধামাধবের দানলীলা বর্ণনা এই গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়। নন্দমহারাজের ভ্রাতা ও মন্ত্রী উপানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র সুভদ্রের পত্নী কুন্দলতা এই গ্রন্থের শ্রোত্রী এবং তাঁহার সখী সুমুখী ইহার বক্তা। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু রূপের দানকেলিকৌমুদীর মতই। বসুদেবের যজ্ঞে রাধা এবং অন্যান্য গোপীরা ঘৃত লইয়া চলিয়াছেন। কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতে ঘাটোয়াল সাজিয়া বসিয়া আছেন। কৃষ্ণ রাধা এবং তাঁহার সখীদের নিকট কর দাবী করিলেন। এই কর— রাধা ও তাঁহার সখীদের অঙ্গসম্ভোগের প্রার্থনা, ফলে গোপীরা এইরূপ কর দিতে অস্বীকার করিলেন। উভয় পক্ষে বাদবিতণ্ডা চলিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত নান্দীমুখীর মধ্যস্থতায় শান্তিবিধান হইল। নির্জন গিরিগুহায় মিলনান্তে কৃষ্ণ গোচারণে গেলেন এবং রাধাও সখীসঙ্গে গোবিন্দকুণ্ডে যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইলেন।

রঘুনাথ দাস ইহা রূপের কৃপায় লিখিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

উদ্দামনর্মরসরঙ্গতরঙ্গকান্তং।
রাধাসরিদ্দিরি ধরার্ণব-সঙ্গমোত্থম্।

[১] শ্রীমৎ দাসগোস্বামী, পৃঃ ১০৪

শ্রীরূপচারুচরণাব্জরজঃ প্রভাবা-
দন্ধোঽপি দানকেলিমণিং চিনোমি॥

দানকেলিচিন্তামণি রচনাকালে রঘুনাথ দাস যে অন্ধত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা উপরোক্ত শ্লোক ও নিম্নোক্ত শ্লোক হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়।

দধ্যাদিদাননবকেলি রসাব্ধিমধ্যে
মগ্নং নবীনযুবরত্নযুগং ব্রজস্য
নর্মালিহৃদ্যমুদিতদ্যুতি গৌরনীল-
মন্ধোঽপি লুব্ধ ইহ লোকিতুমুৎসুকোঽস্মি ॥

কেহ কেহ এই 'অন্ধ' শব্দের প্রয়োগকে দৈন্যোক্তি বলিয়াছেন।[১] কিন্তু তিনি যে অন্ধ হইয়াছিলেন তাহা ব্রজবিলাসস্তবে সুস্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন।

দগ্ধং বার্দ্ধক্যবন্যবহ্নিভিরলং দষ্টং দুরাদ্ধ্যাহিনা।
বিদ্ধং মামতি পারবশ্যবিশিখৈঃ ক্রোধাদিসিংহৈর্বৃতম্॥

ভক্তিরত্নাকরের কিংবদন্তীতে বিশ্বাস করিলে রূপের দানকেলিকৌমুদী রচিত হইবার কিছু পরে ইহা রচিত হইয়াছিল বলিতে হয় (ভ. র. ৫ম তরঙ্গ)।

মুক্তাচরিতম্—ইহা রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কলানৈপুণ্য ও রসানুভূতির এক অপূর্ব নিদর্শন। দ্বারকায় ষোড়শ সহস্র মহিষীর প্রীতিলাভ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের কথা ভুলিতে পারেন নাই। তিনি সত্যভামার অনুরোধে বৃন্দাবনে কিভাবে লতায় মুক্তা ফলাইয়াছিলেন সেই কাহিনী বিবৃত করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় হংসী ও হরিণী নামে গাভীদ্বয়কে মুক্তা দিয়া সাজাইবেন বলিয়া শ্রীরাধার নিকট ও অন্যান্য গোপীদের কাছে মুক্তা চাহিলেন। কেহই তাঁহাকে মুক্তা দিলেন না। তখন তিনি মাকে যাইয়া বলিলেন যে তিনি মুক্তার চাষ করিবেন। অতএব জমিতে বুনিবার জন্য কিছু মুক্তা তাঁহাকে দেওয়া হউক। মা বুঝাইলেন যে মুক্তা গাছে ফলে না তথাপি ছেলের আগ্রহ দেখিয়া বাৎসল্যবশতঃ তিনি কিছু মুক্তা দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উহা জমিতে বুনিলেন। পরে গোপীদের যাইয়া বলিলেন যে তাঁহারা যদি তাঁহার মুক্তার ক্ষেতে দুধ সেচন করেন তাহা হইলে মুক্তা ফলিলে উহার অংশ তাঁহাদিগকে দিবেন। কিন্তু গোপীরা তাঁহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে তিনদিন পরে মুক্তালতা অঙ্কুরিত হইল ও ভালো ভালো মুক্তা ফলিতে আরম্ভ করিল। গোপীরা তাঁহার নিকট কয়েকটি মুক্তা চাহিলে তিনি দিতে অস্বীকার করিলেন। কেননা তাঁহার মুক্তার চাষে তাঁহারা কোনরূপ সাহায্য করেন নাই। তখন শ্রীরাধার সখীরা স্থির করিলেন

[১] শ্রীশ্রীব্রজধাম ও গোস্বামিগণ, পৃঃ ১৩২

যে তাঁহারাও মুক্তার চাষ করিবেন। গুরুজনদিগকে না জানাইয়া তাঁহারা ঘরে যত কিছু মুক্তা ছিল সব আনিয়া মাঠে বুনিলেন। মুক্তা তো ফলিলই না, উপরন্ত বীজরূপে ব্যবহৃত মুক্তাগুলিও চুরি গেল। এদিকে ঘরে গুরুজনেরা মুক্তা নাই দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিবেন আশঙ্কায় তাঁহারা ব্যাকুল হইলেন। তাঁহারা কিছু মুক্তা পাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অনেক করিয়া ধরিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সহজে উহা দিতে রাজি হইলেন না। তখন সখীরা বলিলেন যে রাধা ব্রজেশ্বরী একথা সর্বজনপ্রসিদ্ধ। তাঁহার জমিতে শ্রীকৃষ্ণ যখন চাষ করিয়াছেন তখন ফসলের একাংশ অবশ্যই রাধার প্রাপ্য। সখীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অনেক হাস্যপরিহাসযুক্ত বাদানুবাদ হইল। শ্রীকৃষ্ণ মুক্তার দাম হিসাবে রাধা ও তাঁহার সখীদের অঙ্গসাজ দাবী করিলেন। তাঁহারা উহা দিতে রাজী হইলেন না। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখা মধুমঙ্গল ও সুবলের হাত দিয়া রাধাকুণ্ডের কুঞ্জে রাধার ও তাঁহার সখীদের জন্য প্রচুর মুক্তা পাঠাইয়া দিলেন। এই কাহিনী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অধৈর্য হইয়া সত্যভামার সম্মুখেই বিলাপ করিতে লাগিলেন 'হায়, যিনি আমার বুকের চাঁপা ফুলের মালার মত, যিনি আমার নয়নকমলকে সুধাসিক্ত করেন, যাঁহার সর্বাঙ্গের শ্রী আমার একমাত্র বিলাসের স্থান, যিনি আমার অভিলষিত সম্পত্তিস্বরূপা, যিনি আমার প্রাণের আশ্রয়লতা এবং জীবনের ঔষধস্বরূপা, হায় আমি কত দিনে সেই শ্রীরাধাকে ('শ্রীরিয়ং') পাইব। পরে তিনি সত্যভামাকে বলিলেন, 'তুমিই আমার জীবনৌষধ-স্বরূপা শ্রীরাধা হও'। সত্যভামা রোমাঞ্চিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিজের বস্ত্রাঞ্চল দিয়া বীজন করিতে লাগিলেন।

ইহা গদ্যপদ্যময় চম্পূজাতীয় রচনা। জীবের ইচ্ছায় ও রূপের শিক্ষায় এই গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া দাস গোস্বামী উপসংহারে বলিয়াছেন।

যস্যাজ্ঞাসুধয়া প্রবোধিতধিয়া মুক্তাচরিত্রৈর্ময়া
গুম্ফঃ পুষ্পভরৈর্বাধায়ি য ইহ শ্রীরূপসংশিক্ষায়া।
জীবাখ্যস্য মদেবাজীবিততনোস্তস্যৈব দৃক্‌ষট্‌পদী
ঘ্রাণৈস্তং পরিভূষিতং নু তনুতাং তৎকেলিশীধুৎকধীর॥

মুক্তাচরিত উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে যে ধৃত হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। উজ্জ্বলনীলমণি ১৫৫৪ খৃস্টাব্দের পূর্বে রচিত। সুতরাং মুক্তাচরিতও ১৫৫৪ খৃস্টাব্দের পূর্বে রচিত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। মুক্তাচরিতে রঘুনাথ দাস গ্রন্থশেষে কবিভূপতি কৃষ্ণদাসের কথা যেভাবে বলিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় এই গ্রন্থ রচনাকালেও তিনি অন্ধ ছিলেন এবং কৃষ্ণদাস তাঁহাকে লেখার কার্যে সাহায্য করিয়াছিলেন।

যস্যসঙ্গবলতোঽদ্ভুতাময়া, মৌক্তিকোত্তমকথাপ্রচারিতাঃ।
তস্য কৃষ্ণকবিভূপতের্ব্রজে, সঙ্গতি র্মে ভবতু ভবে ভবে॥

স্তবাবলী—মনে হয় গ্রন্থটি স্তবমালা নামেই রচিত হইয়াছিল। পরে জীব রূপ-গোস্বামীর স্তবসংকলনের নাম স্তবমালা রাখিলে ইহা স্তবাবলী নামে খ্যাত হয়। সাধনদীপিকায় আছে—'শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদানাং মুক্তাচরিত-স্তবমালাদি' (৯ম কক্ষা)। নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকরে বলিয়াছেন 'স্তবমালা নাম স্তবাবলী যারে কয়' (প্রথম তরঙ্গ)। স্তবাবলীতে মোট ২৯টি স্তব আছে। ইহাদের রচনাকালের ব্যাপ্তি বেশ কয়েক বৎসর হইবে মনে হয়। স্তবাবলীর 'রাধাষ্টক' ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উদ্ধৃত হওয়ায় এই স্তবটি ১৫৪১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত জানা যাইতেছে। তেমনই ইহার ব্রজবিলাসস্তবটির আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে ইহা রঘুনাথ দাসের বার্ধক্যে রচিত জানা যায়। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত স্তবাবলীর মুকুন্দাষ্টক (পৃঃ ৪২৯) ও রূপের স্তবমালার মুকুন্দাষ্টক (পৃঃ ৭৬) একই রূপ দেখা যায়। পুরীদাসের সংস্করণেও একই স্তব দুই জনের গ্রন্থে ধৃত হইয়াছে। পুরীদাস বহু পুথি অবলম্বনে এইগুলি সম্পাদন করেন। সুতরাং এই একই স্তব উভয়ের নামে বিভিন্ন পুঁথিতে রহিয়াছে ধারণা করা যায়।

বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত স্তবমালা ও স্তবাবলীর পুঁথিগুলিতেও একই মুকুন্দাষ্টক উভয়ের নামে ধৃত হইয়াছে (স্তবমালা পুঁথি নং ২১২-২১৭, স্তবাবলী পুঁথি নং ২২৪)। ইহার ফলে এই স্তবের প্রকৃত রচনাকার কে তাহা বলা কঠিন। ইহা রঘুনাথ দাসের রচনা হইয়া থাকিলে জীব স্তবমালায় ইহা ধরিলেন কেন? এই মুকুন্দাষ্টকটি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উদ্ধৃত হইয়াছে (২।১।৩৪৯)। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু রচনাকালে রূপ কি কেবল এই অষ্টকটি মাত্র লিখিয়াছিলেন? স্বরচিত অন্য কোন অষ্টক তিনি ধরেন নাই, এইরূপ দেখা যায়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রঘুনাথ দাসের রাধাষ্টক উদ্ধৃত হইতে দেখিয়া মনে হয় যে রঘুনাথ দাস এই সময়ে আরও কয়েকটি অষ্টক লিখিয়া থাকিবেন। মুকুন্দাষ্টক তাহার অন্যতম। রূপের রচনাতে যেরূপ অনুপ্রাস আধিক্য, মধুর শব্দযোজনা ও ছন্দহিল্লোল পাওয়া যায়, রঘুনাথ দাসের রচনায় সে রকম পাওয়া যায় না। মুকুন্দাষ্টক স্তবটি পাঠ করিলে রঘুনাথ দাসের রচনার সঙ্গে ইহার বেশী সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সেই দিক হইতে ইহা রঘুনাথ দাসের রচনা বলিয়া অনুমান হয়।

এই গ্রন্থে মোট উনত্রিশটি স্তব সংকলিত হইয়াছে। এই স্তবগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল,—

শচীসুন্বষ্টক, গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু, মনঃশিক্ষা, প্রার্থনা, গোবর্ধনাশ্রয়দশক গোবর্ধনবাসপ্রার্থনাদশক, রাধাকুণ্ডাষ্টক, ব্রজবিলাসস্তব, বিলাপকুসুমাঞ্জলি, প্রেমাপূরাভিধ-স্তোত্র, প্রার্থনা-গ্রন্থকর্তুঃ, স্বনিয়মদশক, রাধিকাষ্টোত্তর-শতনামস্তোত্র, রাধিকাষ্টক,

প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্যস্তবরাজ, স্বসঙ্কল্পপ্রকাশ স্তোত্র, রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলরসকেলি, প্রার্থনামৃত, নবাষ্টক, গোপালরাজস্তোত্র, মদনগোপালস্তোত্র, বিশাখানন্দদস্তোত্র, মুকুন্দাষ্টক, উৎকণ্ঠাদশক, নবযুবদ্বন্দ্বদিদৃক্ষাষ্টক, অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টক, দাননির্বর্ত্তনকুণ্ডাষ্টক, প্রার্থনাশ্রয়চতুর্দশক ও অভীষ্টসূচন।

স্তবগুলিতে ছন্দ, অলঙ্কার এবং রসের ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটিয়াছে। প্রতিটি স্তবই প্রসাদগুণযুক্ত ও মাধুর্যমণ্ডিত। সর্বোপরি স্বতঃপ্রণোদিত হৃদয়াবেগ ও রসভাবের ব্যঞ্জনায় সহৃদয় ভক্ত ও পাঠকমাত্রেরই আস্বাদনীয় ও উপভোগ্য।

বনবিহারী বিদ্যালংকারকৃত স্তবাবলী 'কাশিকা' নামে একটি টীকা পাওয়া যায়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন, স্বরূপদামোদরের ন্যায় রঘুনাথ দাসও কড়চা আকারে শ্রীচৈতন্যের কিছু কিছু জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন।

স্বরূপগোসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এহ দুই কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ ॥ —চৈ. চ. ৩।১৪।৭

এই কড়চা এ পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় নাই। মনে হয়, রঘুনাথ দাস চৈতন্যাষ্টক, গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যবিষয়ক যে স্তবগুলি লিখিয়াছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহাকেই উদ্দিষ্ট করিতে চাহিয়াছেন।

এই তিনটী স্তব ছাড়াও রঘুনাথ দাস কৃত কয়েকটি শ্লোক পদ্যাবলীতে রূপ কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে। এইগুলি রঘুনাথ দাসের পূর্ব-উক্ত তিনটি গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই।

১

গোপীশ্বরীবদনফূৎকৃতিলোলনেত্রং
জানুদ্বয়েন ধরণীমনু সঞ্চরন্তম্।
কঞ্চিন্নবস্মিতসুধা-মধুরাধরাভং
বালং তমালদলনীলমহং ভজামি ॥ ১৩১

—ডঃ সুশীলকুমার দে সং, পৃঃ ৫৫

২

তল্পং কল্পয় দূতি পল্লবকুলৈরন্তর্লতামণ্ডপে
নির্বন্ধং মম পুষ্পমণ্ডনবিধৌ নাদ্যাপি কিং মুঞ্চসি।
পশ্য ক্রীড়দমন্দমন্ধতমসং বৃন্দাটবীং তন্তরে
তদ্গোপেন্দ্রকুমারমত্র মিলিতপ্রায়ং মনঃ শঙ্কতে ॥ ২১২

—ডঃ সুশীলকুমার দে সং, পৃং ৬২

Deccan College Paper (Mss. No. 67 of 1873-74)-এ ইহা রূপস্য লিখিত আছে।

৩

প্রথয়তি ন তথা মমাতিমূৰ্চ্চৈঃ
সহচরি বল্লবচন্দ্রবিপ্রয়োগঃ।
কটুভিরসুরমণ্ডলৈঃ পরীতে
দনুজপর্তেনগরে যথাস্য বাসঃ॥ ৩৩১

—ডঃ সুশীলকুমার দে সং, পৃঃ ১৪৯

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত পদ্যাবলীতে বীরচন্দ্র গোস্বামীর যে টীকা যুক্ত আছে তাহাতে ইহা রাঙ্গের লেখা বলা হইয়াছে 'রাঙ্গস্য পদ্যেন বর্ণয়তি প্রথয়তীতি' (পৃঃ ৩১৫)।

৪

আশৈকতন্তুমবলম্ব্য বিলম্বমানা
রক্ষামি জীবসবধির্নিয়তো যদি স্যাৎ।
নোচেদ্বিধিঃ সকললোকহিতৈককারী
যৎকালকূটমসৃজত্তদিদং কিমর্থং॥ ৩৩৫

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং, পৃঃ ৩১৪

বীরচন্দ্র গোস্বামীর টীকাতে ইহা রঘুনাথ দাসের বলা হইয়াছে 'পুনর্বাহ্যস্ফূর্ত্যা দুরন্তবিরহমসহমানা স্বমনঃ প্রতি যদাহ তৎ শ্রীরঘুনাথ দাসস্য পদ্যেন বর্ণয়তি অশেতি'। ডঃ সুশীলকুমার দে ইহা 'হরি' রচিত বলিয়াছেন।

৫

প্রসর শিশিরামোদং কৌন্দং সমীর সমীরয়
প্রকটয় শশিন্নাশাঃ কামং মনোজ সমুল্লস।
অবধি দিবসঃ পূর্ণঃ সখ্যো বিমুঞ্চত তৎকথাং
হৃদয়াধুনা কিঞ্চিৎ কর্তুং মমাদ্য কিলেচ্ছতি॥ ৩৩৮

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং, পৃঃ ৩১৬

বীরচন্দ্র গোস্বামীর টীকাতে ইহাও রঘুনাথ দাসের বলা হইয়াছে "বিরহাসহ্যত্বান্মরণমেব নিশ্চিত্য প্রলপন্তী স্বসখীং প্রতি যদাহ তদ্রঘুনাথস্য পদ্যেন দর্শয়তি প্রসরেতি।" ডঃ সুশীলকুমার দে ইহা 'রুদ্র' কৃত লিখিয়াছেন।

রঘুনাথ দাসের নামে কয়েকটি বাংলা পদ পাওয়া যায়। গোস্বামী রঘুনাথ দাস গৌড়ীয় ছিলেন। তাঁহার পক্ষে বাংলা পদরচনা অসম্ভব নহে। তবে এইগুলি রঘুনাথ দাসের লেখা কিনা সঠিক করিয়া বলা যায় না। 'পদকল্পতরু'-তে ধৃত তিনটি পদ এবং অন্যান্য মুদ্রিত গ্রন্থ ও পুঁথিতে ধৃত তিনটি পদ—মোট ছয়টি পদের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

১

জয় জয় শ্রীজয়- দেব দয়াময়
পদ্মাবতী রতিকান্ত ।
রাধামাধব প্রেমভরতি রস
উজ্জ্বলমূরতি নিতান্ত ॥
শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ সুধাময়
বিরচিত মনোহর ছন্দ ।
রাধাগোবিন্দ নিগূঢ় লীলাগুণ
পদ্মাবলী-পদবৃন্দ ॥
কেন্দুবিল্ববর ধাম মনোহর
অনুক্ষণ স্বরয়ে বিলাস ।
রসিক ভকতগণ যো সরবস ধন
অহিনিশি রহ তছু পাশ ।
যুগলবিলাস গুণ করু আস্বাদন
অবিরত ভাবে বিভোর ।
দাস রঘুনাথ ইহ তছু গুণ বর্ণন
কিয়ে করব নব ওর ॥

—পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড

২

চন্দ্রবদনী ধনী, মৃগনয়নী
রূপে গুণে অনুপমা রমণীমণি,
মধুরিম হাসিনী কমল বিকাশিনী
মতিম হারিণী কম্বুকণ্ঠিনী।
থির সৌদামিনী গলিত কাঞ্চন জিনি
তনুরুচি ধারিণী পিকবচনী ॥
উজর লম্বি বেণী মেরুপর যেন ফণী
আভরণ বহুমণি, গজগামিনী ।
বীণা পরিবাদিনী চরণে নূপুরধ্বনি
রতিরসে পুলকিতা জগমোহিনী ॥
সিংহ জিনি মাঝা ক্ষীণী তাহে মণি কিংকিণী
কাঁপি উছলি তনু, পদ অবনী ॥

বৃষভানু নন্দিনী জগজনবন্দিনী
দাস রঘুনাথ পঁহু মনোহারিণী ॥

—পদকল্পতরু, ৪র্থ খণ্ড

৩

হরল সকল সন্তাপ জনমকো
মিটত তলপ চমকাল কি
আরতি কিয়ে মদন গোপাল কি ।
গোঘৃত রচিত কর্পূর কি বাতি
ঝলকত কাঞ্চন থাল কি ॥
ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ ঝাঁঝরী বাজত
বেণু বিশাল কি ।
চন্দ্রকোটি জ্যোতি ভানু কোটিছবি
মুখশোভা নন্দলাল কি ॥
ময়ূর মুকুট পীতাম্বর শোহে
উরে বৈজয়ন্তি মাল কি ।
চরণ কমলোপর নূপুর বাজে উরুপর
বৈজয়ন্তি মাল কি ॥
সুন্দর লোল কপোল ছবি মো
নিরখত মদন গোপাল কি ॥
সুরনর মুনিগণ করতহি আরতি
ভক্ত বৎসল প্রতিপাল কি ।
ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি
অঞ্জলি কুসুম গোপাল কি ।
হু বলি বলি রঘুনাথ দাস পঁহু
মোহন গোকুল বাল কি ॥

—পদকল্পতরু, ৪র্থ খণ্ড

৪

আর এক কহি কথা সহোদর বন্ধু সখা
দুই চারিজন মোর আছে ।
কহি শুণ তার কথা পাছে হেট কর মাথা
ননী চুরি কর যার কাছে ॥

যত সব গোপনারী লইয়া দধির পসারি
মথুরায় বিকে যায় তারা।
পথ আগুলিয়া রও দধি দুগ্ধ কাড়ি খাও
একি তোমার অনুচিত ধারা॥
নারীগণ স্নান করে বসন রাখিয়া তীরে
চুরি করি রহ লুকাইয়া।
বাজাইয়া মোহন বাঁশী কুলবধূ কর দাসী
কথা কহ হাসিয়া হাসিয়া॥
খাওয়াও পরের খন্দ এখনি করিব বন্ধ
লয়্যা যাব কংসের গোচরে।
দাস রঘুনাথ কয় শুনিতে লাগয়ে ভয়
চমকিত হৈল যদুবীরে॥

—পদামৃতমাধুরী, ৩য় খণ্ড

৫

নাচ লালন মোর কানু ন হেরি অঙ্গন মাঝ।
কটি মাঝ ঘাঘর সুন্দর কেমন মধুর বাজ॥
সেবি শঙ্কর দেবী দিগম্বর ঘৃত গলা নিরে।
উচি তণ্ডুল শ্রীফলদল দিয়েছি হরের শিরে॥
কত কাটল করি রাত্রিদিন ভাসিয়া দুঃখের পুঞ্জে।
গলিত ফল করি অন্নজল যমুনা পুলিন পুঞ্জে॥
পদপঙ্কজে নূপুর বাজে হেরি জুড়ায়ত আঁখি।
খাওরে মাখন সর বহল রঘুনাথ দাস সাখি॥

—ক. বি. পুঁথি নং ৬২০৪, পৃঃ ৬

৬

শ্রীজীব গোসাঞি মোর প্রেমরত্ন সাগর
ওহে প্রভু কৃপা কর মোরে।
মুঞি পামর জনে বড় সাধ করি মনে
তুয়া গুণ গাইবার তরে॥
শ্রীরূপ সনাতন অনুপম সুমধ্যম
রামপদে দৃঢ় যার মতি।
তাঁহার তনয় জীব সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত
প্রকাশিল শ্রীরূপসংহতি॥

বৈরাগ্য জন্মিল মনে রাজ্য ছাড়ি সেইক্ষণে
চলিলা শ্রীনবদ্বীপপুরী।
প্রভু নিত্যানন্দ দেখি ছলছল করে আঁখি
পড়িল চরণ যুগে ধরি॥
মস্তকে চরণ দিয়া দুই বাহু পসারিয়া
উঠাইয়া করিলেন কোলে।
প্রেমে গদগদ হঞা দৈন্য তার প্রকাশিয়া
কান্দিতে কান্দিতে কিছু বলে॥
প্রভু নিত্যানন্দ নাম জগতের পরিত্রাণ
সব জীবে আনন্দ করিলা।
মো হেন পতিত জনে কৃপা কৈল নিজগুণে
ব্রহ্মার দুর্লভ ধন দিলা॥
মহাপ্রভু তোমার গণে দিয়াছেন দন্তভূমে
শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবন।
শ্রীমুখের আজ্ঞা পাঞা আনন্দ হইয়া হিয়া
ব্রজপুরে করিলা গমন॥
কৃষ্ণ নাম সদা মুখে নেত্রজল বহে মুখে
এইরূপে পথ চলি যায়।
প্রভু রূপসনাতন কবে পাব দরশন
প্রাণ মোর রাখ মহাশয়॥
কভু কর জলপান কভু চানা চর্ব্বণ
কতদিনে মথুরা পাইলা।
দেখি শোভা মধুপুরী প্রেমে পড়ি ঘুরি ঘুরি
ধীরে ধীরে বিশ্রান্তি হইলা।
যমুনাতে কৈল স্নান করি কিছু জলপান
সেই রাত্রে তাঁহা কৈল বাস।
প্রাতে আইলা বৃন্দাবনে দেখি রূপসনাতনে
প্রভু সব পুরাইল আশ॥
শ্রীগোপালচম্পু নাম গ্রন্থ কৈল অনুপাম
ব্রজনিত্য লীলারসপুর।
ষট্সন্দর্ভ আদি করি যাহাতে সিদ্ধান্ত করি
পড়ি শুনি ভক্তি হৈলা সুর॥

উজ্জ্বল প্রেমের তনু রসে নিরমিলা জনু
ভাব অলংকৃত সব অঙ্গ।
পড়িতে শ্রীভাগবত ধৈরজ না ধরে চিত
সাত্ত্বিকে ব্যাপিত সব অঙ্গ ॥
যুগল ভজন সার বিলসই সদা যাঁর
বৃন্দাবন বিহার সদাই।
গোলোক সম্পুট করি তাহাতে সে প্রেম ধরি
সম্বরণ করিল গোসাঞি ॥
মুঞি অতি মূঢ়মতি তোমা বিনু নাহি গতি
শ্রীজীব জীবনপ্রাণধন।
বহু জন্ম পুণ্য করি দুর্লভ জনম ধরি
পাইয়াছি শ্রীজীবচরণ ॥
শ্রীজীব করুণাসিন্ধু স্পর্শি তার এক সিন্ধু
প্রেমরত্ন পাবার লাগিয়া।
কহে রঘুনাথ দাস তুয়া অনুগত আশ
রাখ তোমার পদছায়া দিয়া ॥

—বৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার পৃঃ ৬৬৪, পাঁচতোপী পুঁথি পৃঃ ২৫৩

রঘুনাথ দাসের নামে আরোপিত গ্রন্থ ও স্তবাদি

বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ (১৩৩০, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা পৃঃ ১৮৭)। নামক একটি পত্রিকায় রঘুনাথ দাসের নামে একটি পদ্যরচনা মুদ্রিত হইয়াছে। রচনাটির নাম—'হরিনাম মহামন্ত্রের অর্থ—শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামী কর্তৃক ব্যাখ্যাত'। আরম্ভ এইরূপ—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥' অস্যার্থঃ—একদা কৃষ্ণবিরহাদ্ধ্যায়ন্তী প্রিয়সঙ্গমং মনোদুঃখনিরাসার্থং জল্পতীদং মুহুর্মুহুঃ। হরে কৃষ্ণেত্যাদি, হে হরে স্বমাধুর্য্যেন প্রথমং মচ্চেতো হরসি॥ তত্র হেতুঃ হে কৃষ্ণেতি কৃষ্ শব্দস্য সর্বার্থে ন চ আনন্দস্বরূপ ইতি স্বার্থেন সর্বাদিক পরমানন্দেন প্রলভ্যেতি ভাবঃ।

অন্ত্য এইরূপ—রাম পুনস্তাং পুরুষোচিতাং কৃত্বা রময়তি রামস্তস্য সম্বোধনে রাম। রাম পুনস্তত্র রমতে রাম স্তস্য সম্বোধনে রাম। হরে পনঃ রাসান্তে কৃষ্ণস্য মনো হৃত্বা গচ্ছতীতি হর রাধা তস্যাঃ সম্বোধনে হরে। রাধায়া মনো হৃত্বা গচ্ছতীতি হরিঃ কৃষ্ণস্তস্য সম্বোধনে হরে।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত হরিনাম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। রঘুনাথ দাস এইরূপ ভাষাতে হরিনাম ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার Notices of Skt. Mss (Vol. VI, p. 214 No. 2153)-এ সারাৎসারতত্ত্বসংগ্রহ নামে একটি গ্রন্থ রঘুনাথ কৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আরম্ভ এইরূপ ঃ অন্তর্দ্ধান্তবিনাশায় [illegible] চ।
করুণাসিন্ধুরূপায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
গৌরাঙ্গতপ্তহেমাঙ্গং ধৃতশুদ্ধাম্বরোজ্জ্বলং।
কৃপালুং পরমানন্দং বন্দে প্রেমোৎসবপ্রদং ॥
শ্রীকৃষ্ণং রাধিকাকান্তং ত্র্যধীশং জগতাং গুরূং।
গোবিন্দং সচ্চিদানন্দং বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরং ॥
গুরুঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণনাম তদ্‌ভক্তিস্তজ্জনস্তথা।
এতে পঞ্চ নিরূপ্যন্তে ত্যক্ত্বা তদ্বিমুখান্ জনান্ ॥
গুরুঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণনাম সারাৎসারং পরাৎপরং।
তদ্‌ভক্তিরপি উৎকৃণ্টা তৎপরোঽপি তথা জনঃ ॥

অন্ত্য এইরূপ ঃ ততোদুৎসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সদ্যেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য হিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥

ইতি সারাৎসারতত্ত্বসংগ্রহে পঞ্চ তত্ত্বোপাখ্যানে ষষ্ঠবিবেকঃ। পুষ্পিকাতে কোন গ্রন্থকারের নাম নাই। বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরে এই গ্রন্থের একটি পুঁথি আছে (বিবিধ ৭০ গ)। ইহাতেও কোন গ্রন্থকারের নাম দৃষ্ট হয় না। এই পুঁথির আরম্ভ ও অন্ত্য অনুরূপই দেখা যায়।

অফ্রেতের Catalogus Catalogorum (Vol. I, p. 186)-এ রঘুনাথ দাস রচিত বলিয়া গুণলেশসুখদ ও সুরাবলী নামক দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। কিন্তু ইহাদের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। উক্ত Catalogus Catalogorum (Vol. III, p. 59)-এ রঘুনাথ দাসের নামে একটি দানকেলি-কৌমুদীর টীকার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু রঘুনাথ দাস দানকেলিকৌমুদীর উপর কোন টীকা লিখিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না।

India Office Catalogue (Vol. VII, p. 1466-67 No. 3886)-এ রঘুনাথ দাস কৃত বলিয়া বিলাপকুসুমাঞ্জলির একটি টীকা উল্লিখিত হইয়াছে। আরম্ভ এইরূপ—হে রূপমঞ্জরি সখি অস্মিন্ পুরে ত্বং প্রথিতা স্যাৎ কিং খ্যাতা পরস্য পুংসো বদনং ন হি পশ্যসি ইতি খ্যাতা উত ভো অনাগত কর্ত্তৃকায়াঃ মে তব বিম্বাধরে যৎক্ষতং তৎ কিং শুকপুঙ্গবেন ব্যধায়ি কিমকরি।

পুষ্পিকা ঃ ইতি শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিনা বিরচিতা শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি-টীকা সমাপ্তা।

বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরে এই টীকার অনুরূপ একটি বিলাপকুসুমাঞ্জলির পুঁথি আছে (কস্য ১৮৪ নং)। কিন্তু রচয়িতার নাম কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না।

রঘুনাথ দাসের গ্রন্থানুবাদ

বিভিন্ন গ্রন্থাগার অনুসন্ধান করিয়া রঘুনাথ দাস কৃত সংস্কৃত গ্রন্থগুলির কয়েকটি বাংলা অনুবাদ গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

মুক্তাচরিত—ইহার তিনজন অনুবাদকের পরিচয় পাওয়া যায়। অনুবাদক ত্রয়ের নাম যথাক্রমে নারায়ণ দাস, যদুনন্দন দাস ও স্বরূপ ভূপতি। নারায়ণ দাসের মুক্তাচরিতের অনুবাদ হরিদাস দাস কর্তৃক নবদ্বীপ হইতে ৪৮৫ গৌরাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার আরম্ভ ও অন্ত্য এইরূপ,—

জয় জয় মহাপ্রভু চৈতন্য ঈশ্বর।
অবতীর্ণ নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ শশধর॥
দেখ অপরূপ কলিযুগে ত বিলাস।
শুভচন্দ্র গৌরচন্দ্র দুইর প্রকাশ॥
শুভচন্দ্রে গৌরচন্দ্রের উদয় দেখিয়া।
দিন দিন ক্ষীণ হয় বিষণ্ণ হইয়া॥
শুভচন্দ্র হয়ে কেবল কুমুদের বন্ধু।
জগজ্জনের বন্ধু হয়ে গৌর ইন্দু॥
পাপকলঙ্ক শুভচন্দ্রের হৃদয়।
গৌরচন্দ্র নামে পাপ তাপ দূর যায়॥

* * *

হেন গৌরচন্দ্রপদে করিয়া প্রণাম।
মুকুতাচরিত্র গ্রন্থ করিব ব্যাখ্যান॥
মুক্তাচরিত্র কহে নারায়ণ দাসে॥

সমাপ্তিকাল নিম্নরূপ দেওয়া আছে,—

ঋতুবেদবসুচন্দ্র গণনা শকেতে।
মুক্তাচরিত ভাষা হইল বিদিতে॥

স্বরূপ ভূপতি ও যদুনন্দন দাসের অনুবাদের দুইটি পুঁথি বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত আছে। স্বরূপ ভূপতির অনুবাদের একটি পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

গ্রন্থাগারেও আছে (পুঁথি নং ১২৬৮)। স্বরূপ ভূপতি অনূদিত মুক্তাচরিতের (বরাহনগর অনুবাদ পুঁথি নং ২৭) আরম্ভ এইরূপ,—

গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনে এক মূর্তি।
বন্দিল এ তিনের পদ করিয়া বিনতি॥
শ্রীচৈতন্যের নাম ধরে যেবা তার পায় নতি।
দীনহীন জড় মুই স্বরূপ ভূপতি॥
কোটি কাম জিনি বেশ অতি মনোহর।
স্ফুরন্দীবর জিনি বাবলছন্দর॥
জগতমোহন ভরি লীলার মাধুরী।
ব্রজেন্দ্রনন্দন পদে নমস্কার করি॥
ক্রয় বিক্রয় মহাসঙ্গ ক্রীড়ার সাগরে।
অঞ্জিল মুকুতার লতা ব্রজের ভিতরে॥ ইত্যাদি

যদুনন্দন দাস অনূদিত মুক্তাচরিতের (বরাহনগর অনুবাদ পুঁথি নং ২৬) আরম্ভ এইরূপ :

কোটি কাম জিনি তনু জ্যোতি কোটি চন্দ্র জনু
ইন্দীবর নিন্দি কান্তিবর।
জগত মোহন করে হেন লীলা যেই ধরে
বন্দো নন্দনন্দন সুন্দর।
ভূমোৎপত্তি মুক্তামালা তার ক্রয়বিক্রয় খেলা
সমুদ্রে সজ্জিত যার মন।
দোঁহে জয় বাঞ্ছা যার বন্দিয়ে চরণ তার
শ্রীরাধামাধব যার নাম॥
আপন উজ্জ্বল ভক্তি সুধা সমর্পিতে খিতি
উদয় হইল আচম্বিতে।
শচীগর্ভ ব্যোম মাঝে পূর্ণচন্দ্র জ্যোৎস্না সাজে
বন্দো মুঞি সেই শচীসুতে॥
শচীপুত্র যার নাম আর স্বরূপ আখ্যান
আর দুই রূপ সনাতন।
শ্রীমতী মথুরাপুরী আর শ্রীল গোষ্ঠপুরী
রাধাকুণ্ড গিরি গোবর্ধন॥

রাধামাধব আদি পাইলু যার কৃপৌষধি
বন্দো সেই গুরু গোসাঞি।
তার কৃপা লব এই এই সব যেই দেই
সেই কৃপা অনুক্ষণ চাই ॥

* * *

যাহাতে অভীষ্ট পাই কৃষ্ণলীলাগুণ গাই
কহে দাস এ যদুনন্দন ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিশালায় হরিরাম দাস ও গিরিধর দাস কৃত রঘুনাথ দাসের মনঃশিক্ষার দুইটি অনুবাদ পাওয়া যায়। নবদ্বীপ পাব্লিক লাইব্রেরীতেও গিরিধর দাসের অনুবাদটি পাওয়া যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে গিরিধর দাসের মনঃশিক্ষার দুইটি পুঁথি পাওয়া যায় (৮৩৭-৮৩৮)।

হরিরাম দাস অনুদিত মনঃশিক্ষা (ক. বি. পুঁথি নং ১১৫৪) হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হইল,—

নিবেদন শুন মন ভাই।
দেখিয়া সংসার ভয় মনে বড় বিস্ময়
ইহাতে তোমার দয়া চাই।
গুরুদেব বৃন্দাবনে আর ব্রজবাসি জনে
কৃষ্ণ আশ্রিত প্রিয়গণে।
ইষ্টমন্ত্র হরিনামে কর রতি অনুমানে
রাধাকৃষ্ণ উপাসনা জানে ॥
পদযুগ ধরি তোর না চিনিবে বোল মোর
আরতি করিবে অবধানে।
এ সব পিরিতি হৈলে ব্রজজন সঙ্গ মিলে
কহে ইহা আগম পুরাণে ॥
ছাড় তুমি দম্ভ মতি করহ অপূর্ব রতি
পুণ্য কর এই মোর আশ।
শোকভয় যুক্ত মন বাক্যে কর নিবেদন
দীনহীন হরিরাম দাস।

গিরিধর দাস অনুদিত মনঃশিক্ষা (ক. বি. পুঁথি নং ৩২৩৫) হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হইল,—

মন ভাই চাটু করি কহি পায় ধরি।
চিত্তের দম্ভতা যত সব পরিহরি ॥

শ্রীগুরু শ্রীব্রজভূমি ব্রজবাসিচয় ।
বিপ্রগণ সাধুসব শুন শুদ্ধাশয় ॥
শ্রীগোপাল মুগুচূড়া মণি হরিনাম ।
যুগলকিশোর পাদপদ্ম অনুপাম ॥
এ অতি অপূর্ব সূক্ষ্ম সভার উপর ।
সর্বভাবে ইথে রতি কর নিরন্তর ॥ ইত্যাদি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিশালাতে রাধাবল্লভদাস কৃত বিলাপকুসুমাঞ্জলির একটি অনুবাদ পাওয়া যায় (ক. বি. পুঁথি নং ১১৫২)। ইহার আরম্ভ ও অন্ত্য এইরূপ,—

আরম্ভ ঃ ব্রজপুরে খ্যাত তুমি পতিব্রতা করি ।
পরপুরুষের মুখ কভু নাহি দেখ ।
বিম্বাধরে ক্ষতচিহ্ন দেখি পরতেখ ।
ভর্তা তোমার ঘরে নাক্রি গিয়াছেন গোষ্ঠে ।
তবে কেন ক্ষতচিহ্ন দেখি তোমার ওষ্ঠে ॥

অন্ত্য ঃ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী মন অভিলাষ ।
সংস্কৃতে কৈলা যেহো বিলাপ প্রকাশ ॥
তার পায়ে অপরাধ না হউ আমার ।
সাষ্টাঙ্গ হইয়া করি কোটি নমস্কার ॥
মদীশ্বরী পাদসেবা আশে ।
বিলাপকুসুমাঞ্জলি কহে রাধাবল্লভ দাসে ॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুঁথি বিভাগে রঘুনাথ দাসের স্বনিময় দশকের একটি অনুবাদ পাওয়া যায় (ব. সা. প. পুঁথি নং ৩৬৯)। অনুবাদকের কোন পরিচয় নাই ।

আরম্ভ নিম্নরূপ ঃ অথ শ্রীরূপ শ্রীগুরু গোপাল মন্ত্রবর ।
হরিনাম প্রভুবর শ্রীশচীকোঙর ॥
দামোদর স্বরূপ শ্রীরূপসনাতন ।
এসব সঙ্গী যতেক শ্রীভাগবতগণ ॥
গিরিরাজ গোবর্ধন রাধাকুণ্ডবর ।
মধুপুরী বৃন্দাবন বরজ মণ্ডল ॥ ইত্যাদি

বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরে নিমানন্দ দাসের গৌরাঙ্গাস্তবকল্পবৃক্ষের একটি অনুবাদ পাওয়া যায় (বরাহনগর অনুবাদ পুঁথি নং ১২ খ)। কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হইল,—

মত্তগজ জিনি গতি প্রেমানন্দে ভোরা ।
বিহরে শ্রীনীলাচলে শচীসুত গোরা ॥

বদনের শোভা যার নাহিয়ে তুলনা।
বিধুকে ফুৎকার করে অখিলের জনা॥
স্বর্ণাচল জিনি অঙ্গ মাধুরি সুন্দর।
অমৃত তরঙ্গ জিনি বাক্য মনোহর॥

রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী

ছয় গোস্বামীর মধ্যে রঘুনাথ ভট্টের কথা সর্বাপেক্ষা কম জানা যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত ছাড়া অন্যান্য চৈতন্যচরিতগ্রন্থে তাঁহার সম্পর্কে তেমন কোন উল্লেখ নাই বলিলেই চলে। তিনি কোন গ্রন্থাদি লিখেন নাই। কেবলমাত্র ভাগবত পঠন-পাঠনে তাঁহার যে অসাধারণ দক্ষতা ছিল তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন,—

রূপগোসাঞির সভায় করেন ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তার মন॥
অশ্রু, কম্প, গদগদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র রোধ করে বাষ্প না পারে পড়িতে॥
পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥
কৃষ্ণের সৌন্দর্য মাধুর্য যবে পড়ে শুনে।
প্রেমেতে বিহ্বল তবে কিছুই না জানে॥

—চৈ. চ. ৩।১০।১২৬-১২৯

আবির্ভাব

গোস্বামীদের জন্মাব্দ মরণাব্দের সঠিক কাল দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নহে। বৈষ্ণব সাহিত্য লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা যেন স্বপ্নাদিষ্ট হইয়াই এইসব গোস্বামীদের জন্মাব্দ ও মরণাব্দ নির্ণয় করিয়াছেন মনে হয়। তাঁহারা কি প্রমাণ বলে এই সন তারিখ নির্ণয় করিলেন সেই বিষয়ে পাঠকদিগকে কিছু বলেন নাই। রঘুনাথ ভট্টের আবির্ভাব সম্পর্কে এইরূপ জনশ্রুতিমূলক কয়েকটি মত উল্লেখ করা হইল।

জগদ্বন্ধু ভদ্র বৈষ্ণবসাহিত্যের চর্চায় অগ্রণী ছিলেন। সুতরাং তিনি যে মত প্রচলিত করিয়াছেন, তাহাই অনেকে নির্বিচারে মানিয়া লইয়াছেন। ভদ্র মহাশয় তাঁহার গৌরপদতরঙ্গিণীতে রঘুনাথ ভট্টের আবির্ভাবকাল ১৪২৭ শক (১৫০৫ খৃষ্টাব্দ) ধরিয়াছেন। বৈষ্ণবসাহিত্য লইয়া আলোচনাকারী প্রায় সকলেই তাঁহার ঐ মত

নির্দ্বিধায় গ্রহণ করিয়াছেন। মুরারিলাল অধিকারী তাঁহার বৈষ্ণবদিগদর্শনী গ্রন্থে (পৃঃ ৩০), হরিদাস দাস গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান গ্রন্থে (৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩২৬), সতীশচন্দ্র মিত্র সপ্ত গোস্বামী গ্রন্থে (পৃঃ ২৯১) ঐ ১৪২৭ শকই (১৫০৫ খৃষ্টাব্দ) রঘুনাথ দাসের আবির্ভাব কাল হিসাবে ধরিয়াছেন, দেখা যাইতেছে।

মুরারি গুপ্তের কড়চার নাতিপ্রামাণিক চতুর্থ প্রক্রম হইতে জানা যায় যে শ্রীচৈতন্য যখন কাশীতে তপন মিশ্রের গৃহে যান, তখন তাঁহার পুত্র বালক রঘুনাথ ভট্টকে কৃপা করেন।

এবং ক্রমেণ ভগবান কাশীমুপজগামহ।
বিশ্বেশ্বর মহালিঙ্গ-দর্শনানন্দবিহ্বলঃ॥
তত্রৈব ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ তপনাখ্যঃ সুবৈষ্ণবঃ।
পশ্যন্ প্রভুং মহাহৃষ্টো নিনায় নিজমন্দিরম্॥
তেন সম্পূজিতঃ কৃষ্ণ পাদপ্রক্ষালনাদিভিঃ।
ভিক্ষাং কৃত্বা গৃহে তস্য সুখাসীনো জগদ্‌গুরুং।
তিষ্ঠতি তৎসুতেনাপি রঘুনাথেন মানিতঃ।
তস্মৈ মহাকৃপাং চক্রে বালকায় মহাত্মনে॥

—মুরারি গুপ্তের কড়চা (৪।১।১৪-১৭)

চৈতন্যচরিতামৃতেও আছে,—

রঘুনাথ ভট্টাচার্য মিশ্রের নন্দন।
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন॥
চন্দ্রশেখর ঘরে কৈল দুই মাস বাস।
তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস॥
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন।
উচ্ছিষ্ট মার্জন আর পাদসম্বাহন॥

—চৈ. চ. ১।১০।১৫১-১৫৩

শ্রীচৈতন্য কাশীতে ১৫১৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে আসেন, পূর্বে দেখাইয়াছি। ঐ সময়ে রঘুনাথ বালক ছিলেন জানা যাইতেছে। তাঁহার বয়স সেই সময় সর্বনিম্ন আট-নয় ছিল ধরিলে এবং সর্বোচ্চ পনর-ষোল ছিল ধরিলে ১৫০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫০৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আবির্ভাব সম্ভব হয়। রূপ, সনাতন রঘুনাথ এবং গোপাল ভট্টকে যেইরূপ সুহৃদ বলিয়াছেন, রঘুনাথ ভট্টকে সেইরূপ বলেন নাই। ইহা হইতে মনে হয় ইনি রূপসনাতন অপেক্ষা বয়সে বেশ কনিষ্ঠ ছিলেন।

নীলাচলে আগমন

যৌবনপ্রাপ্ত হইলে রঘুনাথ ভট্ট নীলাচলে আসেন। 'বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে (চৈ. চ. ১।১০।১৫৪)। নীলাচলে আট মাস থাকিবার পর কাশীতে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে বিবাহ না করিতে ও বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করিতে উপদেশ দিলেন।

বিভা না করিহ বলি নিষেধ করিলা॥
বৃদ্ধ পিতামাতা করহ সেবন।
বৈষ্ণব পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন॥ —চৈ. চ. ৩।১৩।১১১-১১২

চারি বৎসর কাশীতে বাস করিয়া পিতামাতার দেহান্তের পর রঘুনাথ পুনরায় নীলাচলে আসিলেন। সেখানে এবারেও আট মাস কাটাইবার পর শ্রীচৈতন্যের আদেশে বৃন্দাবনে গমন করিলেন। রূপসনাতনের নিকট তাঁহার আশ্রয় মিলিল।

প্রভু ঠাঞি আজ্ঞা লঞা আইলা বৃন্দাবন।
আশ্রয় করিল আসি রূপসনাতন॥ —চৈ. চ. ৩।১৩।১২৪

রঘুনাথ ভট্ট ভাগবত পাঠ ছাড়া রন্ধনকার্যেও সুনিপুণ ছিলেন জানা যায়।

রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ।
যেই রান্ধে সেই হয় অমৃতের সম॥
পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র ভট্টের ভক্ষণ॥

—চৈ. চ. ৩।১৩।১০৭-১০৮

চৈতন্যচরিতামৃতে আছে যে, রঘুনাথ ভট্ট তাঁহার শিষ্যকে বলিয়া গোবিন্দমন্দির নির্মাণ করেন ('নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দমন্দির করাইল'—চৈ. চ. ৩।৩।১৫০)। এই সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

তিরোভাব

আবির্ভাব কালের মত ভদ্রমহাশয়ের প্রদত্ত তিরোভাব কালকেও অনেকে অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি রঘুনাথ ভট্ট ১৫০১ শকে (১৫৭৯ খৃঃ) তিরোহিত হন, এইরূপ লেখেন।[১] কিন্তু বৈষ্ণবদিগদর্শনী গ্রন্থে (পৃঃ ৯২) রঘুনাথ ভট্টের তিরোধান কাল ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দ ও সপ্ত গোস্বামী গ্রন্থে (পৃঃ ৩০১) ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দ বলা হইয়াছে।

ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ হইতে জানা যায় যে রূপসনাতনের অপ্রকট হইবার

১ গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ৩৫

কিছু পূর্বে রঘুনাথ ভট্ট অপ্রকট হন। সুতরাং ১৫৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে তিনি অপ্রকট হইয়াছিলেন অনুমান করিতে হয়।

নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্বেশ্বর।
হইলেন সকলের নেত্র অগোচর॥
সে অতি দুঃসহ কথা করিয়া শ্রবণ।
কাশীশ্বর গোস্বামী হইলা সঙ্গোপন॥
রঘুনাথ ভট্ট ভাগবত বক্তা যেঁহ।
প্রভুর বিয়োগে অদর্শন হৈল তিঁহ॥
এই কথোদিনে শ্রীগোসাঞি সনাতন।
মো সবার নেত্র হইতে হইলা অদর্শন॥
এবে অপ্রকট হৈলা শ্রীরূপ গোসাঞি।
দেখিয়া আইনু সে দুঃখের সীমা নাঞি॥ —ভ. র. ৪।১৯৪-১৯৮

এই পয়ার কয়টিতে অনেক কালের ব্যবধানে যে সব ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা সংক্ষেপে একসঙ্গে বলিতে যাইয়া পাঠককে কেবল বিভ্রান্ত করা হইয়াছে। রঘুনাথ ভট্ট প্রভুর অদর্শনের সময় নীলাচলে ছিলেন, এইরূপ কোন প্রমাণ নাই। প্রভুর অদর্শনের পর অন্ততঃ কুড়ি একুশ বছর রূপসনাতন জীবিত ছিলেন, পূর্বে দেখান হইয়াছে। অনুরাগবল্লীতে সনাতনের পর রঘুনাথ ভট্টের অপ্রকটের কথা আছে।

লোকনাথ গোস্বামী, ভূগর্ভ গোস্বামী প্রভৃতিকে ছয় গোস্বামীর মধ্যে স্থান না দিয়া রঘুনাথ ভট্টকে ছয়গোস্বামীর মধ্যে স্থান দেওয়া হইল কেন, এ বিষয়ে মনে প্রশ্ন জাগে। ধারণা যে, খুব ভাল ভাগবতব্যাখ্যাতা ছিলেন বলিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন এবং রূপসনাতনাদির তুল্য মর্যাদার অধিকারী হইয়াছিলেন। আধুনিক কালেও প্রাণগোপাল গোস্বামী, রাধাবিনোদ গোস্বামী প্রভৃতি কথকতার নিপুণতার জন্য অসামান্য শ্রদ্ধা সম্মান পাইয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং গ্রন্থাদি না লিখিলেও এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের শাস্ত্রীয় প্রতিষ্ঠার মূলে তিনি কোন প্রত্যক্ষ সহায়তা না করিলেও রূপসনাতনাদির প্রিয়পাত্রহেতু বৈষ্ণবসমাজে ছয় গোস্বামীর একজন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায়

ছয় গোস্বামীর উপদিষ্ট সাধনরীতি

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ভজনপ্রণালী ও লীলা আস্বাদনরীতির প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং। তিনি আটটি শ্লোক ছাড়া আর কিছু লেখেন নাই, কিন্তু নিজে আচরণ করিয়া অপরকে শিক্ষা দিয়াছেন বলিয়া তিনি হইতেছেন যথার্থ আচার্য। রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মঙ্গলাচরণে তাঁহাকে নমস্ক্রিয়া উপলক্ষ্যে লিখিতেছেন যে,

হৃদি যস্য প্রেরণয়া, প্রবর্তিতোহহং বরাকরূপোহপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥ —১।১।২

হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণা পাইয়া স্বয়ং ক্ষুদ্র হইয়াও এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি সেই চৈতন্যদেব হরির পদকমল বন্দনা করি।

সনাতন গোস্বামী বৃহদ্ভাগবতামৃতের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন,—

নমঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নিরুপাধিকৃপাকৃতে।
যঃ শ্রীচৈতন্যরূপোহভূৎ তন্বন্ প্রেমরসং কলৌ॥ —১।১।১২
ভগবদ্ভক্তিশাস্ত্রাণাময়ং সারস্য সংগ্রহঃ।
অনুভূতস্য চৈতন্যদেবে-তৎপ্রিয়রূপতঃ ॥ —১।১।১১

যিনি কলিযুগে প্রেমরসবিস্তারের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই নিরুপাধি করুণাকারী শ্রীকৃষ্ণরূপ পুরুষবরকে নমস্কার করি। এই গ্রন্থ ভগবদ্ভক্তিশাস্ত্রসমূহের সারস্বরূপ এবং চৈতন্যদেবের সেবা হইতে অনুভূত, অথবা তাঁহার প্রিয় রূপ হইতে অনুভূত বলিয়া তাঁহারই সংগ্রহ। এই শ্লোক দুইটির ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ। প্রথমোক্ত শ্লোকের স্বকৃত টীকায় সনাতন স্পষ্ট বলিতেছেন যে শ্রীচৈতন্য তাঁহার গুরুবর। তিনি বহুসংখ্যক ভক্তিশাস্ত্রের সারসংগ্রহ করিতে যে সমর্থ হইয়াছেন তাহা 'চৈতন্যদেবে চিত্তাধিষ্ঠাতৃশ্রীবাসুদেবে ইত্যর্থঃ'। চৈতন্যদেবের বলিতে একদিকে চিত্তাধিষ্ঠাতৃ বাসুদেব, অন্যদিকে শচীনন্দন বুঝাইতেছে। 'প্রিয় রূপতঃ' শব্দটিও তিন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এক অর্থে চৈতন্যদেবের প্রিয়তমরূপ ত্রিভঙ্গসুন্দর বেণুবাদনপরায়ণ নন্দকিশোরস্বরূপের ধ্যানাদিরূপ হইতে, দ্বিতীয় অর্থে শচীনন্দনের প্রিয়রূপ যতিবেশধারী প্রকাণ্ড গৌরমূর্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেরের অনুভাব বিশেষ হইতে অনুভূত। তৃতীয় অর্থ এই যে চৈতন্যদেবের প্রিয় রূপ গোস্বামী নামক মহাশয় হইতে অনভূত। সনাতন বৃহদ্ভাগবতামৃতের স্বকৃত টীকায় এই তিন প্রকার ব্যাখ্যা

করিয়া একদিকে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু হইতে অনুভব পাইয়া গ্রন্থ রচনা করিতেছেন এইরূপ বলিতেছেন, অন্যদিকে রূপ তাঁহার ছোট ভাই এবং সম্ভবতঃ শিষ্য হইলেও তাঁহার নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। রূপ লঘুভাগবতামৃতের প্রারম্ভে সনাতনকে 'শ্রীমৎ প্রভুপদাম্ভোজৈঃ' বলিয়া উল্লেখ করায় মনে হয় রূপ সনাতনকে দীক্ষা বা শিক্ষাগুরু-রূপে মানিতেন। যাহা হউক, রূপ ও সনাতন দুই ভাইই সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের নিকট হইতে প্রেরণা ও অনুভূতি পাইয়াছেন। কবিকর্ণপুরও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (৯।৭৫) লিখিয়াছেন যে তাঁহার প্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, নিজানুরূপ, একরূপতাদৃশ রূপ গোস্বামীকে শ্রীচৈতন্যপ্রভু নিজ শক্তিবিস্তার করিয়াছিলেন। নরোত্তম মহাশয় প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন যে রূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের মনের অভীষ্টবিষয়কে ভূতলে প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ১৯ হইতে ২৪ পরিচ্ছেদে রূপ-সনাতনের শিক্ষা উপলক্ষ্যে সংক্ষেপে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি ও হরিভক্তি-বিলাসের মূল বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। উহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে রূপ, সনাতন শ্রীচৈতন্যের নিকট হইতেই শ্রীকৃষ্ণের মধুরভাবের উপাসনার কথা অবগত হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য যে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা প্রবর্তিত করিলেন তিনি মহাভারতের কৃষ্ণ তো নহেনই, এমন কি ভাগবতের কৃষ্ণ কিনা সন্দেহ। ভাগবত পড়িয়া সাধারণ পাঠকের মনে তো ধারণা জন্মে যে কৃষ্ণ দেবকী-বসুদেবের তনয়, তিনি কিশোর বয়স পর্যন্ত গোপ-গোপীদের সঙ্গে বৃন্দাবনে ছিলেন, তারপর মথুরায় যাইয়া কংসবধ করেন ও পরে ষোলহাজার একশ আটজন মহিষী ও তাঁহাদের গর্ভজাত পুত্রাদিসহ দ্বারকায় বিহার করেন। তিনি বৃন্দাবনে আর ফিরিয়া আসেন নাই। আর শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণ হইতেছেন, 'নন্দতনুজ'। নন্দসুত, নন্দনন্দন বলিলে ঐসব শব্দের অন্য ব্যাখ্যাও করা সম্ভব হয় বলিয়া শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণকে একেবারে নন্দের তনু হইতে জাত বলিতেন,—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষয়ে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥

পদ্যাবলী ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ধৃত শিক্ষাষ্টকের শ্লোক

কৃষ্ণকে সরাসরি নন্দের ঔরসপুত্র বলা যে কত বড় বিপ্লবী মনোভাবের পরিচায়ক তাহা এযুগের লোকের পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন। এ যুগের সাধারণ লোকে

পুরাণাদির প্রতি উদাসীন, আর গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় রূপ, জীবাদির ব্যাখ্যার পর কৃষ্ণকে নন্দতনুজ বলিয়া মানিতে অভ্যস্ত। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্রীচৈতন্য যখন ঐ মত ঘোষণা করেন, তখন নিশ্চয়ই জনসমাজে এক প্রচণ্ড সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তিকে প্রামাণিক মানিলে বলিলে বলিতে হয় যে শ্রীচৈতন্য সনাতনকে আরও বলিয়াছিলেন যে কৃষ্ণের ব্রজের লীলাই সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি ব্রজে পূর্ণতর ও দ্বারকায় পূর্ণ (চৈ. চ. ২।২০)। রূপ ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন (২।১।২২৩) গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা, মথুরায় পূর্ণতরতা এবং দ্বারকায় পূর্ণতা ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য প্রযুক্ত 'নন্দতনুজ' শব্দের যাথার্থ্য প্রমাণ করিবার জন্য রূপ লঘুভাগবতামৃতে লিখিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ যে নন্দ-যশোদার পুত্র এ কথাটি অতীব রহস্য বলিয়া শ্রীশুকদেবাদি যথাক্রমে সেই সেই স্থানে বলেন নাই। কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে শুকদেব তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন, যেমন ১০।৫।১ শ্লোকে 'নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ', ১০।৬।৪৩ শ্লোকে 'নন্দঃস্বপুত্রমাদায়', ১০।৯।২১ শ্লোকে গোপিকাসুতঃ, ১০।১৪।১ শ্লোকে ব্রহ্মাস্তবে 'পশুপাঙ্গজায়' অর্থাৎ নন্দের অঙ্গজাত বলিয়াছেন। ঐ সব স্থানে নন্দ কৃষ্ণকে নিজের পুত্র বলিয়াই মনে করিতেন বলিয়া ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন কিনা সে সন্দেহ রূপ তুলেন নাই। যাহা হউক রূপ নিম্নলিখিত যামলবচন উদ্ধৃত করিয়া মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতাদি পুরাণে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণকথা ছাড়িয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের উপাস্য কৃষ্ণের কথা বলিয়াছেন।

> কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ।
> বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি ॥
> দ্বিভুজঃ সর্বদা সোঽত্র ন কদাচিৎ চতুর্ভুজঃ।
> গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা ॥

—লঘুভাগবতামৃত (১।৪৬১-৪৬২)

অর্থাৎ যদুবংশসম্ভূত কৃষ্ণ পৃথক, যিনি পূর্ণ তিনি ইহার পর অর্থাৎ মূলতত্ত্ব। তিনি বৃন্দাবন ছাড়িয়া কোনস্থানে গমন করেন না, তিনি সর্বদাই দ্বিভুজ, কোনকালেই চতুর্ভুজ নহেন। তিনি কেবলমাত্র গোপীর সহিত মিলিত হইয়া সর্বদা বৃন্দাবনে ক্রীড়া করেন। রূপ যে এই মতের পূর্ণ সমর্থক তাহা দেখাইবার জন্য তিনি চারিটি শ্লোকের পরে লিখিতেছেন যে প্রকটলীলায় ব্রজবাসীদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত তিন মাস বিরহ হইয়াছিল। তাহাতেও আবির্ভাব সদৃশী শ্রীকৃষ্ণের বিস্ফূর্তি হইত। তিন মাসের পর তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ সঙ্গতি হইয়াছিল।

> ব্রজে প্রকট লীলায়াং ত্রীন্ মাসান্ বিরহোঽমুনা।
> তত্রাপ্যজনি বিস্ফূর্তিঃ প্রাদুর্ভাবোপমা হরেঃ।
> ত্রিমাস্যাঃ পরতস্তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণেন সঙ্গতিঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যে কখনও মথুরা বা দ্বারকা হইতে বৃন্দাবনে বা গোকুলে ফিরিয়াছিলেন, এমন কোন কথা ভাগবতে পাওয়া যায় না।

জীব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ভাগবতের 'জয়তি জয়নিরাসো দেবকীজন্মবাদো ইত্যাদি (১০।৯০।২৪) শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে দেবকী শব্দে কেবল বসুদেবপত্নী বুঝাইতেছে না—নন্দপত্নী যশোদাকেও বুঝাইতেছে। কেননা আদি-পুরাণে লিখিত আছে যে নন্দভার্যার যশোদা ও দেবকী দুইটি নাম ছিল (শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ ১১৫ প্রকরণ)। তিনিও ভাগবতের ১০।৫।১ শ্লোকের 'নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ' শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ নন্দনন্দনই। তিনি আরও বলেন যে অষ্টাদশ অক্ষর মন্ত্রের ঋষি প্রভৃতির বর্ণনাপ্রসঙ্গে আছে, 'সকল লোকমঙ্গল নন্দতনয় দেবতা'। সুতরাং কৃষ্ণ নন্দের তনুজ (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৫০ প্রকরণ)।

এই তত্ত্বটি জীব গোপালচম্পূর তৃতীয় পূরণে আরও বিশদ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

দেবকী কংসের কারাগারে যাঁহাকে প্রসব করেন তিনি চতুর্ভুজ। দেবকী ভাবিলেন যে ইনি যদি সাধারণ শিশুর মত দ্বিভুজ না হন তাহা হইলে তো ইঁহাকে কোথাও লুকাইয়া রাখাও অসম্ভব হইবে। তাই তিনি কৃষ্ণের দ্বিভুজত্ব প্রার্থনা করিলেন। ঠিক ঐ সময়েই যশোদা যে দ্বিভুজমূর্তি মনে মনে পূর্বে দেখিয়াছিলেন তাহাই সূতিকাগারে প্রসবজ্ঞান ব্যতীতই দেখিতে পাইলেন। তারপর যোগমায়া নিজ প্রভাবে যশোদাকে মোহিত করিয়া আকাশমার্গে সেই দ্বিভুজমূর্তিকে মথুরায় দেবকীর কাছে লইয়া গেলেন। সেখানে দ্বিভুজমূর্তি নিজদেহে চতুর্ভুজকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। দেবকী দ্বিভুজ মূর্তি দর্শন করিলেন। তারপর যোগমায়া যশোদার সূতিকাঘরে স্বয়ং অযোনিজা হইলেও প্রসূতা হইলেন। তারপর ভাগবতে যেমন আছে, বসুদেব কৃষ্ণকে নন্দের বাড়ীতে রাখিয়া মেয়েটিকে লইয়া কারাগারে ফিরিয়া গেলেন। জীব লিখিয়াছেন যে দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সম্বন্ধে এই রহস্যটি গোপন রাখিতে বলিয়াছিলেন (গোপালচম্পূ পূর্ব ৩।৭০)।

ভাগবতে দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য গোপীর সঙ্গে বিহার করিতেছেন। তবে যে গোপীর সঙ্গে তিনি রাসস্থলী হইতে অন্তর্ধান করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতি তাঁহার বিশেষ পক্ষপাত ছিল। কিন্তু তিনিও যখন আব্দার করিয়া কৃষ্ণের কাঁধে চড়িতে চাহিয়াছিলেন তখন ঘোর বনের মধ্যে নিশীথরাত্রে তরুণীকে যে ভাবে ফেলিয়া কৃষ্ণ লুকাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে অনুকূল নায়ক বলা যায় না। রূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে বহুবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে প্রায় একনিষ্ঠ বল্লভে পরিণত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—'শ্রীরাধাতেই শ্রীকৃষ্ণের অনুকূলতা সুপ্রসিদ্ধ কেননা,

শ্রীরাধার দর্শনে কদাপি তাহার অন্য স্ত্রীর প্রসঙ্গ স্মৃতিপথে উদিত হয় না' (উজ্জ্বলনীলমণি ১।২৬)। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী আর এক ধাপ আগাইয়া যাইয়া 'তদালোকে' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে রাধার কথা শ্রবণ করিলে এবং স্মরণ করিলেও তাঁহার অন্য স্ত্রীর কথা মনে জাগে না (ঐ শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকা)। রাধামাধবের যুগল উপাসনার ভিত্তি হইতেছে উভয়ের একনিষ্ঠ প্রেম। কখনও কদাচিৎ যদি শ্রীকৃষ্ণের অন্য নায়িকার প্রতি একটু টান দেখা যায়, তাহা শ্রীরাধার প্রণয় গভীরতর ভাবে আকর্ষণ করিবার জন্য মাত্র।

শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা তাহা প্রমাণ করিবার জন্য রূপ উজ্জ্বল-নীলমণিতে রাধাপ্রকরণ (১।৪), গোপালোত্তরতাপনী, ঋক্‌পরিশিষ্ট ও পদ্মপুরাণের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। কেবলমাত্র পদ্মপুরাণেই স্পষ্টভাবে লিখিত আছে— 'শ্রীরাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের সর্বদা প্রিয়তমা, রাধাকুণ্ডও সেইরূপ'। রূপের মতে রাধা শুধু নববয়স্কা ও সুন্দরীশিরোমণি নহেন, তিনি নর্মপণ্ডিত ও সঙ্গীতবিদ্যা পারদর্শিনী এবং সর্বোপরি তিনি মহাভাবস্বরূপিণী।

মহাভাব হইতেছে রাধারই বৈশিষ্ট্য, রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতিতে হ্লাদিনী-শক্তিত্ব থাকিলেও মহাভাবরূপ নাই। উজ্জ্বলনীলমণিতে রূপ দেখাইয়াছেন যে প্রেম হইতে স্নেহ, স্নেহ হইতে মান, মান হইতে প্রণয়, প্রণয় হইতে রাগ, রাগ হইতে অনুরাগ এবং অনুরাগ হইতে মহাভাব উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। ধ্বংসের কারণ বর্তমান থাকিলেও যুবকযুবতীর যে রতি বা ভালবাসা সর্বপ্রকারে ধ্বংসরহিত হইয়া নিশ্চলরূপে সুসংশ্লিষ্ট থাকে তাহাই হইতেছে প্রেম। অদর্শন, নির্যাতন প্রভৃতি ভালবাসাকে হ্রাস করিতে পারে না (১৪।৬৩)। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রূপ বলিয়াছেন যাহা হইতে চিত্ত সম্যক স্নিগ্ধ হয়, যাহা অতিশয় মমতাযুক্ত—এমন যে গাঢ়তাপ্রাপ্ত ভাব তাহাকেই পণ্ডিতেরা প্রেম বলেন। এই প্রসঙ্গে রূপের বর্ণিত মন্দ প্রেম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সবসময়ের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সর্বদা কাছাকাছি থাকার দরুন যে প্রেমে ত্যাগও নাই, আবার আদরও নাই তাহা মন্দ প্রেম (১৪।৭১)। দীর্ঘকাল ধরিয়া একসঙ্গে যাঁহারা ঘরকন্না করিতেছেন তাঁহাদের প্রেমের যে এইরূপ দশা ঘটে তাহা রূপ জানিতেন। যে প্রেমে চিত্তকে অতিশয় দ্রব করে তাহাকে স্নেহ বলে। প্রিয়কে দেখিয়া বা তাঁহার রূপগুণ যতই শোনা যাউক না কেন তাহাতেই তৃপ্তি হয় না। আরও দেখিতে, আরও শুনিতে ইচ্ছা করে (উজ্জ্বল-নীলমণি ১৪।৭৯)। জীব প্রীতিসন্দর্ভে ইহার বিশদ বর্ণনা দিয়া বলিয়াছেন যে স্নেহের উদয় হইলে কৃষ্ণের কথা উঠিলেই চোখে জল দেখা দেয়, তাঁহার সামর্থ্য জানা থাকিলেও মনে হয় কেহ বুঝি তাঁহার অনিষ্ট করিবে। প্রিয়তমের প্রতি অতিশয় মমতাবুদ্ধিই স্নেহের বৈশিষ্ট্য (প্রীতিসন্দর্ভ পৃঃ ৪২০-৪২১, প্রাণগোপাল

গোস্বামী সম্পাদিত)। রূপ মানের সংজ্ঞায় বলিয়াছেন, যে স্নেহ উৎকর্ষ লাভ করিয়া যুগলকে নূতন মাধুর্য অনুভাব করাইয়া বাহিরে কৌটিল্য ধারণ করে তাহাই মান। নায়ক নায়িকা সাধারণতঃ মিলিত হইলে পরস্পরকে দর্শন করেন, আলিঙ্গনাদি করেন, কিন্তু মানে ঐ সবের বাধা ঘটে। যে ভালবাসায় সম্ভ্রমবোধ অল্প বা কিছুমাত্র না থাকে তাহাকে প্রণয় বলে (উ. নী. ১৪।১১০)। যে ভাবে কিছু গৌরববোধ থাকে তাহাকে মৈত্র বলে। আর যেখানে সম্ভ্রমের লেশমাত্র নাই তাহা সখ্য। রূপ বলেন যে, রাসলীলায় রাধা কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, 'হে কৃষ্ণ, আমি আর চলিতে পারিতেছি না, এখন আমাকে তুমি যেখানে খুসি বহন করিয়া লইয়া যাও। ইহাই ভয় এবং সম্ভ্রমহীনতা ও স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা (উ. নী. ১৪।১১৮)। জীব প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন যে, প্রণয় জন্মিলে সম্ভ্রমাদির যোগ্য অবস্থাতেও সম্ভ্রমের অভাব ঘটে। দয়িতের মনের সহিত নিজের মন, প্রাণ, বুদ্ধি, দেহ এবং পরিচ্ছেদাদির অভেদবুদ্ধি ঘটে। প্রণয়ের উৎকর্ষের জন্য যেখানে চিত্ত অতিদুঃখকেও অতিসুখরূপে অনুভব করায় তাহার নাম রাগ। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যে একদিন দুপুর বেলায় রাধা গোবর্ধন পর্বতের উপর দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছিলেন, তাঁহার মাথার উপর প্রখর রৌদ্র, পায়ের তলায় গরম পাথর। তাও আবার সূচের মতন তীক্ষ্ণ অথচ তিনি শ্রীকৃষ্ণের মুখের পানে চাহিয়া যেন বোধ করিতেছেন পদ্মপলাশরচিত শয্যার উপর যেন পা রাখিয়াছেন (উ. নী. ১৪।১২৭)। জীব প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন যে, রাগ উৎপন্ন হইলে দয়িতের ক্ষণকালের বিরহও অসহ্য হয় এবং তাঁহার দেখা পাইলে পরম দুঃখও সুখরূপে প্রতীত হয়।

যে রাগ নিত্য নূতন হইয়া সবসময়ে অনুভূত প্রিয়জনকে অননুভূতের মতন প্রতীয়মান করায় তাহাকে অনুরাগ বলে (উ. নী. ১৪।১৪৬)। ইহাতে পরস্পরের প্রতি বশীভাব ও প্রেমবৈচিত্ত্য জাগে, তৃণগুল্মলতাদি হইয়াও কৃষ্ণের সম্বন্ধ পাইবার ইচ্ছা হয় এবং বিপ্রলম্ভেও বিস্ফূর্তি অর্থাৎ কাছে না থাকিলেও যেন মনে হয় চোখের সামনে রহিয়াছে। কাছে থাকিলেও যেন নাই মনে হওয়া, মিলনেও বিরহ বা বিরহাশঙ্কা প্রেমবৈচিত্ত্যের লক্ষণ (উ. নী. ১৫।১৪৫)।

জীবের মতে অনুরাগ যখন অসমোর্ধ চমৎকারিতার দ্বারা উন্মাদকরূপে প্রকাশিত হয়, তখন তাহাকে মহাভাব বলে। ইহার উদয় হইলে চোখের পাতা পড়িলে দয়িতকে যে দেখা যায় না তাহাও অসহনীয় মনে হয় এবং এক মুহূর্তের অদেখাকে কল্পকালস্থায়ী বলিয়া বোধ হয় (প্রীতিসন্দর্ভ ৮৪)। উজ্জ্বলনীলমণিতে রূপ বলেন যে, রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণের পক্ষেও মহাভাব অতি দুর্লভ। জীব স্পষ্টই প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন যে, দ্বারকার মহিষীদের প্রীতির সীমা

অনুরাগ পর্যন্ত। একমাত্র ব্রজেই মহাভাব সম্ভব। রূঢ় ও অধিরূঢ় মহাভাব গোপীগণে দৃষ্ট হয়। স্তম্ভাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাববিকার যেখানে চেষ্টা করিয়াও গোপন করা যায় না তাহা রূঢ় মহাভাব (উ. নী ১৪।১৫৯)। ইহার চেয়েও কোন অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত ভাবকে অধিরূঢ় মহাভাব বলে (উ. নী. ১৪।১৭০)। অধিরূঢ় মহাভাব আবার মোদন ও মাদন ভেদে দুই প্রকার। মোদনাখ্য মহাভাব শ্রীরাধিকার মুখে ও মোহনাখ্য মহাভাব প্রায়শঃই রাধিকাতেই, কদাচিৎ ললিতা-বিশাখাদিতে প্রকাশ পায়। কিন্তু মাদনাখ্য মহাভাব একমাত্র রাধিকাতেই বিরাজমান। জীব বলেন নদনদী, তড়াগ প্রভৃতিকে জলাশয় বলা যায় কিন্তু জলধি বলা যায় না, তেমনি অন্য ব্রজদেবীগণকে মহাভাবরূপা বলা যায়, মহাভাবস্বরূপা বলা যায় না। একমাত্র রাধাই মহাভাবস্বরূপা।

রঘুনাথ দাস গোস্বামী স্তবাবলীর অন্তর্গত প্রেমাম্ভোজ-মকরন্দমখ্য স্তবরাজে রাধাকে 'মহাভাবোজ্জ্বলচিন্তারত্নোদ্ভাবিত বিগ্রহায়' বলিয়াছেন। শ্রীরাধার নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্যন্ত সমগ্রদেহ মহাভাবরূপ উজ্জ্বলচিন্তামণির দ্বারা উদ্ভাবিতা। তাঁহার দেহ কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, গদগদভাব, বৈবর্ণ্য, উন্মাদ এবং জড়তা এই নয়টি ভাবরত্নের দ্বারা অলংকৃত। যথা,—

কম্পাশ্রুপুলকস্তম্ভস্বেদগদ্গদরক্ততা।
উন্মাদো জাড্যমিত্যেতৈ রত্নৈর্নবভিরুত্তমৈঃ॥

ঐ স্তবরাজের ভাবানুবাদ করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—

মহাভাবচিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ॥ —চৈ. চ. ২।৮

মহাভাবময়ী শ্রীরাধার নিকট দাস গোস্বামী প্রার্থনা করিতেছেন—তোমার নিকট দন্তে তৃণ ধরিয়া যাচ্ঞা করি যে তুমি নিজদাস্যরূপ অমৃতসিঞ্চনের দ্বারা এই দুঃখিত জনকে উজ্জীবিত কর।

শ্রীরাধা হইতেছেন মহাভাবময়ী প্রেমস্বরূপা, কি করিয়া ভালবাসিতে হয় তাহা তাঁহাকে সেবা করিয়া শেখা যায়। তাই রূপ গোস্বামীর স্তবমালায় ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর স্তবাবলীতে শ্রীরাধার প্রতি একান্ত আনুগত্য ছত্রে ছত্রে প্রকটিত হইয়াছে। এই ভাবের ভজনের উৎস হইতেছেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্য।

সন্ন্যাসগ্রহণের সামান্য কিছুদিন পূর্বে নিমাই পণ্ডিত গোপীদের নাম জপ করিতেন বলিয়া বৃন্দাবন দাস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি 'গোপী গোপী' শব্দ নিরন্তর বলিতেছিলেন দেখিয়া একজন তার্কিক পড়ুয়া বলিলেন—'নিমাই পণ্ডিত, আপনি গোপী গোপী বলেন কেন? উহাতে কি লাভ। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলুন, তাহা হইলে পুণ্য হইবে। এই কথা শুনিয়া নিমাই পণ্ডিত উত্তর দিলেন—কৃষ্ণ

তো দস্যু, তাঁহাকে ভজিব কেন? তিনি কৃতঘ্ন, তাই বালিকে বিনা দোষে বধ করিয়াছেন, স্ত্রীর বশীভূত হইয়া অবলার নাককান কাটাইয়াছেন, বলিরাজার সর্বস্ব লইয়া তাঁহাকে পাতালে পাঠাইয়াছেন। এমন জনের নাম লইলে কি হইবে? 'কি হইবে আমার তাহার নাম লৈলে' (চৈ. ভা. ২।২৫)।

শ্রীচৈতন্য এখানে ভাগবতের ভ্রমরগীতার ষষ্ঠ শ্লোকটিই (১০।৪৭।১৭) সাদা বাংলায় বলিতেছেন দেখা যায়। রূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে মহাভাব ব্যাখ্যার সময় ভ্রমরগীতার দশটি শ্লোককে শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদের চিত্রজল্পভাবের দশ অবস্থার (প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প) উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। দয়িতের কোন সুহৃদের সঙ্গে দেখা হইলে তাঁহার সহিত কথাবার্তায় অন্তরের চাপা ক্রোধ যখন গর্ব, অসূয়া, দৈন্য, চাপল্য ও ঔৎসুক্যাদিভাবের সহিত মিশ্রিত হইয়া শেষে তীব্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে তাহাকে চিত্রজল্প বলে (উ. নী. ১৪।১৯৫)। শ্রীচৈতন্যপ্রোক্ত শ্লোকটি রূপের মতে অবজল্প অবস্থার লক্ষণযুক্ত। শ্রীহরি কঠিন হৃদয়, তিনি কামজিৎ এবং ধূর্ত, সুতরাং তিনি আমার আসক্তির অযোগ্য এই কথা যখন ঈর্ষাযুক্ত ভয়ের সহিত বলা হয় তখন তাহাকে অবজল্প বলে।

নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিত কখনও কখনও ভাবাবেশে তিনি নিজেই কৃষ্ণ এই কথা প্রকাশ করিতেন। ঐ সময়ে তিনি বিষ্ণুর খট্টায় বা সিংহাসনে উপবেশন করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। কিন্তু সন্ন্যাসগ্রহণের পর তিনি বড় একটা ঈশ্বর-ভাব প্রকাশ করিতেন না, তিনি পুরীতে প্রায়শঃই রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া থাকিতেন। ঐরূপ ভাবাবেগেই তিনি শিক্ষাষ্টকের অষ্টমশ্লোকটি লিখিয়াছিলেন। উহাতে তিনি বলিতেছেন—সেই লম্পট আমাকে আলিঙ্গন করুন বা পায়ের তলায় পিষিয়া মারুন, দেখা না দিয়া মর্মাহত করুন, তাঁহার যা খুশি তাহাই করুন না কেন, তবুও তিনিই আমার প্রাণনাথ—অন্য কেহ নহে।

শ্রীচৈতন্যকে গোস্বামিগণ স্বয়ং ভগবান বলিয়া মানিতেন। তাই তাঁহার মতন ইঁহারা রাধাভাবে বিভাবিত হইবার চিন্তাও মনে স্থান দিতে পারেন নাই। ইঁহারা নিজেকে রাধার মঞ্জরীরূপে চিন্তা করিয়াছেন। মঞ্জরীরা সখীদের অনুগতা। তবে সখীদের অপেক্ষা ইঁহাদের সেবা করিবার সৌভাগ্য অধিক। রাধাকৃষ্ণের বিলাস-কালে সখীরা কাছে থাকেন না, অথচ মঞ্জরীরা সে সময়েও যুগলকিশোরকে বীজন করেন। সখীদের অনুগামীরূপে শ্রীচৈতন্য রাধাকৃষ্ণের জলক্রীড়া দর্শন করিতেছেন এইরূপ ভাবটি কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রকাশ করিয়াছেন (চৈ. চ. ৩।১৮)। প্রভু এক জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনীতে সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। ভক্তেরা অনেক খুঁজিয়া এক জালিয়ার জালে আবদ্ধ তাঁহার দেহ পাইয়াছিলেন। প্রভু তখনও

অচৈতন্য, ভক্তেরা তাঁহার কাছে উচ্চ সংকীর্তন করিতে লাগিলেন। প্রভুর একটু-খানি জ্ঞান হইল। তিনি অর্ধবাহ্যদশায় বলিলেন,—

কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাম [illegible]
দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে এক মেলি।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি॥
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
এক সখী দেখায় মোরে সেই সব রঙ্গে॥

জলকেলির পর রাধাকৃষ্ণ ভোজন করিয়া মন্দিরে শয়ন করিলেন, তখন—

কেহ করে ব্যজন কেহ পাদসম্বাহন
কেহ করায় তাম্বুল ভক্ষণ।
রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা গেলা সখীগণ শয়ন কৈলা
দেখি আমার সুখী হৈল মন॥
হেন কালে মোরে ধরি মহা কোলাহল করি
তুমি সব ইহা লঞা আইল।
কাঁহা যমুনা বৃন্দাবন কাঁহা কৃষ্ণগোপীগণ
সেই সুখ ভঙ্গ করাইল॥ —চৈ. চ. ৩।১৮

শ্রীচৈতন্যের এই ভাব হইতে রূপ-রঘুনাথ মঞ্জরীভাবের ভজনের ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন মনে করিলে হয়তো অন্যায় হইবে না।

মঞ্জরীভাবের সাধনা

১৫৭৬ খৃস্টাব্দে কবি কর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ছয় গোস্বামীর কৃষ্ণলীলায় স্থান নির্দেশ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন যে রূপ গোস্বামী হইতেছেন রূপমঞ্জরী, সনাতন রতিমঞ্জরী, গোপাল ভট্ট অনঙ্গমঞ্জরী, বা গুণমঞ্জরী, রঘুনাথ ভট্ট রাগমঞ্জরী, রঘুনাথ দাস রসমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী বা ভানুমতী এবং জীব বিলাস-মঞ্জরী। বৈকল্পিক নামের ব্যবহার হইতে অনুমিত হয় যে তখনও তাঁহাদের তত্ত্ব বা নাম পাকাপাকিভাবে স্থির হয় নাই। গোপালগুরু বা মকরধ্বজের শিষ্য ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর যে সাধনপদ্ধতি এখন বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রচলিত আছে তাহাতে দেখা যায় যে সনাতন লবঙ্গমঞ্জরী, গোপাল ভট্ট গুণমঞ্জরী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী রতিমঞ্জরী, রঘুনাথ ভট্ট রসমঞ্জরী। রূপ ও জীবের তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই।

মঞ্জরীভাবের সাধনার নির্দেশ দিতে যাইয়া রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিয়াছেন,—

সেবাসাধকরূপে সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥ —১।২।২৯৫

সাধকরূপে যথাবস্থিতদেহে এবং সিদ্ধরূপে অন্তশ্চিন্তিত অভীষ্টের সেবার উপযোগী দেহে সেই ব্রজস্থ নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণের রতিবিশেষ লাভেচ্ছু ব্যক্তিদের অর্থাৎ ব্রজ-লোকগণের সেবা করিবে। ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া রামচন্দ্র কবিরাজ, নরোত্তম ঠাকুর ও গোবিন্দদাস কবিরাজ জীবকে পত্র লিখিলে জীব উত্তর দেন—'সাধকরূপে মানে বাহ্যদেহের দ্বারা সিদ্ধরূপে মানে নিজ ইষ্টসেবার অনুরূপ চিন্তন—তন্ময় দেবের দ্বারা (গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, ভূমিকা পৃঃ ১॥৶০)। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকায় 'সিদ্ধরূপে' শব্দের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—'শ্রীরাধা-ললিতা-বিশাখা—শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদ্যা স্তদনুগতাঃ শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামী প্রভৃতয়শ্চ তেষামনুসারতঃ'। কিন্তু সনাতন গোস্বামীর বৃহদ্ভাগবতামৃতে মঞ্জরীভাবের সাধনের কোন উল্লেখ নাই। গোপবালক স্বরূপ নিজদেহেই কৃষ্ণের পাশে বসিয়া ভোজন করিতেছেন এবং রাধিকা পরিবেশন করিতেছেন দেখিতে পাই। কৃষ্ণ স্বরূপকে রাধিকার ভ্রাতৃকুলের লোক বলিয়া ঠাট্টা করিয়াছেন। শ্রীরাধার ও তাঁহার সখীগণের অনুগতা মঞ্জরীরূপে নিজেকে চিন্তা করার কোন কথা সনাতন গোস্বামী উল্লেখ করেন নাই। বরং তিনি হরিভক্তি-বিলাসের টীকায় লিখিয়াছেন 'সাধক মনে করিবেন চিৎস্বরূপ ভগবানের অংশ বলিয়া আমিও চিন্ময়রত্নাংশে তাঁহা হইতে অভিন্ন, তবে তাঁহার অংশ বলিয়া আমি 'তদধীনো নিত্যসেবকোহস্মি ইতি' (৫।৩৫)। ইহার মধ্যে সাধকের স্ত্রীরূপে নিজেকে চিন্তা করার কোন ইঙ্গিত নাই।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের তৃতীয়শ্লোকে নিজেকে নন্দতনুজের কিঙ্কর বলিয়াছেন। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণকে দেবকী বসুদেবের গর্ভ ও ঔরসজাত না বলিয়া খোলাখুলিভাবে নন্দের তনু হইতে জাত বলিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সাধনার ধন হইতেছেন নন্দনন্দন, বসুদেব-নন্দন নহেন। শিক্ষাষ্টকের অষ্টম শ্লোকে কিন্তু শ্রীচৈতন্যের নারী অভিমান দেখি। তিনি রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া বলিয়াছেন, সেই লম্পট আমাকে আলিঙ্গন করুক বা পায়ের তলায় ফেলিয়া পিষিয়া মারুক, কিংবা অদর্শনে মর্মাহত করুক, যাহাতে তাহার সুখ হয় তাহাই করুক না কেন, সে ভিন্ন অন্য কেহ আমার প্রাণনাথ নহে। রূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যকে নিখিল গোপীদের প্রেমের বিনির্যাস (শ্রীচৈতন্যাষ্টক ১২) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নবদ্বীপে অবস্থান কালে বিশ্বম্ভর মিশ্র কখনও

কখনও নিজেকে কৃষ্ণ বলিয়া ঘোষণা করিতেন এবং বিষ্ণুর খট্টায় উপবেশন করিতেন। কিন্তু নীলাচলে থাকার সময়ে তিনি রাধার ভাবেই বিভোর থাকিতেন, রূপ গোস্বামী প্রভৃতির মতে কিন্তু সাধারণ ভক্তের পক্ষে নিজেকে রাধা বা তাঁহার প্রিয়সখী ললিতা বিশাখাদির সহিত অভিন্ন মনে করা অন্যায় (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—পূর্বলহরী ২।১৬০-এর জীবকৃত টীকা)।

রূপ ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মতে সাধক সিদ্ধদেহে নিজেকে সখীদের অনুগা মঞ্জরী বলিয়া চিন্তা করিবেন। রাধাকৃষ্ণের বিশেষতঃ শ্রীরাধার বেশভূষা করিয়া দেওয়া, তাঁহার চুল আঁচড়াইয়া দেওয়া, শাড়ী পরাইয়া দেওয়া, স্নান করাইয়া দেওয়া, আলতা পরাইয়া দেওয়া এবং কৃষ্ণের সহিত মিলন ঘটাইবার ব্যবস্থা করা মঞ্জরীর অভিলষিত প্রিয় কাজ। রাধাকৃষ্ণের নিভৃত মিলনের সময় সখীরা দূরে সরিয়া যান, কিন্তু মঞ্জরী কাছে থাকিয়া চামর ব্যজন করেন, চন্দনাদি লেপন করেন এবং পাদসম্বাহনাদি সেবা করিবার জন্য ব্যগ্র হন। দুই চারিটি উদাহরণ দিতেছি। স্তবমালার অন্তর্গত উৎকলিকাবল্লরীতে রূপ অভিলাষ করিতেছেন যে তিনি যেন নিজের কেশপাশ মুক্ত করিয়া উহার দ্বারা শ্রীরাধার পা দুখানি মুছাইয়া দিতে পারেন (৪৭ শ্লোক)। তিনি যেন নিকুঞ্জে বিলাসের উপযোগী পুষ্পশয্যা প্রস্তুত করিতে পারেন (৪৮), সোনার ভৃঙ্গারে করিয়া যেন রাধাকৃষ্ণের পা ধোয়াইবার জল আনিতে পারেন (৪৯), রাধাকৃষ্ণ যখন পাশাখেলায় মত্ত থাকিয়া নিজেদের মধ্যে হাস্যপরিহাস করিবেন তখন মৃদু মৃদু পাদসম্বাহন করিতে পারেন (৫০), তাঁহাদিগকে বিলাসকালে মধুপানের পাত্র জোগাইতে পারেন (৫১), বিলাসের পর তাঁহাদের ঘর্ম ও শ্রান্তি অপনোদনের জন্য যেন চামর দিয়া বীজন করিতে পারেন (৫২), তাঁহাদের যেন বেশ করাইয়া দিতে পারেন (৫৩, ৫৪, ৬৪)। কার্পণ্য-পঞ্জিকাস্তোত্রে রূপ প্রার্থনা করিতেছেন যে রাধাকৃষ্ণ যখন নিজেদের গুরুজনের নিকট থাকিবেন এবং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে দেখাশুনা দুর্লভ হইবে তখন যেন তিনি একজনের বার্তা অন্যের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারেন (৩৪), লতাকুঞ্জে কন্দর্পকলহে রাধাকৃষ্ণের গলার হার ছিঁড়িয়া গেলে উহা গাঁথিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করেন (৩৭)। মঞ্জরী যেমন রাধার বেশভূষা করাইয়া দেন তেমনি কৃষ্ণেরও অনুরূপ সেবা করেন। তাই রূপ উল্লিখিত স্তোত্রে বলিতেছেন—'কন্দর্পক্রীড়ায় তোমাদের বেশবাস আলুলায়িত হইলে পুনরায় উহা বাঁধিয়া ও ময়ূরপুচ্ছ দিয়া ভূষিত করিয়া কবে আমার অভীষ্ট পূর্ণ করিব (৩৯), সেই সময়ে তিনি রাধাকৃষ্ণের তিলক রচনা করিবেন, কৃষ্ণকে বনমালা ও রাধাকে কাজল পরাইয়া দিবেন (৪১)। তিনি চুন খয়ের প্রভৃতি দিয়া পান সাজিয়া কবে উভয়ের মুখে অর্পণ করিবেন (৪৩)।

রঘুনাথ দাস গোস্বামীও বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে প্রার্থনা করিয়াছেন, তিনি যেন সকালে শ্রীরাধার পা দুখানি ধোয়াইয়া দিতে পারেন (১৯), তারপর তাঁহার দন্তধাবনের জন্য দাঁতন দিতে ও তেল মাখাইতে পারেন (২০), তারপর কর্পূরাদির দ্বারা সুবাসিত জল দিয়া তাঁহাকে স্নান করাইতে পারেন (২১), ভিজা শাড়ী ছাড়াইয়া সুন্দর শাড়ী পরাইয়া দিতে ও চুল বাঁধিয়া দিতে পারেন (২২-২৬) এবং শ্রীরাধার ললাটে তিলক, স্তনযুগলে মৃগমদলেপন করিতে পারেন (২৫)। তিনি ভোজনের সময় বীজন করিবেন, তারপর পান সাজিয়া দিবেন (৫১-৫২)। বিশ্রামের সময় পাদসম্বাহন করিবেন এবং তাঁহার উচ্ছিষ্টভোজন করিবেন (৫৫-৫৬)। তিনি রূপমঞ্জরীর সাথে সাথে সেবাকার্য করিবেন (৭২)। মালতীকুঞ্জে উভয়কে বিলাসকালে বীজন করিবেন (৮১)। সংস্কৃতজ্ঞ নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবেরা দাস গোস্বামীর এই প্রার্থনা প্রত্যহ আবৃত্তি করেন। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না তাঁহারা বাংলা কবিতায় উহার অনুবাদ আবৃত্তি করেন। রূপ ও রঘুনাথ দাস গোস্বামী মঞ্জরীভাবের উপাসনার প্রচার করেন বলিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে প্রায়শঃই ভণিতা দিয়াছেন—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় এই ভজনপদ্ধতিকে বাংলাদেশে তাঁহার সরল সাবলীল মধুর বাংলা ভাষার গুণে জনপ্রিয় করিয়া তোলেন। তিনি বারংবার বলিয়াছেন,—

শ্রীরূপমঞ্জরি সখি কৃপাদৃষ্টে চাঞা।
তাপী নরোত্তমে সিঞ্চ সেবামৃত দিঞা॥

* * *

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব জন।
শ্রীরূপ কৃপায় মিলে যুগলচরণ॥

* * *

শ্রীরূপমঞ্জরি দেবি মোরে কর দয়া।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্মছায়া॥

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় তিনি মঞ্জরীভাবের সাধনার কথা প্রাঞ্জলভাষায় ও মর্মস্পর্শী আন্তরিকতার সহিত লিখিয়াছেন,—

বৃন্দাবনে দুইজন চতুর্দিকে সখীগণ
সময় বুঝিব বস সুখে।
সখীর ইঙ্গিত হবে চামর ঢুলাব কবে
তাম্বুল জোগাব চাঁদমুখে॥

যুগল চরণ সেবি নিরন্তর এই ভাবি
অনুরাগী থাকিব সদায়।
সাধনে ভাবিব যাহা সিদ্ধদেহে পাব তাহা
রাগপথের এই সে উপায়।
সাধনে সে ধন চাই সিদ্ধদেহে তাহা পাই
পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার।
থাকিলে সে প্রেমভক্তি অপক্কে সাধন গতি
ভকতি লক্ষণ তত্ত্বসার॥

মঞ্জরীভাবের সাধনা উচ্চতম স্তরের সাধকদের জন্য। সাধারণ ভক্তেরা শ্রবণ কীর্তনাদি নবধা ভক্তির অনুশীলন করেন। সুদীর্ঘকাল এমন কি জন্মজন্মান্তর ধরিয়া এরূপ সাধনা করিতে করিতে ভগবৎ কৃপা হইলে প্রেমভক্তির উদয় হয়।

প্রেমের উৎপত্তি কি ভাবে হয় তাহার চমৎকার মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে করিয়াছেন। প্রেমোৎপত্তির পূর্বে সাধককে যে আটটী মানসিক স্তর অতিক্রম করিতে হয় সেইগুলি হইতেছে শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজন-ক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব বা রতি (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।৪।৮-৯)।

শ্রদ্ধা ভক্তির বীজস্বরূপ। উৎসাহ হইতেছে শ্রদ্ধার জীবন। জ্ঞানবিষয়ে নিষ্ঠা-যুক্ত ও ব্যাকুলতাময় আসক্তির ভাবকে রূপ (ঐ ২।৩।৫৭) উৎসাহ বলিয়াছেন। জীব ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সোনা তৈয়ারি করিতে যাহারা লুব্ধ তাহারা যেমন চেষ্টায় একটুও বিরাম দেয় না, তেমনি শ্রদ্ধা জাগিলে সাধক নিরন্তর চেষ্টা করিতে থাকেন। কতটা সাফল্য হইল বা না হইল তাহার জন্য মাথা ঘামান না।

হৃদয়ে শ্রদ্ধা না জাগিলে সাধুসঙ্গ হওয়া কঠিন। সাধুকে দেখিয়াও আমরা সাধু বলিয়া বুঝিতে পারি না। কাজেই তাঁহার সঙ্গলাভের ইচ্ছা জাগে না। সাধু-সঙ্গের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে যাইয়া সনাতন গোস্বামী বৃহদ্ভাগবতামৃতে বলিয়াছেন 'সিদ্ধানাং লক্ষণং হি সাধকানাং সাধনম্' (১।৪।১৮ টীকা)। যে প্রকার আচরণ করিলে মহাপুরুদের সদ্‌গুণসমূহ নিজের হৃদয়ে স্থান পায়, সেইভাবে চেষ্টা করাই যথার্থ সাধুসঙ্গ। সাধুগণ যেরূপ সদাচরণ করেন এবং সৎ উপদেশ দেন তাহা শরীরের দ্বারা আচরণ করা, বাক্যের দ্বারা তাঁহাদের উপদেশ প্রচার করা এবং মনে মনে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা কর্তব্য। জীব গোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন যে, সৎসঙ্গ হইতে সাধুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও গৌরববুদ্ধি জাগে। তারপর সৎগোষ্ঠীর কথায় রুচি জন্মে, ঐরূপ কথা শুনিতে আগ্রহ হয়, তখন সন্দেহ

নিবারণ করিয়া অর্থ অবধারণে প্রবৃত্তি হয়, তারপর যাহা শোনা হইয়াছে তাহা মনন করিয়া অর্থ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা জাগে।

ভজনক্রিয়া বলিতে শ্রবণ, কীর্তন প্রভৃতিতে দৃঢ়তা বোঝায়। ইহা অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতাভেদে দুই প্রকার। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মাধুর্যকাদম্বিনীতে বলিয়াছেন যে অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া যথাক্রমে উৎসাহময়ী, ঘনতরলা অর্থাৎ কখনও ঘন, কখনও বা তরল বা শিথিল হয়, ব্যূঢ়বিকল্প, বিষয়সঙ্গরা অর্থাৎ বিষয়ত্যাগের ও বিষয়ভোগের ইচ্ছার মধ্যে সংঘর্ষ চলিতে থাকে, ইহাতে কখনও সাধকের জয় হয়, কখনও পরাজয় হয়। নিয়মাক্ষমা অর্থাৎ যে অবস্থায় বারংবার নিয়ম করিয়াও তাহা যথাযথরূপে পালন করিয়া উঠিতে পারা যায় না ও তরঙ্গরঙ্গিণী অর্থাৎ আমি ভক্ত বলিয়া লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠা হউক এইরূপ আসক্তি হয়। নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া স্থির, অচঞ্চল।

ভজনক্রিয়া হইতে অনর্থনিবৃত্তি ঘটে। এইস্তরে জীবের প্রারব্ধ কর্মের নাশ হয়। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ভাগবতের ২।৭।১৩ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন যে যখন শ্রীহরির সৌন্দর্য, সুস্বর, সুরভি, সুকুমারতা, বৈদগ্ধ প্রভৃতিতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, জিহ্বা ও মন সর্বতোভাবে নিমগ্ন হয় এবং প্রাকৃত রূপরসাদি আস্বাদন করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক হয়, তখন অনর্থের নিবৃত্তি হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ভাগবতে (১২।১৮) নিষ্ঠা শব্দে চিত্তের একাগ্রতা বলা হইয়াছে। ভক্তিবিষয়ে নিষ্ঠা জন্মিলে লোকে দেহে, বাক্য ও মনে নিযুক্ত করিয়া সেবা করে, লীলাদি স্মরণ করে ও ধ্যান করে। নিষ্ঠাযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে মৈত্রী, দয়া, শম, দম, তিতিক্ষা, নিজে অমানী হইয়া অপরকে সম্মান দেখাইবার গুণ সহজে লাভ করা সম্ভব হয়।

নিষ্ঠা হইতে রুচির উৎপত্তি হয়। রুচি জন্মিলে ভগবৎবিষয় ছাড়া অন্য প্রসঙ্গে অরুচি হয়। যাঁহার মনে যথার্থ রুচি জন্মিয়াছে তিনি কীর্তনের তাল, লয়, মানের বিশুদ্ধির অপেক্ষা করেন না, ভগবানের নাম বা লীলার কীর্তন হইতেছে শুনিলেই পরম উল্লাস অনুভব করেন।

রুচি হইতে আসক্তির উদ্ভব হয়। ভ্রমর যেমন স্বভাববশেই মধুলোভে আকৃষ্ট হয়, আসক্তি জন্মিলে ভক্ত তেমনি কৃষ্ণের লীলাদি শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণের প্রতি স্বভাবতঃ লুব্ধ হন। তাঁহার আর অন্য কিছু ভাল লাগে না। এই অবস্থায় সাধক ভগবানের মাধুর্য আস্বাদনে সমর্থ হন।

রুচি হইতে ভাব বা রতি জন্মে। রূপ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১।৩।২৬) ইহাকে প্রেমকল্পবৃক্ষের অঙ্কুর বলিয়াছেন। ভাব বা রতির উদয় হইলে সাধক ক্ষোভের কারণ থাকা সত্ত্বেও অক্ষুব্ধ থাকেন, একটু ক্ষণও ভগবানের স্মরণ মননাদি না করিলে তাঁহার মনে হয় জন্ম বৃথা গেল, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের প্রতি

তাঁহার বিরক্তি জন্মে, নিজের উৎকর্ষ থাকা সত্ত্বেও অভিমানহীন হন, শ্রীকৃষ্ণকে পাইবেনই এই আশা তাঁহার মনে সুদৃঢ় হয়। অভীষ্টলাভের জন্য তাঁহার গুরুতর লোভ সমুৎকণ্ঠা নামে পরিচিত হয়। নামগানে তাঁহার সদা রুচি হয়, ভগবানের গুণকথনে আসক্তি জন্মে এবং ভগবানের ধামে প্রীতির উদয় হয়।

রতি হইতে প্রেম জন্মে। প্রেমের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইতেছে এই যে নিজের সুখ একটুও না চাহিয়া কেবলমাত্র দয়িতের সুখ কামনা করে। প্রাকৃত জগতে নায়ক-নায়িকা প্রেম করিতে যাইয়া নিজের সুখের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে পারেন না। কিন্তু ব্রজগোপীদের মনে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখের ইচ্ছাই জাগে। তাঁহারা যে বেশভূষা করেন, আনন্দিত হইয়াছেন দেখান, সে সব শ্রীকৃষ্ণেরই সুখের জন্য।

উপসংহার

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া বৃন্দাবনস্থ গোস্বামিগণ যে ভজন-প্রণালী নির্দেশ করিয়াছেন তাহা মনস্তত্ত্বের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। মঞ্জরীভাবের সাধনাই ইহার চরম আদর্শ। মানুষের যত কিছু দুঃখকষ্ট সকলের মূল কারণ হইতেছে দেহগেহপুত্রপরিজনে মমত্ববোধ। সাধক যদি নিরন্তর চিন্তা করিতে থাকেন যে তাঁহার এই দেহ মায়িক, তিনি স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণদাস এবং মঞ্জরীরূপে তিনি রাধাকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভজন করিতেছেন, তাহা হইলে জাগতিক কোন প্রকার দুঃখকষ্ট তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি আনন্দস্বরূপের ধ্যান করিতে করিতে আনন্দ-লোকে বাস করিতে থাকেন। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নরোত্তমঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্বজন।
শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগল চরণ ॥
যাহা প্রভু সনাতন গৌর পরিবার।
সবে মিলি বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার ॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যার সেই মহাশয় ॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে ॥
হেন কি হইবে মোর নর্ম সখীগণে।
অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে ॥

রূপ গোস্বামীর হাতেই এই ভজনের চাবিকাঠি। তাই তাঁহার প্রতি আনুগত্য একান্ত আবশ্যক।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং পরমদৈবত। তিনি সন্ন্যাসগ্রহণের পর পুরীতে গমন করেন এবং তীর্থাদি ভ্রমণ ছাড়া আর সব সময়েই পুরীতে বাস করেন। সেই সময় রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, গদাধর গোস্বামী, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, যবন হরিদাস, জগদানন্দ, পরমানন্দপুরী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ পুরীতেই বাস করিতেন। গৌড়দেশ হইতে প্রায় প্রতিবৎসর অদ্বৈত, শ্রীবাস, নরহরি সরকার ঠাকুর, শিবানন্দ সেন প্রভৃতি অসংখ্য ভক্তবৃন্দ শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিবার জন্য পুরী যাইতেন। তাঁহারা কেহ বৃন্দাবনে যাইতেন না। পুরীই ছিল তাঁহাদের নিকট পরম তীর্থ। হয়তো ইব্রাহিম লোদী ও সেকেন্দর লোদীর হিন্দুনির্যাতন নীতি এবং পরে মুঘলপাঠানের সংঘর্ষের দরুন ভক্তদের পক্ষে ব্রজমণ্ডলে যাওয়া নিরাপদ ছিল না। কিন্তু ঐ যুগে তো উড়িষ্যার গজপতি নৃপতিদের সহিত হোসেন শাহ ও নসরৎ শাহের যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই ছিল। তাহা সত্ত্বেও ভক্তেরা শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিবার জন্য পুরীতে যাইতে বিরত হইতেন না। শ্রীচৈতন্যের জীবনকালে ভূগর্ভ, লোকনাথ, সুবুদ্ধি মিশ্র, সনাতন, রূপ, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি কয়েকজন মাত্র ভক্ত বৃন্দাবনে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা অবশ্য শ্রীচৈতন্যের আদেশেই সেখানে গমন করেন।

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর রঘুনাথ দাস গোস্বামী বৃন্দাবনে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ঐ সময় হইতে পুরী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিকট আর শ্রেষ্ঠ তীর্থ রহিল না। যেখানে শ্রীচৈতন্যদেব স্বীয় ভজনরীতি প্রচার করিয়াছিলেন সেখানে বৈষ্ণবেরা বাস না করিয়া ব্রজমণ্ডলে যাইয়া বাস ও ভজন করিতে লাগিলেন। সনাতন গোস্বামী বৃহদ্ভাগবতামৃতে পুরীর অনেক উপরে গোকুলের স্থান দিলেন। রূপ গোস্বামী মথুরামাহাত্ম্যে পুরাণাদিশাস্ত্রে ব্রজমণ্ডলের মহিমাসূচক যে যে শ্লোক পাইলেন তাহা একত্রে গ্রথিত করিলেন। ছয় গোস্বামীর পূত সাধনাবলে ব্রজমণ্ডলীই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভজনের প্রিয়স্থান হইল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত সহস্র সহস্র বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ব্রজমণ্ডলে ভজন সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। নবদ্বীপ ও পুরী অপেক্ষা ঐখানে বৈষ্ণবের সংখ্যা অনেক বেশী। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে ছয় গোস্বামীর উচ্চ মর্যাদার ইহাই নিদর্শন।

পরিশিষ্ট ক

ছয় গোস্বামী ও সহজিয়া সম্প্রদায়

সহজিয়া সম্প্রদায়ের একদল এই সমস্ত গোস্বামী পাদদিগকে সহজিয়া সাধন ভজনের পূর্বসূরী বলিয়া মতবাদ প্রচার করেন। মণীন্দ্রনাথ বসু তাঁহার 'Post Chaitanya Sahajia Cult' গ্রন্থে এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন "In the first place, the Sahajias trace the origin of this new emotional faith to Chaitanya, whose teachings they say, have come down to them filtered through the writings of Sarup, Rupa, Raghunath, Ramananda and other Vaishnava worthies" (p. 161). বিভিন্ন সহজিয়া গ্রন্থ হইতে এই মতের সমর্থনের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিবর্তয়ে ধর্ম গোসাঞি স্বরূপ হইতে।
আসিয়া প্রকাশ কৈল রসিক ভকতে॥
অষ্টশক্তি মহাপ্রভু রূপে সমর্পিয়া।
যে প্রকারে দিল আগে দ্রব্য উঘারিয়া॥ —বিবর্তবিলাস
বিস্তার করিলা প্রভু প্রেমের পসার।
স্বরূপ রামানন্দ সনে রসের বিচার॥

* * *

নিজতত্ত্ব জানাইলা গোসাঞি শ্রীরূপে
শ্রীরূপে করুণা করি সব তত্ত্ব দিলা।
ব্রজরস নিগূঢ় মর্ম সব জানাইলা॥
ব্রজে সার শ্রীরূপ গোসাঞি রাগধর্ম।
শ্রীরূপ জানিতে পারে চৈতন্যের মর্ম॥
চৈতন্যতত্ত্বের রূপসীমা রতিশূর।
রাগমতে প্রকাশিলা প্রেমতত্ত্বপুর॥ —রসকদম্বকলিকা
এত চিন্তি নবদ্বীপে কৈল অবতার।
অশেষ বিশেষে রস কৈল পরচার॥

* * *

নিগূঢ় ভাবামৃত মনসি আস্বাদন।
স্বরূপ রূপ রঘুনাথ জানেন তিনজন॥

* * *

স্বরূপ রূপ আর রঘুনাথ দাস।
এ তিন প্রসাদে মাধুর্য জগতে প্রকাশ ॥—রতিবিলাসপদ্ধতি

এই সমস্ত সহজিয়ারা ইঁহাদের নামে প্রচুর সহজিয়া বাংলা গ্রন্থ আরোপ করিয়াছেন। মণীন্দ্রমোহন বসু তাঁহার Post Chaitanya Sahaja Cult গ্রন্থে রূপ, রঘুনাথ, জীব, সনাতন প্রভৃতির নামে আরোপিত সহজিয়া গ্রন্থের একটি তালিকা দিয়াছেন। তিনি রূপের নামে উপাসনাখণ্ড (ক. বি. ১১৫৬), চৈতন্যতত্ত্ব (ক. বি. ৩৯৩৭), সিদ্ধারতিপ্রাপ্তি (ক. বি. ১৫৪৭), সূর্যমণি গ্রন্থ (ক. বি. ১০৩৫), জীবের নামে কৃষ্ণভক্তিপ্রয়াণ (ক. বি. ৬০২), চম্পককলিকা (ক. বি. ৩৯৩৫), ব্রজকারিকা (ক. বি. ২২২৩), মুরলীচম্পক (ক. বি. ৩৯৯৪), সহজ কলিকা (ক. বি. ২৮২৮), স্মরণীয় টীকা (ক. বি. ১২১৩), এবং রঘুনাথ দাসের নামে আত্মনির্ণয় (ক. বি. ১৯৪৯), আরোপ (ক. বি. ৩৪০৪), রাগকারিকা (ক. বি. ২১১২), সিদ্ধ টীকা (ক. বি. ৫৭০), সিদ্ধান্ত টীকা (ক. বি. ৩৯১৩) প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি বিভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ পুঁথি বিভাগ, এশিয়াটিক সোসাইটি পুঁথি বিভাগ প্রভৃতি অনুসন্ধান করিয়া নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ইঁহাদের নামে পাওয়া যায়। সনাতনের নামে চম্পককলিকাতত্ত্ব (ক. বি. ৫৩০৮), রূপের নামে হরিনাম পটল (ক. বি. ৪৩০৬), শ্রীগুরু উপাসনা (ক. বি. ৬২২২), আগমহরগৌরী সংবাদ (ক. বি. ৬৪৮১), প্রেমভক্তি তত্ত্বনির্ণয় (ক. বি. ২১১১), রূপগোস্বামীর কড়চা (ক. বি. ৪৩১১), শুদ্ধরতিকারিকা (ক. বি. ৫৭৬৬), রাগবিকলা (ক. বি. ৬২৯৩), জীবের নামে জীবগোস্বামীর টীকা (ক. বি. ১৯৬০), জীবগোস্বামীর কড়চা (ক. বি. ১২৮৮), নিত্য বর্তমান (ক. বি. ৪২৩৯), সাধ্যবস্তুসাধনা (ক. বি. ৫৭৪৩), গণমঞ্জরী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ২৬৭৭), রঘুনাথ দাসের নামে শরপুর কারিকা (ক. বি. ৪২১৮), প্রেমকল্পতরু (ক. বি. ৪৯৭৫), রাগলহরী (ক. বি. ৫০৮২), চৈতনাস্তবক (৫১১২), চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ (ক. বি. ৬২৩১), আশ্রয়নির্ণয় (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ২০৮৮), সিদ্ধান্ত টীকাবলী (এসিয়াটিক সোসাইটী ৩৭৪৬) ও গোপাল ভট্টের নামে গোলোকবর্ণনা, শ্রীচৈতন্য জাহ্নবাতত্ত্ব (ক. বি. ২২৭২ ও ব. সা. প. ২১১২) প্রভৃতি প্রচুর গ্রন্থের পুঁথি পরিদৃষ্ট হয়। এই সমস্ত গ্রন্থের দুই একটির কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

সিদ্ধারতিপ্রাপ্তি (ক. বি. ১৫৪৭)—

আরম্ভ ঃ ইহাতে জানিবে শক্তি সিদ্ধের আশ্রয়।
ইহাতে জানিহ গুরু স্বরূপরূপ হয় ॥

* * *

শ্রীরূপ বলে কেবা জানে সখীর আশ্রয়।
সখীরূপা হইলে হয় সিদ্ধের আশ্রয় ॥
সনাতন কহে পঁহিলু মূলবস্তু ধন।
রাধিকার অনুরাগ করিবে পূরণ ॥
অন্ত্য ঃ সিদ্ধারতি শিক্ষা মনোবর্তী কহিলাম।
নিজহস্তে লিখিয়া শ্রীসনাতনে দিলাম ॥
সনাতন গুরু তাতে আগম শিষ্য হই।
রাধাকৃষ্ণ যার স্থান তাহা আমি কই ॥
জয় জয় নিত্য ব্রজেন্দ্র নন্দন।
সনাতনের প্রাপ্ত সিদ্ধ হইল নিশ্চয় ॥

ইতি শ্রীরূপেন বিরচিতং সিদ্ধস্থানপ্রাপ্তি সিদ্ধারতি সম্পূর্ণ

আত্মনির্ণয় (ক. বি. ১৯৪৯)—

আরম্ভ ঃ জয় জয় শ্রীচৈতন্য চেতনরিদয়।
জয় জয় নিত্যানন্দ গুরু মহাশয় ॥
জয় জয় অদ্বৈত বৈষ্ণবের ভূপ।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব এই তিনে এক রূপ ॥
আত্মবিস্মৃত ঘুটি হইলা সচেতন।
সেই অনুসারে কৈল এ চৌদ্দভুবন ॥
অসংখ্য জীবজন্তু করিলা সৃজন।
অসংখ্য দেবতা জন্মে অসংখ্য মানুষ ॥
আপনি প্রকৃতি হৈল আপনি পুরুষ ॥
অন্ত্য ঃ শতদলপদ্ম হয় হৃদয়মন্দিরে।
সহস্রদল হইতে আসি তাহা লীলা করে ॥
নাভিতই মধ্যে আছে শতদল।
রূপ রতি রসে সদা করে টলমল ॥
শ্রীরূপ পাদপদ্মে যার আশ।
আত্মনির্ণয় কহে শ্রীরঘুনাথ দাস ॥

ইতি আত্মনির্ণয় গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ গ্রন্থ (ক. বি. ৯৮৮)—

আরম্ভ—তেঁহো সকলের পর। তার সমান নাঞি। তাহাকে জানিব কেমনে।

তেই আপনাকে আপনি জানান। কিরূপ জানায়। স্বরূপের ধীরে জাগান। যে জন চৈতন্যদেব সেই চেতন হল। অতএব স্বরূপ রূপ একবস্তু।

* * *

তার স্থিতি কিসে। রত্নবেদী রত্নসিংহাসনে কিশোর কিশোরী বিরাজমান। চতুর্দিকে নব নব রঙ্গিণীগণ গানবাদ্যে সদা মগ্ন আছেন সেইমাত্র। একের কামরতি। তিঁহো সৎ সিদ্ধ। সহজ মানুষ যখন রসের কামনা করেন। গুণ দুই। যখন পান করেন তখন বিগুণ। নির্গুণ কখন। প্রকৃতিপুরুষে জড়িত যখন। তাকে পাব কিসে। তার স্বরূপ হইলে। স্বরূপ হব কিসে। শ্রীগুরু উপদেশে। গুরু উপদেশ কি। কাম-গায়ত্রী কামবীজ। কামগায়ত্রী নায়ক কামবীজ—নায়িকা কামগায়ত্রী।

অন্ত্য ঃ রসের তরঙ্গে পড়ি নাহি জানে আন।
রসেতে মগন সদা করে রস পান॥
রস পান করি করি সেই যে পাইবে।
রসের মরম জানি প্রভুকে ভজিবে॥
প্রভুর সঙ্গের সখি হইয়া আসিবে যেইজন॥
অবশ্য পাইবে সেই নিত্য বিন্দাবন॥

শ্রীজীবগোস্বামি বিরচিতায়াং কৃষ্ণভক্তিপ্রয়াণঃ সম্পূর্ণঃ

জীবগোস্বামীর কড়চা (ক. বি. ১২৮৮)—

আরম্ভ ঃ শ্রীরূপ গোসাঞি আর শ্রীজীব গোসাঞি।
দুইজন বসি আছেন আর কেহ নাঞি॥
জীবগোসাঞি কহে শুন করি নিবেদন।
আজ্ঞা কর কৃষ্ণকথা যদি লয় মন॥
কহিবার যোগ্য নহি কি কহিব আমি।
শুনিতে একান্ত ইচ্ছা আজ্ঞা কর তুমি॥
ইহার এককের আছে শুন একমনে।
পোষকের মধ্যে সিদ্ধি থাকে কোন স্থানে॥
পোষকেতে পঞ্চ আর আছে ইস্ত্রীগণ।
সিদ্ধি দেহের প্রাণ কিবা কি তার লক্ষণ॥

অন্ত্য ঃ শ্রীগুরু বৈষ্ণবগোসাঞি যদি কৃপা করে।
তবে পাবে প্রেমধন কহিলাম তোমারে॥
মনের অগোচর নাহি সর্বকার্য জানে।
যে কার্য ছাড়ি মন করে নানা স্থানে॥

মনে যদি করে কৃপা কার্য সিদ্ধি হয়।
ক্ষেণেক না চাইতে পারে মন মহাশয় ॥
মন ভালো কর গুরু বৈষ্ণব গোসাঞি।
তবে সাধ্য সিদ্ধি হয় কিছু ভয় নাই ॥

ইতি শ্রীজীব গোস্বামীর কড়চা গ্রন্থ সমাপ্ত।

মণীন্দ্রমোহন বসু তাঁহার 'সহজিয়া সাহিত্য' গ্রন্থে (পৃঃ ৮৩) সনাতনের নামে একটি ও রূপের নামে দুইটি সহজিয়া পদ উদ্ধার করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ সপ্ততীর্থ তাঁহার 'সহজ সাধন' নামক গ্রন্থে 'সিদ্ধিকল্পলতিকা' নামে একটি সহজিয়া গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন এবং উহা রূপকৃত বলিয়াছেন। জগদ্বন্ধু ভদ্র গৌরপদতরঙ্গিণীতে (পৃঃ ৪৮) 'রসময়কলিকা' নামে একটি গ্রন্থ সনাতনকৃত বলিয়াছেন। ইহাও সহজিয়া গ্রন্থ হইবে। নগেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বকোষে (১৬শ খণ্ড, পৃঃ ৬৯১) কারিকা নামে একটি বাংলাগ্রন্থ রূপকৃত বলিয়াছেন। ইহাও সহজিয়া গ্রন্থ। এই সমস্ত সহজিয়া গ্রন্থের কোন কোনটিকে সেকালে কেহ কেহ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। রামগতি ন্যায়রত্ন লিখিয়াছেন, "কেহ কেহ জীব-গোস্বামীর কড়চাকেই বাঙ্গালার আদি (বৈষ্ণব) গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন···রচনা কিছু প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয় বটে। পরলোকগত ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহের মতানুসারে উক্ত কড়চা চৈতন্যের অন্তর্হিত হইবার প্রায় সমকালেই রচিত হইয়াছিল।"[১] রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় শুধু জীবের নাম দেখিয়াই বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন। জীব বাংলাভাষায় কিছু লিখেন নাই। ছয়-গোস্বামীর মধ্যে যে পাঁচজন গোস্বামী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই নিখিল ভারতে প্রচারের জন্য গ্রন্থাদি সংস্কৃতে লিখিয়াছিলেন।

১ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, পৃঃ ৭৩-৭৪ (৩য় সং)

পরিশিষ্ট খ

গোস্বামী গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত গ্রন্থের বর্ণানুক্রমিক সূচী

পুরীদাস সং=পু, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং=রা, হরিদাস দাস সং=হ, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সং=র, সাউরী প্রপন্নাশ্রম সং=সা। বৃহৎ ভাগবতামৃত টীকা=বৃ. ভা. টী., হরিভক্তিবিলাস=হ. ভ., হরিভক্তিবিলাস টীকা=হ. ভ. টী., বৃহৎবৈষ্ণবতোষণী=বৃ. বৈ., ভক্তিরসামৃতসিন্ধু=ভ. র., উজ্জ্বলনীলমণি=উ. নী., সংক্ষেপভাগবতামৃত=স. ভা., নাটকচন্দ্রিকা=না. চ., মথুরা মাহাত্ম্য=ম. মা., হরিনামামৃতব্যাকরণ=হ. ব্যা., গোপালচম্পূ (পূর্ব)=গো. চ. পু, ব্রহ্মসংহিতা=ব্র. স., প্রীতিসন্দর্ভ=প্রী. স., ভগবৎসন্দর্ভ=ভগ. স., ভক্তিসন্দর্ভ=ভ. স., পরমাত্মসন্দর্ভ=প. স., কৃষ্ণসন্দর্ভ=কৃ. স., তত্ত্বসন্দর্ভ=ত. স., সংক্ষেপ বৈষ্ণবতোষণী=স. বৈ., ক্রমসন্দর্ভ=ক্র., স., সর্বসম্বাদিনী=স. স., দুর্গমসঙ্গমনী=দু. স., লোচনরোচনী=লো. রো. কৃষ্ণজন্মতিথিবিধি=কৃ. জ. তি., সুখবোধিনী টীকা=সু. বো., যোগসারস্তব টীকা=যো. সা., রাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা=রা. কৃ. দী., লঘুরাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা=লঘু. রা. কৃ. দী., গায়ত্রীভাষ্য=গা. ভা., মুক্তাচরিত=মু. চ.

অগস্ত্যসংহিতা—ক্র. স. (৭।৫।২৮ প), হ. ভ. টী. (১।৬।৪২ পু)। হ. ভ. (১।৪২ পু), ভ. র. (১।২।৭০ পু), ভ. স. (পৃঃ ৪৮৭ রা)

অগ্নিপুরাণ—ক্র. স. (১।১।১ পু), রা. কৃ. দী. (পৃঃ ২ পু), হ. ভ. টী. (২।১৫। ৩৭ পু), হ. ভ. (৫।৩০৪ পু), ভ. র. (১।২।১৬৯ পু), ত. স. (পৃঃ ২১ রা), প. স. (পৃঃ ৭৮ রা), ভ. স. (পৃঃ ৪৯৯ রা), বৃ. বৈ. (৪৭।১১ পু)

অঙ্গিরা স্মৃতি—হ. ভ. (৪।১৫৩ পু)

অত্রি স্মৃতি—হ. ভ. (৩।১৩৪ পু)

অথর্বনীশ্রুতি—হ. ভ. টী. (১১৭।৫৩ পু). ত. স. (পৃঃ ১৪ রা)

অথর্ববেদ—ক্র. স. (১।৪।১৩ পু)

অথর্বাহ্নিক—প. স. (পৃঃ ১৬০ রা)

অথর্বশির উপনিষদ্—ক্র. স. (১।১।১ পু)

অর্থশাস্ত্র—বৃ. বৈ. (৮৭।২৫ পু)

অধ্যাত্মরামায়ণ—স. বৈ. (৮৭।১ পু)

অনর্ঘরাঘবম্—হ. ব্যা. (৬।৫২ পু)

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্—হ, ব্যা. (৭।৮৬ পু). স. বৈ. (৮।২৩ পু)

অভিরাম রাঘবম্—না. চ. (২৪ সংখ্যক শ্লোক পু)

অমর কোষ—স. বৈ. (৫।১৭ পু), ক্র. স. (১।২।৮ পু) ব্র. সং (পৃঃ ১৪ পু) রা. কৃ. দী. (পৃঃ ৮ পু), লোচনরোচনী (পৃঃ ২৬৫ রা). দু. স. (১।৩।৪৭-৫০), হ. ব্যা. (২।১৭৫ পু), বৃ. বৈ. (২১।১৮ পু)

অমরকোষ টীকা (ক্ষীরস্বামী)—ক্র. স. (১০।৫।৩ পু), লো. রো. (পৃঃ ১৩২ রা), হ. ব্যা. (২৭৫ পু), স. বৈ. (৬।৩৯-৪১ পু)

অষ্টকবৃত্তি—হ. ব্যা. (৩৪৭ পু)

আখ্যাতচন্দ্রিকা—হ. ব্যা. (৩।৩৫ পু)

আগম—স. বৈ. (১২।২-৩ পু), ক্র. স. (৮।৬।৮ পু), কৃ. স. (পৃঃ ৭৬ রা), ভ. স. (পৃঃ ৬২৬ রা), প্রী. স. (পৃঃ ৪৭৭ রা), দু. স. (৩।৩।১২৮ হ), স. ভা. (২।৪৪ পু), হ. ভ. (১।১২১ পু)

আঙ্গিরসপুরাণ—হ. ভ. (১১।২১৪ পু)

আত্মোপনিষদ—স. স. (পৃঃ ১৪১ র)

আদিত্যপুরাণ—হ. ভ. (১০।১৩০ পু), স. ভা. (২।৬ পু), ভ. র. (১।২।২১৮ পু), স. বৈ. (৪।৬।৪ পু), কৃ. স. (পৃঃ ৫৭৭ রা), প্রী. স. (পৃঃ ৫৬৭ রা), রা. কৃ. প (পৃঃ ৪ পু)

আদিবরাহ পুরাণ—রা. কৃ. দী. (পৃঃ ৪ পু), ব্র. স. (পৃঃ ১৭ পু), হ. ভ (৫।৫০ পু), বৃ. বৈ. (৩৬।৯ পু), ম. মা. (৩।১৮ পু), ভ. র. (১।২।২১১), কৃ. স. (পৃঃ ৩০০ রা), ভ. স. (পৃঃ ৪৯৬ রা), ক্র. স. (১।১৯।১ পু), স. বৈ. (৯।১৫০ পু)

আপিশলসূত্রম্—হ. ব্যা. (৪।৩৫ পু)

আলমন্দারুকৃত স্তোত্র—বৃ. ভা. টী. (১।৪।৯০ সা)

ইতিহাস সমুচ্চয়—ক্র. স. (৩।৩১।১১ পু), হ. ভ. টী. (১০।১১৩ পু), হ. ভ. (১০।১১৩ পু), বৃ. বৈ. (২৮।১৬ পু), বৃ. ভা. টী. (২।৩।১০৪ সা), দু. স. (১।১২ ১৮৩-৮৫২), ভগ. স. (পৃঃ ৩৮৭ রা), ভ. স. (পৃঃ ৫২৭ রা), স. বৈ. (২৮।১৭ পু)

ইতিহাসোত্তম—হ. ভ. (১১।৩৪৩ পু)

ঈশোপনিষদ—ক্র. স. (১।৩।৩৩ পু), স. স. (পৃঃ ১২৭ র)

উত্তরচরিতম্—দু. স. (৩।২।৩১-৩৫২)

উপদেশতত্ত্বসার—হ. ভ. (২।২৪৩ পু)

উপাসনাতন্ত্র—ব্র. স. (পৃঃ ২ পু)

ঋগ্বেদ—ব্র. স. (পৃঃ ১০ পু), হ. ভ. (১৫।২৩ পু), বৃ. বৈ. (৮।১০ পু) কৃ. জ. তি (পৃঃ ২ প), ত. স. (পৃঃ ১৩ রা), ভগ. স. (পৃঃ ১৫২ রা), কৃ. স.

স. স. (পৃঃ ১৫ র), হ. ভ. টী. (১৩।১৩ পু), হ. ভ. (১৭৯ পু), স. ভা. (১৩৬৯ পু), বৃ. বৈ. (৯।১৭ পু), বৃ. ভা. টী. (২।২।১৭৯ সা)

কৃষ্ণকর্ণামৃতম্—উ. নী. (১৫।২৪৫ পু), স. বৈ. (৮।৩০ পু), ক্র. স. (১৯।২৪ পু), ভ. র. (১৩।৩৭ পু), ভ. স. (পৃঃ ৬০৯ রা), বৃ. বৈ. (৩।১৮ পু)

কৃষ্ণতাপনী—কৃ. স. (পৃঃ ৩০৯ রা)

কৃষ্ণদেবাচার্যপদ্ধতি—হ. ভ. টী. (২।১৯।৮৮৮ পু). হ. ভ. (১৫।৩৭৯ পু)

কেন উপনিষদ্—স. বৈ. (৮।১১ পু), ত. স. (পৃঃ ৯৪ রা), কৃ. স. (পৃঃ ৩১৯ রা), স. স. (পৃঃ ৬২ র), স. বো. (পৃঃ ৩ পু)

কেশবচরিতম্—না. চ. (৩৪ সংখ্যক শ্লোক পু)

কেশববৃত্তি—হ. ব্যা. (৩।৩১৫ পু)

কৈমুতিকন্যায়—স. বৈ. (৩৩।৩৩ পু)

কোটরব্য শ্রুতি—স. স. (পৃঃ ৪৭ র)

কৌৎস শ্রুতি—হ. ভ. (১২।৩৪৫ পু)

কৌষ উপনিষদ্—স. স. (পৃঃ ১০৪ র)

কৌষীতকী উপনিষদ্—স. স. (পৃঃ ১০৬ র)

কৌষিক শ্রুতি—স. স. (পৃঃ ১১৪ র)

কৌশীকী বৃত্তি—হ. ভ. (১৩।২৫ পু)

ক্রমদীপিকা—ক্র. স. (১১।১৬।২৯ পু), উ. নী. (১৪।৮০ পু), রা. কৃ. দী. (পৃঃ ১১ পু), লঘু রা. কৃ. দী. (পৃঃ ৪ পু), সু. বো. (পৃঃ ৬ পু), হ. ভ. টী. (১২।২ পু), স. ভা. (১৪৭০ পু), হ. ভ. (১৩৪ পু), বৃ. ভা. টী. (২।১।৩৫ সা), স. বৈ. (৩০।২৫ পু), দু. স. (৩।৪।১-১৬২)

ক্রমদীপিকা (পুরুষোত্তম বিরচিত)—হ. ভ. টী. (১২।১৫ পু)

স্কন্দপুরাণ—ক্র. স. (১।১।১ পু), স. বৈ. (১।২২ পু), ত. স. (পৃঃ ১৪ রা), ভগ. স (পৃঃ ৬৫ রা), প. স. (পৃঃ ৫৪ রা), কৃ. স. (পৃঃ ২৩ রা), ভ. স. (পৃঃ ৪৫৩ রা), প্রী. স. (পৃঃ ৪৫ রা), লো. রো. (পৃঃ ১১০ রা), হ. ভ. (৩।১৩ পু), ভ. র. (১২।৬২ পু) স. স. (পৃঃ ২৩ র), লঘু রা. কৃ. দী. (পৃঃ ৪ পু), রা. কৃ. দী (পৃঃ ৬ পু), সু. বো. (পৃঃ ১২ পু), হ. ভ. টী. (১১।১০৭ পু), লো. রো. (পৃঃ ১০ রা), স. ভা. (১২৬৫ পু), স. স. (১৭ সংখ্যক শ্লোক পু), দু. স. (১।১।১৭২), বৃ. ভা. টী. (২।১।১৬২ সা), বৃ. বৈ. (৯।১৭ পু), গো. চ. পূ. (পৃঃ ২৩৩ পু)

খ-মাণিক্য জ্যোতির্গ্রন্থ—স. বৈ. (৩।১ পু), গো. চ. পূ (পৃঃ ৬ পু)

গরুড় পুরাণ—ভ. র. (১২।১৭১ পু), ত. স. (পৃঃ ৩৯ রা), ভগ. স. স. (পৃঃ

গৌতমীয়তন্ত্র—কৃ. স. (পৃঃ ২২০ রা), ভ. স. (৫৪৭ রা), প্রী. স. (পৃঃ ৯৫৯ রা), লঘু. রা. কৃ. দী. (পৃঃ ১৪ পু), রা. কৃ. দী. (পৃঃ ৮ পু), সু. বো. (পৃঃ ৬ পু), হ. ভ. টী (১৩।১১৫ পু), লো. রো. (পৃঃ ৯৪০ রা), ব্র. স. (পৃঃ ২ পু), হ. ভ. (১।১৭০ পু), ম. মা. (১১০ সংখ্যক শ্লোক পু), দু. স. (১।২।১০৮-১১৩ হ), স. বৈ. (৩।৯-১০ পু) ক্র. স. (১।২।২৪ পু), গো. চ. পু (পৃঃ ১৩৮ পু)

গৌড়সৎসম্প্রদায় পুস্তকম্—ব্র. বৈ. (১১।১২ পু)

চতুর্বর্গচিন্তামণি—ক্র. স. (১১।২।১৫ পু), ত. স. (পৃঃ ৪৩ রা)

চন্দ্রগোমী ব্যাকরণ—হ. ব্যা. (৪।৩৬ পু)

চতুর্বেদশিখা—স. স. (পৃঃ ৬৪ র), ত. স. (পৃঃ ৭১ রা), ভগ. স. (পৃঃ ১১৯ রা), প. স. (পৃঃ ১২০ রা), কৃ. স. (পৃঃ ২২৫ রা), স. ভা. (১।৬৯১ পু)

চিৎসুখ—ব্র. বৈ. (৩।৪৪ পু), ক্র. স. (৪।৭।২৮ পু)

চূর্ণিকা—ক্র. স. (২।২।১ পু), স. স. (পৃঃ ১২০ র)

ছন্দোমঞ্জরী—উ. নী. (১১।৩০ পু)

ছান্দোগ্য উপনিষদ্—ব্র. বৈ. (৫।৭।৩০ পু), ক্র. স. (১।১।১ পু. স. বৈ. ৩। ৪৫ পু), ত. স. (পৃঃ ১৬ রা), কৃ. স. (পৃঃ ১১৩ রা), হ. ভ. (১।৬৫ পু)

ছন্দোগপরিশিষ্টম্—হ. ভ. টী. (১৬।২৫৯ পু), হ. ভ. (১৫।৬৪ পু), ভ. স. (পৃঃ ৬৪৯ রা)

ছান্দস (বার্তিক ভাষ্য)—ক্র. স. (৮।১।৯ পু), হ. ব্যা. (৬।২৯৭ পু). দু. স. (১।৪৬ পু)

জগন্নাথবল্লভম্—উ. নী. (১৩।৬৪ পু)

জাবালি সংহিতা—হ. ভ. (১১।৪৮৩ পু), ভ. স. (পৃঃ ৬২২ রা)

জ্ঞানমালা—হ. ভ. (৯।২০৩ পু)

জৈনজঙ্গমম্লেচ্ছশাস্ত্রম্—ব্র. বৈ. (৮৭।৩৭ পু)

জৈমিনি সংহিতা—হ. ভ. (১১।৫১৬ পু)

জ্যোতিঃশাস্ত্র—লো. রো. (পৃঃ ১১০ রা)

তত্ত্ববাদগুরু—কৃ. স. (পৃঃ ৩৭ রা), ব্র. বৈ. (১২।১ পু)

তত্ত্বদীপিকা—ক্র. স. (১।১।১ পু)

তত্ত্বযামল—ব্র. ভা. টী. (২।১১।১৬০ সা)

তত্ত্বসাগর—ভ. স. (পৃঃ ৬৩২ রা), হ. ভ. (১।৫৬ পু)

তত্ত্বসার—হ. ভ. (৬।৩৪ পু)

তন্ত্রবার্তিক—স. স. (পৃঃ ১০ র), ক্র. স. (১১।৫।১৫ পু)

তন্ত্রান্তর—ভ. স. (পৃঃ ৬২৭ রা)

ধাতুপারায়ণম্—হ. ব্যা. (৩।১১৫-১৬ পু)

নবপ্রশ্নপঞ্চরাত্রম্—হ. ভ. (১৫।১০৫ পু)

নন্দিপুরাণম্—হ. ভ. (৬।২৬১ পু)

নাট্যশাস্ত্রম্—না. চ. (১ সংখ্যক শ্লোক পু), ভ. র. (৪।৮।৪৩ পু)

নামকৌমুদী— ক্র. স. (৯।৭।৭ পু), স. স. (পৃঃ ১৬১ র), ভ. র. (৩।২।২ পু)

নামশ্রুতিভাষ্য—হ. ভ. টী. (২।১১।৩৭১ পু)

নারদকল্প—হ. ভ. (৮।৪০ পু)

নারদতন্ত্র—হ. ভ. (২।২৩ পু), প. স. (পৃঃ ৩৩ রা), ক্র. স. (১।৩।১ পু)

নারদপঞ্চরাত্র—রা. কৃ. দী. (পৃঃ ৯ পু), ব্র. স. (পৃঃ ১৬ পু), হ. ভ. টী. (১।১৫৪ পু), লো. রো. (পৃঃ ৯৩৭ রা), হ. ভ. (১।৪৭ পু), স. ভা. (১:৩৫৭ পু) বৃ. ভা. টী. (১৩ ৪৪ সা), বৃ. বৈ. (২৮।১৬ পু), দু. স. (১।৪।৯-১২২), ভ. র. (১।১।১২ পু), ভগ. স. (পৃঃ ১৮২ রা), প. স. (পৃঃ ২৫ রা), কৃ. স. (পৃঃ ২৯৯ রা), ভ. স. (পৃঃ ৫৭৬ রা), প্রী. স. (পৃঃ ২২৪ রা), স. স. (পৃঃ ৫৭ র) স. বৈ. (২।২৮ পু), ক্র. স. (২।৯।৯ পু)

নারদপুরাণ—হ. ভ. (৪।৩৮ পু) ভ. র. (১।২।১০৩ পু), ভগ. স. (পৃঃ ৪০২ রা), প. স. (পৃঃ ১৯৭ রা), ভ. স. (পৃঃ ৪০৯ রা), স. স. (পৃঃ ১৫১ র) ক্র. স. (পৃঃ ২।৬ ১৮ পু)

নারদস্মৃতি—হ. ভ. (১২।৪৬ পু)

নারায়ণোপনিষদ্—কৃ. স. (পৃঃ ১৫৪ রা), প. স. (পৃঃ ১৫৪ রা), স. স. (পৃঃ ১২ র), ক্র. স. (২।৬।১৮ পু)

নারায়ণাধ্যাত্মম্—স. ভা. (১।৭০০ পু), ভগ. স. (পৃঃ ২২০ রা), প্রী. স. (পৃঃ ১২৭ রা)

নারায়ণধর্মন্ তন্ত্র—কৃ. স. (পৃঃ ১৯৩ রা)

নারায়ণ সংহিতা—ভগ. স. (পৃঃ ২৩৮ রা), ক্র. স. (৮।৩।৮ পু)

ন্যায়সূত্রম্—স. স. (পৃঃ ৭ র)

ন্যায়ামৃত—স. বৈ. (৮৭।২ পু)

নিগম—হ. ভ. (১৬।২২৯ পু)

নির্ঘণ্ট—ভা. স. (পৃঃ ১১৯ রা), কৃ. স. (পৃঃ ২৫৯ রা)

নির্ণয়ামৃতম্—হ. ভ. (১৬।২২৭ পু)

নিরুক্তি—রা. কৃ. দী. (পৃঃ ৯ পু), ভগ. স. (পৃঃ ৯ রা), ভ. স. (পৃঃ ৫২৯ রা)

নীতিশাস্ত্রম্ —হ. ব্যা. (৭।১০৩৭ পু), বৃ. বৈ. (৩৬।৩৯ পু)

(পৃঃ ৩৫ রা), ভ. স. (পৃঃ ৫৩২ রা) প্রী. স. (পৃঃ ৬০৭ রা), বৃ. বৈ. (১৪।১৪ পু), দু. স. (২।১।৪১-৪৩ হ), সু. বো. (পৃঃ ৩২ পু), রা. কৃ. দী. (পৃঃ ৬ পু), স. বৈ. (১।২২ পু), হ. ভ. টী. (১৩।১৪২ পু), গো. চ. পু. (পৃঃ ৫ পু)

ব্রহ্মসূত্র—ক্র. স. (১।১।১ পু), স. ভা. (১।৮ পু), ত. স. (পৃঃ ৩২ রা), ভা. স. (পৃঃ ১৮১ রা), প. সু. (পৃঃ ২১ রা), কৃ. স. (পৃঃ ৮১ রা), ভ. স. (পৃঃ ৬৫৭ রা), প্রী. স. (পৃঃ ৭৭ রা) স. স. (পৃঃ ১১ র), বৃ. বৈ. (৯।১৭ পু), ব্র. স. (পৃঃ ১৫ পু)

বাক্যপদীয়—স. স. (পৃঃ ১৫ র)

বামনকল্প—হ. ভ. (৪।৩৫৩ পু)

বামনপুরাণ –স. বৈ. (২১।১৫ পু), প. স. (পৃঃ ৫৭ রা), ক্র. স. (১।২।২৪ পু), হ. ভ. (৩.৫৯ পু), বৃ. ভা. টী. (২।৩।৭৭-৭৮ সা), ম. মা. (৯৯ সংখ্যক শ্লোক) বৃ. বৈ. (২১।১৫ পু), হ. ভ. টী. (১৭।২২৭ পু)

বায়ুপুরাণ—ক্র. স. (১।১।১ পু), হ. ভ. (৪।৫৮ পু), ম. মা. (২৮ সংখ্যক শ্লোক) ত. স. (পৃঃ ১৭ রা) ভগ. স. (পৃঃ ৩৯১ রা), কৃ. স. (পৃঃ ৩০২ রা), স. স. (পৃঃ ৫১ র) হ. ভ. টী. (১৩।১৩ পু)

বাসনাভাষ্য—ক্র. স (১।১।১ পু), ভ. স. (পৃঃ ৫০৫ রা), প্রী. স. (পৃঃ ৫৬৮ রা) স. বৈ. (২।৩২ পু)

বাসুদেবাধ্যাত্মম্—স. ভা. (১।৬৮৪ পু), ভগ. স. (পৃঃ ২৪৬ রা)

বাসুদেবোপনিষদ্—ক্র. স. (১১।১৬।১৯ পু), স. ভা. (১।৬৭৯ পু), কৃ. স. (পৃঃ ১৫৪ রা), প্রী. স. (পৃঃ ৩৮ রা)

ব্যাসতীর্থ—(ব্রহ্মসূত্রের টীকা)—ত. স. (পৃঃ ৭২ রা)

ব্যাসস্মৃতি—হ. ভ. (১৭।১৩৫ পু), স. স. (পৃঃ ৯৫ র)

বার্ষায়নি—হ. ভ. (১২।২০৩ পু)

বিজয়ধ্বজা (ভাগবতের টীকা)—ত. স. (পৃঃ ৭২ রা)

বিদ্বৎকামধেনু—ক্র. স. (১।১।১ পু)

বিশ্বকর্মাশাস্ত্রম্—ক্র. স. (১।১।১ পু)

বিশ্বকোষ—স. বৈ. (৩।৪৬ পু)

বিশ্বপ্রকাশ—লো. রো. (পৃঃ ৩৭ রা), হ. ব্যা. (৬।২৯৬ পু), ভগ. স. (পৃঃ ১২০ রা), স. বৈ. (১।৭ পু), দু. স. (১।১।১ হ), ক্র. স. (৩।২।১৫ পু), সু. বো. (পৃঃ ১৮ পু)

বিশ্বামিত্রসংহিতা—হ. ভ. (১১।৩৮৩ পু)

বিষ্ণুগুপ্তসংহিতা—উ. নী. (৩।২১ পু)

ভারতবিভাগ—হ. ভ. (১৪।৪২৩ পু)

ভাল্লবেয়শ্রুতি—ক্র. স. (২।২।৩৫ প), স. স. (পৃঃ ১৩১ র), প. স. (পৃঃ ৪১৭ রা)

ভাষাবৃত্তি—হ. ব্যা. (২।১৪৩ পু), দু. স. (৩ ২।১৭-২৩ হ)

ভাষ্য (ছান্দোগ)—প্রী. স. (পৃঃ ২৮৯ রা)

ভাষ্যবার্তিকম্—হ. ব্যা. (৪।৩৫ পু)

ভাসতী (বৃহস্পতিমিশ্রকৃত শংকর ভাষ্য টীকা)—স. স. (পৃঃ ৯ র)

মৎস্যপুরাণ—ক্র. স. (১।১।১ পু), স. বৈ. (২১ ১৭ পু), রা. কৃ. দী. (পৃঃ ১২ পু), হ. ভ. টী. (১২।৩৬ পু), লো. রো. (পৃঃ ১১০ রা), হ. ভ. (৬।২৪১ পু), ম. মা. (৩০৫ সংখ্যক শ্লোক পু), দু. স. (১।১।১২), ত. স. (পৃঃ ১৯ রা), ভগ. স. (পৃঃ ১৪৪ রা), প. স. (পৃঃ ৭৪ রা), কৃ. স. (পৃঃ ৫৬৭ রা), ভ. স. (পৃঃ ৬৪০ রা), স. স. (পৃঃ ৮৫ র), গো. চ. পু. (পৃঃ ৬ পু)

মনুসংহিতা—স. বৈ. (২৪।২৫ পু), ক্র. স. (৭।১১।৭ পু), ব্র. স. (পৃঃ ১২ পু), হ. ভ. (৩।২১৩ পু), ত. স. (পৃঃ ১২ রা), স. স. (পৃঃ ১৪ র), গো. চ. পু. (পৃঃ ৩২ পু)

মহাকূর্মপুরাণ—ক্র. স. (৭।১।৩০ পু), বৃ. বৈ. (২৯।৪০ পু), বৃ. ভা. টী. (২।৭।১৫১ সা), ভ. র. (১।২।৩০৪ পু)

মহানাটকম্—হ. ব্যা. (৭।২৫৯ পু)

মহানারায়ণোপনিষদ্—স. বৈ. (১৩।৫৪ পু), ক্র. স. (১।২।২৪ পু), স. স. (পৃঃ ৪৩ র)

মহাপুরাণ—ক্র. স. (১।১।৪ পু), হ. ভ. টী. (১।১।৩০ পু), ভ. স. (পৃঃ ৪৫২ রা)

মহাবরাহপুরাণ—স. বৈ. (৮৭।২০ পু), স. ভা. (১।৮৮ পু), বৃ. ভা. টী. (২।৪।১৬০ সা), বৃ. বৈ. (১৪।৫৫ পু), ভ. র. (২।১।১৪৪-৪৫ পু), ভগ. স. (পৃঃ ৬২২ রা)

মহাভারত—বৃ. বৈ. (৮৭।৬ পু), স. বৈ. (১।৫ পু), ক্র. স. (১।১ ১ পু), হ. ভ. টী. (২।১২।৪২০ পু), ব্র. স. (পৃঃ ৩ পু), স. ভা. (১।৪১ পু), হ. ভ. (১।১১৩ পু), বৃ. বৈ. (১।৫ পু), বৃ. ভা. টী. (২।৭।৮১ সা), ভ. র. (২।৫।৯২ পু), ত. স. (পৃঃ ১২ রা) ভগ. স (পৃঃ ২২০ রা), প. স. (পৃঃ ১৩ রা), কৃ. স. (পৃঃ ৯ রা), ভ. স. (পৃঃ ৪৬৩ রা) স. স. (পৃঃ ১২ র)

মহাভাষ্য—স. বৈ. (২২।১৮ পু), হ. ব্যা. (২।৪৮ পু)

মহাসংহিতা—ক্র. স. (১।১।১৮ পু), হ. ভ. (১৫।১৭৫ পু), বৃ. ভা. টী. (২।৪।১৫৫ সা), ত. স. (পৃঃ ৭২ রা), ভগ. স. (পৃঃ ১১৭ রা)

শিববাক্যম্—উ. নী. (১৪।১৭১ পু)

শিবরহস্য—হ. ভ. (১২।৩১৬ পু)

শিবাগম—হ. ভ. (১৭।৮৭ পু)

শিলাধিবাসনপটল—হ. ভ. টী. (২।২০।২৩১ পু)

শুকহৃদয় (টীকা)—ক্র. স. (১।১১ পু)

শুকমনোহরা (টীকা)—স. বৈ. (১২।১ পু)

শুকসংহিতা—ভ. র. (১৩।২০ পু)

শুক্লযজুর্বেদ—কৃ. জ. তি. (পৃঃ ২ পু)

শুক্রস্মৃতি—হ. ভ. (৩।১৫৪ পু)

শিশুপালবধ—বৃ. ভা. টী. (২।৭।১৩৫ পু), স. বৈ. (৪১।২১ পু), ভ. র. (২।১।১১২ পু), দু. স. (২।১।১৮৪-১৮৭ হ), হ. ব্যা. (১।৯২ পু)

শিক্ষাষ্টক—হ. ভ. টী. (২।১১।৫২৩ পু)

শৃঙ্গারতিলক—বৃ. বৈ. (৫২।৩৮ পু), স. বৈ. (৫২।৩৮ পু)

শৃঙ্গারপ্রকাশ—প্রী. স. (পৃঃ ৫৭৯ রা), হ. ভ. (১৫।৩৮৮ পু)

শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ্—সু. বো. (পৃঃ ১৭ পু), রা. কৃ. দী. (পৃঃ ৬ পু), ব্র. স. (পৃঃ ১৩ পু), হ. ভ. (৪।৩৪৬ পু), বৃ. ভা. টী. (২।২।১৫৯ সা) বৃ. বৈ. (২৯।১২ পু) প. স. (পৃঃ ১৭৯ রা), স. স. (পৃঃ ৩৫ র) স. বৈ. (৩।১৭ পু), ক্র. স. (১।১।১ পু)

শ্রীধরস্বামীপাদ—(বিষ্ণুপুরাণ টীকা)—রা. কৃ. দী. (পৃঃ ৩ পু), হ. ভ. টী. (১৩।২৩ পু), লো. রো. (পৃঃ ৭৭৩ রা), ব্র. স. (পৃঃ ৩ পু), বৃ. বৈ. (১।৭ পু) বৃ. ভা. টী. (১।৫।৯৭ সা), ভ. র. (৩।২।১ পু), ত. স. (পৃঃ ৩৭ রা), ভগ. স. (পৃঃ ৪৪ রা), প. স. (পৃঃ ৩১ রা), কৃ. স. (পৃঃ ৪৩ রা), ভ. স. (পৃঃ ৪৬৮ রা), প্রী. স. (পৃঃ ৫৭৬ রা), স. স. (পৃঃ ৩ র), স. বৈ. (১।২ পু), ক্র. স. (১।১।১ পু)

শ্রীধরস্বামিকৃত নৃসিংহস্তব—স. বৈ. (৮৭।২২।২৩ পু)

শ্রীভাষ্য—ত. স. (পৃঃ ৭৯ রা), ভগ. স. (পৃঃ ৪২৬ রা), প. স. (পৃঃ ৯০ রা), কৃ. স. (পৃঃ ২৫৮ রা), ত. স. (পৃঃ ৬২৩ রা), স. স. (পৃঃ ৩৩ র), স. বৈ. (১৪।২২ পু)

শ্রীমদ্ আলোকমন্দার স্তোত্র—ভ. স. (পৃঃ ৬৪৬ রা)

ষট্‌ত্রিংশন্মতম্—হ. ভ. (৪।১১৭ পু)

সঙ্গীতশাস্ত্র—হ. ভ. (৮।২৯৩ পু)

সঙ্গীতসাগর—বৃ. বৈ. (৩৩।৯ পু)

সঙ্গীতসার—স. বৈ. (৩৩।৮ পু), রা. কৃ. দী. (পৃঃ ৬ পু)

সিদ্ধার্থসংহিতা—হ. ভ. (৫।২৭৭ পু)

সুবোধিনীটীকা (বল্লভাচার্য)—বৃ. বৈ. (৮।১৯ পু)

সুমন্তস্মৃতি—হ. ভ. (১২।৩৮৩ পু)

স্তোত্ররত্ন (যামুনমুনিকৃত)—ক্র. স. (৩।১৫।৩৯)

সৌপর্ণশ্রুতি—বৃ. বৈ. (৮৭।২১ পু), হ. ভ. (৯।৯৪ পু), স. স. (পৃঃ ৮৭ র), ভগ. স. (পৃঃ ৬১৯ রা), কৃ. স. (পৃঃ ৬৪১ রা), প্রী. স. (পৃঃ ২৩৯ রা)

সৌরপুরাণ—ম. ম. (২০১ সংখ্যক শ্লোক পু), হ. ভ. (১২।৪১ পু), বৃ. বৈ. (৮৭।১৬ পু) ভ. স. (পৃঃ ৬৪০ রা)

সৌরধর্ম—হ. ভ. (১২।১৭৯ পু)

সৌরধর্মোত্তর—হ. ভ. (১২।১৭৯ পু)

হনুমদ্‌বাক্যম্—ভ. র. (১২।৪৯ পু)

হনুমদ্‌ভাষ্য—ক্র. স. (১।১১ পু)

হরিবিলাস—না. চ. (৩২ সংখ্যক শ্লোক পু)

হরিবংশ—উ. নী. (৩।১১ পু), স. বৈ. (১।১৮ পু), ক্র. স. (১২।২৪ পু) রা. কৃ. দী. (পৃঃ ১০ পু), সু. বো. (পৃঃ ৯ পু), হ. ভ. টী. (১৩।২৩ পু), লো. রো. (পৃঃ ১২ রা), ব্র. স. (পৃঃ ৯ পু), হ. ভ. (১১২৯ পু), বৃ. ভা. টী. (১৪।৩২ সা), স. ভা. (১২৬০-২৬১ পু), দু. স. (১৩।৫৭-৬০ হ), বৃ. বৈ. (১।১৮ পু), ভ. র. (২।১।৯৫ পু), ভগ. স. (পৃঃ ৫০৪ রা), কৃ. স. (পৃঃ ২১ রা), ভ. স. (পৃঃ ৪৯৭ রা), প্রী. স. (পৃঃ ৯৫৭ রা.), স. স. (পৃঃ ২৫ র), গো. চ. পু. (পৃঃ ৫ পু)

হরিভক্তিসুধোদয়—ক্র. স. (৬।১৬।৩৪), রা. কৃ. দী. (পৃঃ ২ পু), হ. ভ. (৪।৩৯ পু) স. ভা. (২।৩ পু), বৃ. ভা. টী. (১৪।৯ সা), বৃ. বৈ. (৮৭।৩২ পু), ভ. র. (১।১।৩২ পু), প. স. (পৃঃ ২৯৫ রা), ভ. স. (পৃঃ ৫৯৭ রা), প্রী. স. (পৃঃ ৩৫৬ রা)

হরিলীলা—ক্র. স. (১।১১ পু)

হরিলীলাব্যাখ্যা—প্রী. স. (পৃঃ ৭২৫ রা)

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র—ক্র. স. (৭।১৪।৩৪ পু), রা. কৃ. দী. (পৃঃ ৯ পু) হ. ভ. টী. (২।১৮।৭০ পু), ব্র. স. (পৃঃ ৪ পু), হ. ভ. (১।৭১ পু), বৃ. বৈ. (৭।১৩-১৫ পু), ভ. র. (১২।৪৬-৪৮ পু), ত. স. (পৃঃ ৫৩ রা) ভগ. স. (পৃঃ ৬৪৫ রা), ভ. স. (পৃঃ ৫৭৬ রা), প্রী. স. (পৃঃ ২২৫ রা), গো. চ. পু. (পৃঃ ৬ পু)

হারীতস্মৃতি—হ. ভ. (২।৪৮ পু), হ. ভ. টী. (১৮।১৫৮ পু)

পরিশিষ্ট গ

রাধাকুণ্ড হইতে সংগৃহীত ফার্সী দলিলের ইংরাজী অনুবাদ (এই অনুবাদ মথুরা কোর্টে গৃহীত হইয়াছে)। মূলদলিলের প্রতিলিপি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাগারে রক্ষার জন্য দেওয়া হইয়াছে।

1. 18th September, 1546 (953 Hizri)

Deed of sale under the seal of protection of law of Kazi Badruddin on promise dated the 21st of Rajeh 953 Hizri (18th September, 1546). The cause was this :—We, Kamma, son of Kanru, Salwa son of Dosa, Adhra, son of Moksa, Majja, son of Kali, Kujja, son of Aswa, and Govinda, son of Kunka the inhabitants of village Arith alias Radhakunda in Pargana Sahar.

As a piece of land of the above village on the east and north in lieu of rupees thirty good and full weight coins through Raghunath Das to Jee Gossain, son of Ballava Gossain with our consent and wish and we received the amount in our possession and if any one claims it will be false.

2. 14th October, 1546

Copy of the deed of sale under the seal of the protection of law of Kazi Badruddin on promise dated the 17th of Shaban 958 Hizri (14th October, 1546). The cause was this :—We, Kamma, son of Kanru, Salwa, son of Dosa, Adhra, son of Moksa, Majja, son of Kali, Kujja, son of Aswa, Gobinda, son of Johra, and Bhooria, son of Kunk—the inhabitants of the village Arith alias Radhakunda in Pargana Sahar.

As we have sold a piece of land of the above village on the south and west in lieu of rupees thirty good and full weight coins through Raghunath Das to Jee Gossain, son of

Ballabha Gossain with our consent and wish. If any one claims and quarrels it will be false.

3. 25th January, 1553

Copy of the deed of sale under the seal of the protection of law of Kazi Badruddin on promise dated the 9th Safar, 960 Hizri (25th January, 1553). The cause was this :—We, Kamma, son of Kanru, Salwa, son of Dosa, Adhra, son of Moksa, Majja, son of Aswa, Gavinda, son of Johra, Bhooria, son of Kunka, inhabitants of the village Arith alias Radhakunda in Pargana Sahar.

As we have sold a piece of land of the above village relating to Krishnakunda north, east and south bounded on the north by large kareel tree and the well of Govinda, on the east by a Nala (drain) and trees of Hees, on the south by the temple of Mahadeo. With our consent and wish in lieu of eighty rupees through Raghunath Das to Jee Gossain, son of Ballabha Gossain and the above mentioned amount we took in our possession and use. If any one claims and disputes, all will be false.

4. 25th July, 1577

Copy of the deed of sale under seal of the protection of law of Kazi Badruddin on the promise dated the 9th Jamadi ii 985 Hizri (25th July, 1577). The cause was this :—We, Kamma, son of Kanru, Salwa, son of Dosa, Adhra, son of Moksa, Majja, son of Kali, Kujja, son of Aswa, Govinda, son of Johra, Bhooria, son of Kunka are the inhabitants of village Arith alias Radhakunda in Pargana Sahar. As we have sold the land of the above mentioned on the north the border of ghat and large Nim tree up to the border of a series of Hees bushes in lieu of sixtyfour rupees of good and correct weight coins to Jee Gossain, son of Ballabha Gossain with our full consent and desire and the above mentioned amount we

brought to our possession and use. If any one claims, it will be false.

5. 30th August, 1577

Copy of the deed of sale under seal of the protection of law of Kazi Badruddin on promise dated 15th Jamadi ii 985 (30th August, 1577). The cause was this :—We, Kamma, son of Kanru, Salwa, son of Dosa, Adhra, son of Moksa, Majja, son of Kali, Kujja, son of Aswa, Gobinda, son of Johra, Bhooria, son of Kunka are inhabitants of the village Arith alias Radhakunda in Pargana Sahar.

As we have sold the land of the above mentioned village relating to Krishnakunda on the south two ghats and the tree of Hees in lieu of twenty rupees good and full weight to Jee Gossain, son of Ballabha Gossain with our own consent and desire and took the above mentioned amount in our possession. If any one claims and disputes, it will be false.

6. 24th September, 1577

Copy of the deed of sale under seal of the protection of law of Kazi Badruddin on transaction dated 11th Rajab 985 (25th September, 1577). The cause was this :—We, Kamma, son of Kanru, Salwa, son of Dosa, Adhra, son of Moksa, Majja, son of Kali, Kujja, son of Aswa, Govinda, son of Johra, Bhooria, son of Kunka are inhabitants of the village Arith alias Radhakunda in Pargana Sahar.

As we have sold the piece of land in the above mentioned village with well and tank on the north in lieu of fourteen rupees good and full weight to Jee Gossain, son of Ballabha Gossain with our full consent and desire and we took the above mentioned amount in our possession and use. If any one claims, it will be false.

7. 25th September, 1577

Copy of the deed of sale under seal of the protection of law

of Kazi Badruddin on transaction dated the 12th Rajab, 985 Hizri (25th September, 1577). The cause was this :—We, Kamma, son of Kanru, Salwa, son of Dosa, Adhra, son of Moksa, Majja, son of Kali, Kujja, son of Aswa, Govinda, son of Johra are inhabitants of Arith alias Radhakunda in Pargana Sahar.

As we have sold the land in the above mentioned village on the north side from large Nim tree up to the path of the tank in lieu of fortyfour rupees through Raghunath Das to Jee Gossain, son of Ballabha Gossain with our full consent and will and we took the above amount in our possession and use. If any one claims, it will be false.

প্রমাণপঞ্জী ও প্রমাণ উদ্ধারের সঙ্কেত ব্যাখ্যা

[যে সকল গ্রন্থ হইতে বহুবার প্রমাণ উদ্ধার করা হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থের যে সংস্করণ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা হইল। সেই সঙ্গে ব্যবহৃত সঙ্কেতের পরিচয়ও দেওয়া হইল।]

ক। অপ্রকাশিত হাতে লেখা সংস্কৃত পুঁথি

১।	অজ্ঞাত	বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত গুরু-দেবাষ্টক টীকা	কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথি-সংখ্যা বৈষ্ণব ৯৯
২।	জীবগোস্বামী	বৃন্দাবন পদ্ধতি	বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত পুঁথি-সংখ্যা স্মৃতি ১৭৭
৩।	ঐ	শ্রীরূপচিন্তামণি টীকা	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত বিভাগে রক্ষিত পুঁথি-সংখ্যা ১৪৭৫। ক. বি.=কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৪।	রূপ গোস্বামী	অদ্বৈতস্তবরাজ	পাণিহাটি গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত পুঁথি-সংখ্যা ৯
৫।	ঐ	অনঙ্গমঞ্জরী স্তোত্র	বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত পুঁথি-সংখ্যা স্তোত্র ২ক
৬।	ঐ	শ্রীচৈতন্যদিব্য সহস্রনাম	বৃন্দাবন ভক্তিবিদ্যালয়ে রক্ষিত পুঁথি-সংখ্যা ৪৬৪
৭।	ঐ	যুগল স্তবরাজ	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত বিভাগে রক্ষিত পুঁথি-সংখ্যা ৪৫৬

খ। অপ্রকাশিত হাতে লেখা বাংলা পুঁথি

৮।	অজ্ঞাত	দিলকিতাব	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথি-সংখ্যা ৩১০২
৯।	অজ্ঞাত	স্বনিয়মদশক (অনুবাদ)	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত

পুঁথি-সংখ্যা ৩৬৯। ব. সা. প.= বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

১০। গিরিধর দাস মনঃশিক্ষা (অনুবাদ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথি-সংখ্যা ৩২৩৫

১১। নরসিংহ দাস হংসদূত („) ঐ সংখ্যা ৯৮২

১২। নরহরি দাস সূচক পাণিহাটি গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত পুঁথি-সংখ্যা ২৩

১৩। নারায়ণ দাস উজ্জ্বলনীলমণি („) বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত পুঁথি-সংখ্যা অনুবাদ ১৮

১৪। নরোত্তম দাস শ্রীরূপসনাতনসম্বিদ উপাসনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথি-সংখ্যা ১১৭০

১৫। নিমানন্দ দাস গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষ (অনুবাদ) বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত পুঁথি-সংখ্যা অনুবাদ ১২খ

১৬। পরাণ দাস গীতাবলী („) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথি-সংখ্যা ৩৪৭২

১৭। যদুনন্দন দাস মুক্তাচরিত („) বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত পুঁথি-সংখ্যা অনুবাদ ২৬

১৮। জীবগোস্বামী কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ (সহজিয়া) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথি-সংখ্যা ৯৮৮

১৯। ঐ জীবগোস্বামীর কড়চা („) ঐ সংখ্যা ১২৮৮

২০। রূপগোস্বামী সিদ্ধারতি প্রাপ্তি („) ঐ সংখ্যা ১৫৪৭

২১। শ্রীরঘুনাথ দাস আত্মনির্ণয় („) বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথি-সংখ্যা ১৯৪৯

২২। স্বরূপভূপতি মুক্তাচরিত (অনুবাদ) বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গগ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত পুঁথি-সংখ্যা অনুবাদ ২৭

২৩। হরিরাম দাস মনঃশিক্ষা („) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথি-সংখ্যা ১১৫৪

২৪।	ক্ষীরোদ রায়	পদাবলী সংগ্রহ	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি সংখ্যা ৬২০৪

গ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মুদ্রিত সংস্কৃত গ্রন্থ

২৫।	কবি কর্ণপুর	গৌরগণোদ্দেশদীপিকা	রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং
২৬।	ঐ	চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকম্	রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং
২৭।	ঐ	চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যম্	রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন (২য় সং) ৩৷১৷৪=তৃতীয় প্রক্রম, প্রথম সর্গ, চতুর্থ শ্লোক বুঝাইবে।
২৮।	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	গোবিন্দলীলামৃতম্	হরিদাস দাস সং, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী
২৯।	প্রবোধানন্দ	চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্	রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং
৩০।	বলদেব বিদ্যাভূষণ	স্তবমালাবিভূষণম্	রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং
৩১।	বিশ্বনাথ চক্রবর্তী	স্তবামৃতলহরী	রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং
৩২।	ঐ	আনন্দচন্দ্রিকা	রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং
৩৩।	মুরারি গুপ্ত	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতম্	মৃণালকান্তি ঘোষ সং (৪র্থ সং)
৩৪।	রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী	সাধনদীপিকা	হরিদাস দাস সং
৩৫।	ঐ	দশশ্লোকীভাষ্যম্	হরিদাস দাস সং
৩৬।	রূপ কবিরাজ	সারসংগ্রহ	আশুতোষ সংস্কৃত সিরিজ— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষ্ণ-গোপাল গোস্বামী সং
৩৭।	গোপালভট্ট গোস্বামী	হরিভক্তিবিলাসঃ	রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং, পুরীদাস সং। হ. ভ.=হরিভক্তিবিলাস
৩৮।	ঐ	সৎক্রিয়াসারদীপিকা	কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ সং
৩৯।	জীবগোস্বামী	হরিনামামৃতং ব্যাকরণম্	রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং, পুরীদাস সং
৪০।	ঐ	রাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা	পুরীদাস সং
৪১।	ঐ	গোপালবিরুদাবলী	পুরীদাস সং
৪২।	ঐ	মাধবমহোৎসবঃ	হরিদাস দাস সং
৪৩।	ঐ	সংকল্প কল্পবৃক্ষঃ	শচীনন্দন গোস্বামী সং

৪৪।	জীবগোস্বামী	ভক্তিরসামৃতশেষঃ	হরিদাস দাস সং
৪৫।	”	গোপালচম্পূঃ	রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ সং, পুরীদাস সং
৪৬।	”	ব্রহ্মসংহিতা টীকা	পুরীদাস সং
৪৭।	”	গোপালতাপনী উপনিষদ্ টীকা	পুরীদাস সং
৪৮।	”	দুর্গমসঙ্গমনী	হরিদাস দাস সং
৪৯।	”	লোচনরোচনী	রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং
৫০।	”	যোগসারস্তব টীকা	পুরীদাস সং
৫১।	”	গায়ত্রীভাষ্য	পুরীদাস সং
৫২।	”	ষটসন্দর্ভম্	নারায়ণ বিদ্যারত্ন সং, প্রীতি ও কৃষ্ণসন্দর্ভ প্রাণগোপাল গোস্বামী সং,
৫৩।	”	ক্রমসন্দর্ভম্	পুরীদাস সং
৫৪।	”	সর্বসম্বাদিনী	রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সং
৫৫।	রূপগোস্বামী	হংসদূতম্	বসুমতী সং, কৃষ্ণদাসবাবাজী সং
৫৬।	”	উদ্ধবসন্দেশঃ	জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সং, পুরীদাস সং
৫৭।	”	স্তবমালা	রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং, পুরীদাস সং
৫৮।	”	বিদগ্ধমাধব নাটকম্	রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং, পুরীদাস সং
৫৯।	”	ললিতমাধব নাটকম্	বসুমতী সং, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং
৬০।	”	দানকেলিকৌমুদী ভাণিকা	রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং
৬১।	”	ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ	পুরীদাস সং, হরিদাস দাস সং
৬২।	”	উজ্জ্বলনীলমণিঃ	রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং, পুরীদাস সং, উ. নিঃ =উজ্জ্বলনীলমণি
৬৩।	”	মথুরামহিমা	পুরীদাস সং
৬৪।	”	পদ্যাবলী	রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং, ডঃ সুশীলকুমার দে সং
৬৫।	”	নাটকচন্দ্রিকা	পুরীদাস সং

৬৬।	রূপগোস্বামী	লঘুভাগবতামৃতম্	পুরীদাস সং
৬৭।	”	বৃহৎ ও লঘু রাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশদীপিকা	রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং, পুরীদাস সং
৬৮।	”	সামান্যবিরুদাবলী	পুরীদাস সং
৬৯।	”	স্মরণমঙ্গলম্	কৃষ্ণদাস বাবাজী সং
৭০।	”	কৃষ্ণজন্মতিথিবিধিঃ	পুরীদাস সং
৭১।	সনাতন গোস্বামী	বৃহৎভাগবতামৃতম্	পুরীদাস সং, সাউরী-প্রপন্নাশ্রম সং
৭২।	”	বৃহৎবৈষ্ণবতোষণী	পুরীদাস সং
৭৩।	”	লীলাস্তবম্	পুরীদাস সং
৭৪।	রঘুনাথ-দাসগোস্বামী	মুক্তাচরিতম্	পুরীদাস সং
৭৫।		দানকেলিচিন্তামণিঃ	পুরীদাস সং
৭৬।		স্তবাবলী	রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং, পুরীদাস সং
৭৭।		শ্রীনিবাসাচার্যগ্রন্থমালা	হরিদাস সং

ঘ। অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ

৭৮।	কৃষ্ণদাসবাবাজী সংকলিত	গ্রন্থরত্নষটকম্	
৭৯।	চণ্ডেশ্বর	কৃত্যরত্নাকর	
৮০।	জয়দেব	গীতগোবিন্দ	
৮১।	নারায়ণ ভট্ট	ব্রজভক্তিবিলাস	
৮২।	বল্লভাচার্য	সুবোধিনী টীকা	
৮৩।	বিল্বমঙ্গল	কৃষ্ণকর্ণামৃতম্	
৮৪।	মধুসূদন সরস্বতী	অদ্বৈতসিদ্ধি	রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সং
৮৫।	রঘুনন্দন ভট্টাচার্য	উদ্বাহতত্ত্বম্	
৮৬।	”	একাদশীতত্ত্বম্	
৮৭।	”	আহ্নিকতত্ত্বম্	
৮৮।	লক্ষ্মীধর	কৃত্যকল্পতরু	
৮৯।	হেমাদ্রি	চতুর্বর্গচিন্তামণি	
৯০।		কাত্যায়ণশ্রৌতসূত্রম্	
৯১।		পদ্মপুরাণম্	

৯২। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্

৯৩। বাচস্পত্যভিধানম্

৯৪। মনুসংহিতা

৯৫। শব্দকল্পদ্রুমম্

৯৬। শ্রীমদ্ভাগবতম্

৬। বাংলা ভাষায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের গ্রন্থ

৯৭।	কানাই দাস	বৃহদ্ভাগবতামৃতকণা	হরিদাস দাস সং
৯৮।	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	চৈতন্যচরিতামৃত	রাধিকানাথ গোস্বামী সং, জগদীশ্বর গুপ্ত সং, বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী সং, মাখনলাল ভাগবত-ভূষণ সং, শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সং, প্রমাণপ্রয়োগে ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ সংস্করণ ব্যবহৃত হইয়াছে, চৈ. চ.=চৈতন্যচরিতামৃত, ১৷৩৷৪ =আদিলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, চতুর্থ পয়ার বুঝাইবে।
৯৯।	খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত	পদামৃতমাধুরী	
১০০।	গৌরসুন্দর দাস	কীর্তনানন্দ	বনওয়ারীলাল গোস্বামী সং
১০১।	জগদ্বন্ধু ভদ্র সংকলিত	গৌরপদতরঙ্গিণী	
১০২।	জয়গোবিন্দ দাস	বৃহদ্ভাগবতামৃতানুবাদ	অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সং
১০৩।	জয়ানন্দ	চৈতন্যমঙ্গল	কালিদাস নাথ ও নগেন্দ্রনাথ বসু সং
১০৪।	দেবকীনন্দন	বৈষ্ণববন্দনা ও বৈষ্ণব-অভিধান	সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সং
১০৫।	নরহরি চক্রবর্তী	ভক্তিরত্নাকর	গৌড়ীয় মিশন সং, ভ. র.=ভক্তি-রত্নাকর, ১৷৪=প্রথম তরঙ্গ, ৪র্থ পয়ার বুঝাইবে।
১০৬।	”	নরোত্তমবিলাস	রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং
১০৭।	নরোত্তম ঠাকুর	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সং
১০৮।	নারায়ণ দাস	মুক্তাচরিত	হরিদাস দাস সং

১০৯।	নিত্যানন্দ দাস	প্রেমবিলাস	রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং, যশোদা-নন্দন তালুকদার সং
১১০।	বলরাম দাস	পদাবলী	ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য সং
১১১।	বৃন্দাবন দাস	চৈতন্যভাগবত	সতেন্দ্রনাথ বসু সং, চৈ. ভা. =চৈতন্য ভাগবত, ৩।৪=অন্ত্যলীলা, ৪র্থ খণ্ড
১১২।	বৈষ্ণবদাস	পদকল্পতরু	সতীশচন্দ্র রায় সং
১১৩।	মনোহর দাস	অনুরাগবল্লী	মৃণালকান্তি ঘোষ সং (৩য় সং)
১১৪।	মালাধর বসু	শ্রীকৃষ্ণবিজয়	খগেন্দ্রনাথ মিত্র সং
১১৫।	যদুনন্দন দাস	কর্ণানন্দ	রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং (২য় সং)
১১৬।	”	কৃষ্ণকর্ণামৃত (অনুবাদ)	বটতলা সং
১১৭।	”	দানকেলিকৌমুদী ঐ	কেশব দে সং
১১৮।	”	রসকদম্ব ঐ	রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং
১১৯।	রসময় দাস	শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী ঐ	ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সং
১২০।	রাজবল্লভ দাস	মুরলীবিলাস	
১২১।	রাধামোহন ঠাকুর	পদামৃতসমুদ্র	রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং
১২২।	লালদাস বা কৃষ্ণদাস	ভক্তমাল	অবিনাশ মুখোপাধ্যায় সং অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সং শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী সং
১২৩।	লোচন দাস	চৈতন্যমঙ্গল	মৃণালকান্তি ঘোষ সং (৩য় সং)
১২৪।	শচীনন্দন বিদ্যানিধি	উজ্জ্বলচন্দ্রিকা (অনুবাদ) বিবর্তবিলাস	কুলদাপ্রসাদ মল্লিক সং বিপিনবিহারী বিশ্বাস সং

চ। অন্যান্য বাংলা গ্রন্থ

১২৫।	অক্ষয়কুমার দত্ত	ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ১ম ভাগ	
১২৬।	অঘোর চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমৎ রঘুনাথ গোস্বামীর জীবনচরিত	
১২৭।	অচ্যুতকিরণ চৌধুরী	শ্রীমৎ গোপাল ভট্ট গোস্বামীর জীবনচরিত	
১২৮।	”	শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত	
১২৯।	অমূল্যধন রায় ভট্ট	বৃহৎ বৈষ্ণবচরিত অভিধান (অ-চ)	
১৩০।	কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	চণ্ডীমঙ্গল	বঙ্গবাসী সং
১৩১।	কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী	নবদ্বীপমহিমা	
১৩২।	গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী	বাংলা চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য	

১৩৩। গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী — শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ
১৩৪। গোবর্ধন দাস — শ্রীশ্রীব্রজধাম ও গোস্বামিগণ
১৩৫। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস — বঙ্গের বাহিরে বাঙালী (উত্তর ভারত)
১৩৬। ,, — বাংলাভাষার অভিধান (২য় খণ্ড)
১৩৭। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড
১৩৮। ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য — বাংলার বাউল ও বাউল গান
১৩৯। ডঃ তমোনাশ দাশগুপ্ত — প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
১৪০। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন — বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
১৪১। ,, — বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, ১ম খণ্ড
১৪২। ,, — বৃহৎবঙ্গ, ২য় খণ্ড
১৪৩। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল — সাহিত্য প্রকাশিকা, ২য় খণ্ড
১৪৪। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার — শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (১ম ও ২য় সং)
১৪৫। ,, — ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য
১৪৬। ,, — গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ
১৪৭। ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি — চৈতন্য পরিকর
১৪৮। ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ — শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা (৩য় সং)
১৪৯। ,, — শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য, পরিশিষ্ট
১৫০। ,, — শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন, ৪র্থ খণ্ড
১৫১। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত — শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে (৩য় সং)
১৫২। ডঃ সুকুমার সেন — বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ডার্ধ পূর্বা (৩য় সং)
১৫৩। ,, — ভাষার ইতিবৃত্ত (৬ষ্ঠ সং)
১৫৪। ডঃ সুশীলকুমার দে — নানা নিবন্ধ
১৫৫। ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য — কবি বিদ্যাপতি
১৫৬। দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় — রূপসনাতন
১৫৭। ধনকৃষ্ণ অধিকারী — সনাতন গোস্বামী ও রূপগোস্বামীর জীবনচরিত
১৫৮। নগেন্দ্রনাথ বসু — বিশ্বকোষ ৫ম, ৭ম, ১৬শ ও ২১শ খণ্ড
১৫৯। ,, — বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১ম ভাগ
১৬০। পুলিনবিহারী দাস — বৃন্দাবন কথা

১৬১। ব্রজমোহন দাস — শ্রীগৌরগুণসংক্ষিপ্তচরিতরত্নাবলী
১৬২। মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি — গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাস
১৬৩। মণীন্দ্রমোহন বসু — সহজিয়া সাহিত্য
১৬৪। মুরারিলাল অধিকারী — বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী
১৬৫। বিজয় গুপ্ত — মনসামঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ সং
১৬৬। বিজয় পণ্ডিত — মহাভারত, সাহিত্য পরিষদ্‌ সং
১৬৭। যদুনাথ সর্বাধিকারী — তীর্থভ্রমণ
১৬৮। রজনীকান্ত চক্রবর্তী — গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড
১৬৯। রবীন্দ্রনাথ সপ্ততীর্থ — সহজসাধন
১৭০। রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ — শ্রীমৎ রূপসনাতনশিক্ষামৃত ১ম ও ২য় খণ্ড
১৭১। ” — শ্রীকৃষ্ণমাধুরী
১৭২। ” — শ্রীমৎ দাস গোস্বামী
১৭৩। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — বঙ্গের ইতিহাস, ২য় ভাগ
১৭৪। রাধানাথ কাবাসী — বৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার, ২য় ও ৪র্থ খণ্ড
১৭৫। রামগতি ন্যায়রত্ন — বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১ম ও ৩য় সং)
১৭৬। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — সনাতন গোস্বামী
১৭৭। শশিভূষণ বিদ্যালংকার — জীবনীকোষ, ৩য় খণ্ড
১৭৮। শিবরতন মিত্র — বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক
১৭৯। শিশিরকুমার ঘোষ — অমিয় নিমাই চরিত, ৫ম খণ্ড
১৮০। ” — প্রবোধানন্দ ও গোপাল ভট্ট
১৮১। সতীশচন্দ্র মিত্র — যশোহর খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড (২য় সং)
১৮২। ” — সপ্ত গোস্বামী
১৮৩। সুখময় মুখোপাধ্যায় — প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম
১৮৪। সুখময় মুখোপাধ্যায় — বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর—স্বাধীন সুলতানদের আমল
১৮৫। সুধীরচন্দ্র মিত্র — হুগলী জেলার ইতিহাস
১৮৬। সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ — শ্রীচৈতন্যদেব (৫ম সং)
১৮৭। ” — অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ
১৮৮। ” — গৌড়ীয়ার তিনঠাকুর
১৮৯। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় — বঙ্গীয় শব্দকোষ

১৯০। হরিদাস দাস — শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ

১৯১। „ — শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন

১৯২। „ — শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, ৩য় খণ্ড

১৯৩। „ — শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য

১৯৪। হরিলাল চট্টোপাধ্যায় — বৈষ্ণব ইতিহাস

১৯৫। হেমচন্দ্র সরকার — গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব, ১ম খণ্ড

ছ। উড়িয়া ভাষায় লিখিত গ্রন্থ

১৯৬। অচ্যুত দাস — শূন্যসংহিতা — সত্যবাদী সাহু প্রভৃতি সং

১৯৭। দিবাকর দাস — জগন্নাথচরিতামৃত — মাধবেন্দ্র দাস প্রভৃতি সং

জ। অসমীয়া ভাষায় লিখিত গ্রন্থ

১৯৮। ভূষণ দ্বিজ কবি — শঙ্করদেব — দুর্গাদাস বরকটকী সং

১৯৯। রামচরণ ঠাকুর — শঙ্করচরিত — হলিরাম মহান্ত সং

ঝ। হিন্দী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ

২০০। পণ্ডিত মদনলালজী তিওয়ারী — সংসারকে মহান্ পুরুষ

২০১। প্রতাপসিংহ — ভক্তকল্পদ্রুম

২০২। নাভাদাসজী — ভক্তমাল — লক্ষ্মী বেঙ্কটেশ্বর সং প্রিয়দাসজীর টীকাসহ

২০৩। সীতারামশরণভগবানপ্রসাদ রূপকলা — ভক্তিসুধাস্বাদতিলক

ঞ। বাঙ্গালা সাময়িক পত্র

২০৪। গৌরাঙ্গসেবক, ১৩২৬-১৩২৮।

২০৫। গৌড়ীয়, ১৩৩৯, ১৩৪১, ১৩৪৮, ১৩৪৯।

২০৬। নিতাই সুন্দর, ১৩৪৩।

২০৭। নিত্যানন্দদায়িনী, ১২৭৯, ১২৮০।

২০৮। বঙ্গশ্রী, ১৩৪২।

২০৯। বিষ্ণুপ্রিয়াগৌরাঙ্গ, ১৩৩০।

২১০। ভারতবর্ষ, ১৩৩৭, ১৩৪১।

২১২। সাহিত্য, ১৩০৮।

২১৩। সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা ১৩০৬, ১৩৪২, ১৩৫৬
২১৪। সোনার গৌরাঙ্গ, ১৩৩৪

ট। ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ

২১৫। Abid Ali — Memoirs of Gour and Pandua
২১৬। A Catalogue of Skt. Mss. in Benares Sanskrit College Library.
২১৭। A Catalogue of Skt. Mss. in Oudh, Vol. XXI
২১৮। A Descriptive Catalogue of Skt. Mss. of Orissa Vol. I
২১৯। A Triennial Catalogue of Skt. Mss. (in Madras Govt. Oriental library), Vol. IV
২২০। Aufrecht Catalogus Catalogorum Vol. I., II., III
২২১। Eggeling — India Office Catalogue Vol. VII
২২২। Farquhar — An Outline of the Religious Literature of India
২২৩। Grouse — District Memoirs of Mathura (3rd ed)
২২৪। Haraprasad Sastri — A Descriptive Catalogue of Skt. Mss. of the Asiatic Society of Bengal, Vol. VII
২২৫। " — Notices of Sanskrit Manuscript in Nepal Darbar, Vol. I
২২৬। " — Notices of Sanskrit Manascript (2nd series) Vol. I, II
২২৭। Keith — Sanskrit Drama (2nd ed)
২২৮। Kennedy — The Chaitanya Movement
২২৯। Dr. Dinesh Chandra Sen — A History of Bengali Language and Literature
২৩০। " — The Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal
২৩১। " — Chaitanya and his Age
২৩২। " — Chaitanya and his Companions

২৩৩।	Dr. S. Radhakrishnan	Indian Philosophy Vol. II
২৩৪।	,,	Religion and Society
২৩৫।	Dr. Sukumar Sen	A History of Brajabuli Literature
২৩৬।	Dr. Surendra Nath Dasgupta	A History of Sanskrit Literature Vol. I, (1st & 2nd ed)
২৩৭।	,,	A History of Indian Philosophy Vol. IV
২৩৮।	,,	Indian Philosophy Vol. II
২৩৯।	Dr. Sushil Kumar De	Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal (1st & 2nd ed)
২৪০।	,,	History of Sanskrit Poetics (2nd ed)
২৪১।	Manindramohon Basu	Post Chaitanya Sahajia Cult
২৪২।	M. Krishnamachariar	History of Classical Sanskrit Literature
২৪৩।	Nalinikant Bhattasali	Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal
২৪৪।	P. V. Kane	History of Dharmasastra, Vol. I
২৪৫।	Quereshi, I. H.	The Administration of the Sultanate of the Delhi (4th ed.)
২৪৬।	Rajendralal Mitra	Notices of Sanskrit Manuscripts Vols I. IV., VI., VIII., IX
২৪৭।	Rhys Davids & W. Stede	The Pali Text Society's Pali English Dictionary
২৪৮।	Sir Jadunath Sarkar	History of Bengal, Vol. II
২৪৯।	,,	Shivaji and his Times (2nd ed)
২৫০।	Steingass	Persian English Dictionary
২৫১।	Tarachand	Influence of Islam on Indian Culture

২৫২। Vincent Smith — Akbar the Great Mogul
২৫৩। Wilson — A Glossary of Judicial and Revenue Terms
২৫৪। „ — The Religious Sects of the Hindus (2nd ed)

ঠ। ইংরাজী সাময়িক পত্রিকা

২৫৫। Indian Historical Quarterly 1934, 1938
২৫৬। Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1615
২৫৭। Journal of the Department of Letters, 1931
২৫৮। The Cultural Heritage of India, Vol, IV

নির্ঘণ্ট

[* চিহ্ন পাদটীকার নির্দেশক]